আবর্জ্জনার ঝুড়ি

নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ

ড. দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীঅরুণ দেববর্মা

মহারাজকুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা লিখিত

আবর্জ্জনার ঝুড়ি

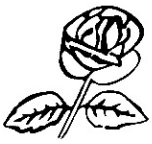

সম্পাদনা

ড. দ্বিজেন্দ্রলাল গোস্বামী
শ্রী অরুণ দেববর্মা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
গবেষণাকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা লিখিত আবর্জ্জনার ঝুড়ি ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ন গোস্বামী ও শ্রীঅরুন দেববর্মার সম্পাদনায় ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

* গ্রন্থস্বত্ব ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি
সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল, বইমেলা ২০০৪

প্রচ্ছদ ঃ শিবেন্দু সরকার

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

কম্পিউটার সেটিং এবং প্রিন্টিং ঃ—
পারুল প্রকাশনী
১৬, আখউড়া রোড, আগরতলা ৭৯৯০০১

প্রকাশকের ভূমিকা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা প্রকাশনার জগতে নিরন্তর উপেক্ষিত জনজাতিদের জীবন, সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাসের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টিলগ্ন হতে গুরুত্ব সহকারে পুস্তকাদি প্রকাশে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

স্বর্গীয় মহারাজকুমার মহামান্যবর শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর লিখিত পাণ্ডুলিপি "আবর্জ্জনার ঝুড়ি" পূর্ণ অবয়বে আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদিসহ আমাদের এই গবেষণাকেন্দ্র হতে প্রকাশ পাচ্ছে, যা এককথায় এক কালজয়ী ঘটনা। দীর্ঘদিন অযত্নে, অবহেলায় লেখকের পাণ্ডুলিপিটি লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল।

মূল পাণ্ডুলিপিটি পুনরুদ্ধার করে যৌথভাবে বহু শ্রমে তথ্যাদি সন্নিবেশ করে প্রকাশনার জন্য হস্তান্তর করায় ডঃ শ্রী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রী অরুণ দেববর্মাকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পুস্তকটি সাধারণ পাঠক, সাহিত্যপ্রেমী, ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে বহু অজানা তথ্যাদি তুলে ধরতে সহায়ক হবে আমার বিশ্বাস। সাধারণ্যে পুস্তকটি সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি

জে. ডি. ত্রিপুরা
অধিকর্তা
ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
গবেষণাকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা।
ত্রিপুরা সরকার

আরোহণ

রাজন্যশাসিত ত্রিপুরা বা সেকালের বৃহত্তর ত্রিপুরাসহ উনিশ শতকে খোদ বাংলায় বাংলাসাহিত্যে যাঁরা স্বকীয়তায় গদ্যচর্চা করেছেন, স্বল্প পরিসরে হলেও ত্রিপুরার রাজপরিবারের সন্তান নবদ্বীপচন্দ্র দেবর্মনের নামটিও সেখানে উল্লিখিত হতে পারে নিঃসন্দেহে। যদিচ সেই গুরুত্বের কথা তাঁর সাময়িককালে ইতস্তত স্বীকৃত হলেও স্বকালে তা নিয়ে তেমন নন্দিত হতে আমরা দেখি না। অবশ্য গ্রন্থাকারে লেখকের রচনার অভাবও তাঁকে সাহিত্য-সংস্কৃতির ভোক্তাদের কাছে ব্যাপকতায় এ যাবৎ পরিচিত হতে সাহায্য করেনি। বিক্ষিপ্ত পরিসরে তৎকালীন দুয়েকটি সাময়িকপত্রেই তাঁর গদ্যকর্মগুলো প্রায় যত্নে-অযত্নে এতদিন রক্ষিত থেকেছে। তাকে ভিত্তি করেই ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণাকেন্দ্রের সহযোগিতায় পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিলেন ডঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী এবং শ্রী অরুণ দেববর্মা। তাঁদের এই প্রয়াস নিশ্চিতভাবেই সংস্কৃতিমনা সকলের কাছে আশ্বস্তের ও ধন্যবাদের।

'আবর্জ্জনার ঝুড়ি' ও 'বাংলা ভাষার চারিযুগ' এই শিরোনামে দুটো বিষয়ভিত্তিক রচনার মধ্যেই আমরা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণের গদ্যশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই। বিশেষত ''বাংলা ভাষার চারিযুগ'' এই লেখাটি তাঁর এক গভীর গবেষিত রচনা এবং স্বকীয়তার পরিচ্ছন্ন স্বাক্ষর। সময়ের দিক থেকে ইনি রবীন্দ্র-সমসাময়িক। বিষয়-বৈচিত্র্যে বাংলা গদ্যে সাবলীলতার তখন সবেমাত্র শুরু। মানবসভ্যতার ইতিহাসের বিচারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর উত্থান-পতনের ঘটনার প্রেক্ষণায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অবস্থান নির্ণয়ে চারটি স্তরের প্রসঙ্গটি নিশ্চিতভাবেই তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণ। অধ্যয়ন ও জ্ঞানের পরিধি ভূগোলের সীমাকে কতখানি অতিক্রম করতে পারে, উক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে এর বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে। বাংলা ভাষার তৃতীয় যুগ সম্পর্কে নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে তাঁর মৌলিক আলোচনার এক উদাহরণ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে আমরা উপভোগ করতে পারি—

''বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে তৃতীয় যুগের বাংলা ভাষায় উপন্যাস-সাহিত্য প্রথম বাহির হয়, এবং ইংলন্ডের ন্যায় বাংলাদেশেও বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে

সঙ্গে এই সাহিত্য বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠকসমাজের, মৎস্য-দুগ্ধের স্থানীয় (দেশের) খাদ্যপেয় যোগাইয়া আসিতেছে। পূর্বে যখন আখ্যানের জন্য আখ্যান আসিত তখন তাহার সম্পদ ছিল কৌতূহল; আখ্যান-প্রণেতার শক্তির অনুপাতে তাহা পাঠকের অনুরাগ আদায় করিয়া লইত। আখ্যান যখন উপন্যাসের স্তরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সম্পত্তিও কিছু বাড়িয়াছিল; অবশ্যই। সেই অতিরিক্ত অন্যান্য সম্পদের এবং সেই সঙ্গে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে মাত্রাস্পর্শ ধর্মের (Organaleptic properties) ও চিত্তবৃত্তির ("বৃত্তয়ঃ বিষয়াকারণে চিন্তস্য পরিণামঃ" পাতঞ্জলী দর্শন) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক ব্যাখ্যা; আখ্যান বস্তুর বা ষড়যন্ত্রের স্বাভাবিক অথচ অপ্রত্যাশিত ক্রম-বিকাশ; ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য এবং ভাব ও নীতির (Emotion and moral and political principles) ঘাত-প্রতিঘাত; প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামের মধ্যে বিজ্ঞানের নিত্য বিকাশ; নব জাগরিত জাতি-প্রীতি, স্বদেশানুরাগ বা সেই প্রকার অপর কোনও মহৎ অনুভূতির পরিতর্পণ—মোট কথায় সাময়িক যুগধর্মের প্রতিষ্ঠান সকলের সমবায়িক ফলিত দৃশ্য এবং মনের উপর তাহার প্রভাব (Effect)। বাংলা ভাষার পাঠক বাংলায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রথম এই সম্পদের পরিচয় পান, এবং তাহা হইতে বাংলা ভাষার গ্রহণ করিবার শক্তি ও প্রসার (receptive faculty and comprehensiveness) বুঝিবারও সুযোগ পাইয়াছিলেন।" —(বাংলা ভাষার চারিযুগ)

অন্যদিকে 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি' নবদ্বীপচন্দ্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার এক মিঠেকড়া ফসল। গদ্যকার এখানে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর রচনাগুলোকে আবর্জনা বলে অভিহিত করেছেন। এই নামকরণটিও যথেষ্ট অর্থবহ। যেখানে তিনি একজন বিদ্বান ব্যক্তির বিনয় ও সংযত ভাবপ্রকাশের পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি সেকালের ত্রিপুরার রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষণায় পাঠককুলের কোনো কোনো অংশে এই রচনাগুলো হয়তো আক্ষরিক অর্থেই সেভাবে বিবেচিত হতে পারে—তাঁর এই সচেতনতাকে তিনি এর মধ্য দিয়ে খুব সূক্ষ্ম শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় যেন প্রকাশ করেছেন! কেন না, ত্রিপুরার রাজন্য ইতিহাসে রাজাদের পারিবারিক অন্তর্কলহের মলিন পরিণাম শুধু রাজঅন্তঃপুরের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি; তা সেকালের প্রজাকুলকেও দ্বিধাবিভক্ত করেছিল। এমনকি রাজগী ক্ষমতালাভের চূড়ান্ত পর্বে বৃটিশ ভারতের আইন-কানুনের প্রয়োগ ব্যতিরেকেও তৎকালীন বৃহত্তর বঙ্গের প্রভাবশালী ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কয়েকজন এই কলহে পক্ষভুক্ত যে হয়েছিলেন—সেই ঘটনা হয়তো আমাদের কারো কারোর

অজানা নয়। তাই সেকালের ঘটনাবলিকে লিখতে গিয়ে সেখানে যে তা সর্বনন্দিত না-হয়ে কোনো এক অংশে আবর্জনার কারণও হতে পারে; এই সচেতনতাকেই তিনি যেন নিপুণ শব্দচয়নে প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনার শিরোনামে।

'ত্রিপুরা-জাতির' সমাজগঠন ও প্রকৃতি (১৯ থেকে ৩ক অনুচ্ছেদ), রাজ আমলের 'বারো ঘরিয়া' ঠাকুর বা 'দ্বাদশ ঠাকুর' সম্পর্কিত বিষয়, মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং তাঁরই রাজত্বকালে কুলগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামীর কৃতিত্ব লাভের ফলশ্রুতিতে সুফল-কুফলজনিত জনমনে বিমিশ্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব (৩৩ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ), বহির্রাজ্য থেকে রাজকর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রতিক্রিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রসঙ্গ (অনুচ্ছেদ ৫৭), হিন্দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতসহ বিক্ষিপ্ত পরিসরে ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ের উপর আলোচনা (অনুচ্ছেদ ৪৯/৫০), ত্রিপুরার ইতিহাসে লুসাই অভিযান (অনুচ্ছেদ ৫৪), তদানীন্তন পূর্ব্ব বাংলার নানা বিষয়সহ কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এর গোড়াপত্তনের কথা, পারিবারিক বিষয় ইত্যাদি নিয়ে 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি' এক অনন্য সৃষ্টি। লেখায় কতখানি মুন্সিয়ানা থাকলে পরে কঠিনতর বিষয়কে সহজতর করে বলা যায়, তার অজস্র উদাহরণ লেখকের রচনায় রয়েছে। এমনিতর এক নিদর্শন নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে আমরা আস্বাদন করতে পারি—

"এই যে হিন্দুশাস্ত্রে রাগরাগিণীর স্বরূপ এবং স্বভাব প্রদত্ত হইয়াছে আজগুবি বলিয়া উহাদের উপেক্ষা করিতে এমন সাহসে কুলায় কি; ক্রমে শোনা যায় যে সুরের অন্ততঃ বর্ণ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে। আরও শোনা যায় যে অন্ধদিগেরও ছাপার বই পড়ার উপায় বাহির হইয়াছে। 'অপ্টোফোঁ' (Optophone) যন্ত্রের সাহায্যে ছাপার বর্ণমালা সুরের বর্ণমালায় পরিবর্তিত হইবে। এই যে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ তিন শ্রেণীর পদার্থ বিভাগ, বিদ্যাসাগর যুগ হইতে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের স্থাবর-জঙ্গম বিভাগের আসন, উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া দখল নিয়াছিল তাহাও আবার উড়িবার জন্য পাখা মেলিতেছে। থিওসফির বিচারে এবং জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণায় তথাকথিত অচেতনের অচেতনত্বও যে উড়িতে চলিল। মধ্যদিনের যুগ যে আসন্ন; দুই চারিটি করিয়া প্রভাতশুভ্র কিরণরেখা ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই সংবাদ ঘোষণা করিতেছে।" (আবর্জ্জনার ঝুড়ি)

বিভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্যে নবদ্বীপচন্দ্রের উক্ত গদ্যকর্মে একদিকে তাঁর পাঠচর্চার ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পাই চিন্তা-অনুভূতি প্রকাশের

ক্ষেত্রে তাঁর পরিমিতিবোধ, মার্জিত রুচি এবং সত্যনিষ্ঠা। বিষয়-আশয় নিয়ে পারিবারিক সম্পর্ক আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বিষাক্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কাব্যরসিক মহারাজা বীরচন্দ্রের সংস্কৃত চরিত্র, তাঁর সঙ্গীত ও কবি-প্রতিভার বিষয়ে নবদ্বীপচন্দ্র যথার্থভাবেই সোচ্চার এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সে-কথা তিনি তাঁর উক্ত রচনায় অকুণ্ঠ চিত্তে উল্লেখও করেছেন।

আপাতত প্রাসঙ্গিক কথা হচ্ছে, নান্দনিক বিষয় থেকে শুরু করে ত্রিপুরার সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিভাগে এ-যাবৎ আমরা যা-কিছু করে চলেছি, সর্বত্রই হচ্ছে বাইরে থেকে। অর্থাৎ যা দেখেছি, দেখছি সবটাই ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে নতুবা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে, এখনো প্রশস্ত দরজাটি খুলে ঘরের ভেতরটা দেখতে পারিনি। একালে আমাদের কেউ উৎসুক হলে ঘরের ভেতরটাও দেখতে পারি। নবদ্বীপচন্দ্রের 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি' সেখানে আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্যই করবে।

ধবলকৃষ্ণ দেববর্মণ

উজীর বাড়ী, আগরতলা
১৪১৩ ত্রিপুরাব্দ

কৈফিয়ত

ত্রিপুরার স্বনামধন্য স্বর্গীয় মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৫০-৬২) পুত্র মহারাজকুমার মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ (নবদ্বীপ বাহাদুর) লিখিত "আবর্জ্জনার ঝুড়ি" (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) প্রথম মুদ্রিতাকারে "ত্রিবেণী" পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে অগ্রহায়ণ মাসের পর আর প্রকাশিত হয়েছিল কি না, তা বহু খোঁজাখুজির পরও হাতের কাছে তথ্যাদি না-পাওয়ায় সে-সম্পর্কে সম্যকভাবে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় অনিলধন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "আমাদের ত্রিপুরা"তে ১৯৭১-৭২ সাল নাগাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল শোনা যায়। কিন্তু তার সবগুলি সংখ্যা দেখার সৌভাগ্য হয়নি, যার কারণে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে কিছু উদ্ধৃতি পাঠেই নিরস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজন্যশাসিত ত্রিপুরাতে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে একটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরিতে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ইংরেজি ও বাংলাভাষার বই ছিল। এই লাইব্রেরির বাংলা বই নিয়ে উমাকান্ত একাডেমির পাশে জনসাধারণের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে এবং ব্যবহারের জন্য "বীরচন্দ্র লাইব্রেরী" নাম দিয়ে আলাদাভাবে একটি লাইব্রেরি খোলা হয়।

স্বাধীনোত্তর কালে এম. বি. বি. কলেজ স্থাপনের ভার রাজবাড়ির লাইব্রেরি হইতে শ্রীরাজমালাসহ অন্যান্য ইংরেজি বই স্থানান্তরিত করা হয়। সেই প্রসঙ্গে ত্রিপুরা বিষয়ক reference বই খোঁজাখুজি করতে গিয়ে এম. বি. বি. কলেজের লাইব্রেরিয়ান শ্রদ্ধেয় হিমাংশু রঞ্জন দে "আবর্জ্জনার ঝুড়ি" পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখান। তারপর সেই পাণ্ডুলিপি জেরক্স করে নিয়ে আসি।

মূল পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাতেই তৎকালীন রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের হস্তলিখিত ইংরেজিতে একটি Comments দেখি। তাতে এই পাণ্ডুলিপি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে "ত্রিবেণী" পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়ার প্রথম তথ্য পাই। তারপর আমার সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী মহোদয়কে টেলিফোনযোগে জানাই এবং তিনি OZ লাইব্রেরিতে খোঁজাখুজির পর চৈতন্য লাইব্রেরি হতে এর দুটি সংখ্যা মাত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ওনার লেখনীতে মূল পাণ্ডুলিপির দুটি হস্তলিপি দেখে অনুমান করেন যে, মূল কলমচির হস্তলেখাটি সম্ভবত সুরসম্রাট শচীন কর্তার ছোটোবেলার হতে পারে এবং সংশোধনী বা পরিযোজনের হস্তলেখাটি স্বয়ং নবদ্বীপ বাহাদুরের বলে অনুমান করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে মূল পাণ্ডুলিপিটি যখন ধীরে ধীরে মনোযোগসহ পাঠ করতে শুরু করি, 'তখন ভাষার চাতুর্য ও উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। অন্ধকারময় ও অবগুণ্ঠিত ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, তৎসময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও রাজপরিবারের শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহ ধীরে ধীরে উন্মেষিত হতে থাকে। ব্যক্তি

নবদ্বীপ-বাহাদুরের স্মৃতিচারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে কখন কোথায় কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সে সম্পর্কে নানা তথ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দুঃখের কথা এই পাণ্ডুলিপিখানি যদি সম্পূর্ণভাবে লিখে যেতেন, তা হলে বোধ হয় ''আবর্জ্জনার ঝুড়ি'' ত্রিপুরাবিষয়ক কালজয়ী তথ্যে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে মর্যাদা পেত, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলার গদ্য বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের নাগপাশে যে সময় আবদ্ধ ছিল, এই মধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিদ্যোৎসাহী রাজপুত্র, মাতৃভূমি, রাজপাট, প্রতিষ্ঠা ও রাজসম্মানের প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে নিভৃতে যেভাবে বিদ্যাসাধনা করে গেছেন, তা এই পুস্তকের পাতায় পাতায় বিধৃত আছে। বলতে গেলে বাংলাসাহিত্য চর্চার পীঠভূমি কলকাতা হতে বহুদূরে একাকী নিজ চিন্তন, অভিজ্ঞতা ও বাংলা গদ্যে যে প্রাণস্পর্শী ও সহজিয়া অভিব্যক্তিতে নিজ লেখনীকে প্রাণসিঞ্চন করে গেছেন, তা এককথায় অনন্য ও অভূতপূর্ব। শব্দ ব্যবহারের চটুলতা, রসবোধ ও লেখনীর আভিজাত্যে যে-কোনো পাঠক বিমোহিত হতে বাধ্য।

ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা বলা হলেও ত্রিপুরার শাসনের ভাগ্যাকাশে দলিল দস্তাবেজে তখনও উর্দু বা আরবি ভাষার ব্যবহারের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। তখন অন্তত পক্ষে রাজঅন্দরেও যে বাংলাভাষার প্রভাব সম্পূর্ণত পড়েনি, তা সহজেই অনুমেয়। কারণ লেখকের পিতা মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন, জামাতিয়া মহারাণার পুত্র। তা ছাড়া রাজঅন্দরে রক্ষণশীল মণিপুরী রমণীর প্রবেশ এবং মাতৃভাষা চর্চায় ত্রিপুরী ভাষার প্রভাব খানিকটা স্তিমিত হলেও মণিপুরী মহিষীরা যে পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে মেইতে ভাষাতেই কথা বলবেন, তাই ধরে নেওয়া যায়। যার কারণে শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাজকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাভাষা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব সম্পর্কে চটুলভাষায় বর্ণনা করে গেছেন।

মহামান্যবর মহারাজকুমার নবদ্বীপ বাহাদুরের মূল পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, শৈশব স্মৃতিচারণ, তৎসময়ের ত্রিপুরার রাজপ্রশাসন ও পরিষদ পরিমণ্ডল, অর্থ, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক সংকট, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাজ্যত্যাগ।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যত্যাগের পর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, রাজ্যলাভের দরবারে মামলার জন্য কলকাতা গমন, কুমিল্লায় অবস্থানকালে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যাচর্চা এই পাণ্ডুলিপির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গোটা পাণ্ডুলিপি পাঠে, তখন থেকেই যতটুকু হাতের কাছে নবদ্বীপসম্পর্কীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়, তা নিয়ে সম্পাদন করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করছিলাম। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামীর সাথে দেখা হওয়ার পর সে-বিষয়ে আমার মতামত জানাই।

মুশকিল হল, সুংসহতভাবে জেরক্স করা পাণ্ডুলিপি নকল করে সম্পূর্ণভাবে বিধৃত করার সময়ের অভাব এবং কপি করার শ্রমসাধ্য কাজে অনীহা।

এ বিষয়ে কথা বলার পর শ্রীগোস্বামী নিজ দায়িত্বে (জেরক্স করা কপি হতে) এই কাজটি করার আগ্রহ প্রকাশ করার পর ওনার হাতে সমর্পণ করি। বহুকষ্টে এই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে সম্পূর্ণভাবে সহস্তে কপি করার সানুরাগ উৎসাহসহ কাজটি শেষ করায় আমি অভিভূত হয়ে যাই। এই কাজে কয়েকটি ছবি আমার কাছে থাকায় এবং সিংহাসনসংক্রান্ত মামলার অংশগুলিও জুড়ে দিলে প্রামাণ্য তথ্যাদিতে সমৃদ্ধ হবে আশা করে পরিচ্ছেদে জুড়ে দিতে চাইলে শ্রদ্ধেয় গোস্বামী মহাশয়ও সহমত পোষণ করেন। কুমিল্লাস্থিত নবদ্বীপ বাহাদুরের বসতবাড়ির ছবিসহ আরো কয়েকটি ছবি ব্যবহারের সম্মতি দেওয়ার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রীগিরীন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পুস্তকটি প্রকাশে উপজাতি গবেষণাকেন্দ্র দায়িত্ব নেওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত মনে হস্তান্তরিত করি। পুস্তক প্রকাশে ত্রিপুরা সরকারের কমিশনার শ্রদ্ধেয় বনমালী সিন্‌হা ও অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় মাণিক লাল রিয়াং মহাশয়ের আন্তরিক তাগিদ এবং প্রকাশনার দায়িত্বে থাকা আমার সহকর্মী শ্রী অমরেন্দ্র দেববর্মার অনুপ্রেরণা বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, যার জন্য সবার কাছে আমি চিরঋণী।

পুস্তক সম্পাদনার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী ধবলকৃষ্ণ দেববর্মা নিরন্তর বাৎসল্য প্রীতিতে আমাকে উৎসাহ জোগান ও পাণ্ডুলিপিটি গভীর অনুসন্ধিৎসায় পাঠ করে পরিশোধন ও পরিমার্জন করে টীকা-টিপ্পনীসহ ভূমিকা লিখে দেওয়ায় এই পাণ্ডুলিপির কলেবর যথেষ্ট সার্থকতায় সম্পূর্ণতা পেয়েছে, এ-কথা বলা বাহুল্য। তারজন্য আমরা ওনার কাছে চিরঋণী।

"ত্রিবেণী" পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রথম দুখণ্ডের সাথে মূল পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকের লেখনীতে সাযুজ্যতা না-থাকলেও মূলভাব যে এক, তা সবিস্তারে পাঠককুলের জানার সুবিধার্থে পরিশেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখকের বহুমুখী সৃজনশীলতার সাথে পাঠককুল ওয়াকিবহাল হবেন, জেনে বাহুল্যতা বর্জন করার সৎসাহস হয়নি এবং সঙ্গে জেরক্স করা মূল কপির দুটি পৃষ্ঠাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি এই অশীতিপর জ্ঞানবৃদ্ধের সৃষ্টিকর্মের রস দীর্ঘদিন পর হলেও সাধারণ পাঠক, সাহিত্যপ্রেমী ও গবেষকদের কাছে রসাস্বাদনের জন্য সহজলভ্য করে ছাপানো অবস্থায় পৌঁছে তা হলে নিজেদের শ্রম সার্থক মনে করব।

ইতি

অরুণ দেববর্মা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় (পূর্বার্ধ)	১
নবদ্বীপচন্দ্রের জীবন কথা	৪
নবদ্বীপচন্দ্রের কালে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক অবস্থা	১০
মূল পাণ্ডুলিপি	১৩
ব্যক্তি পরিচিতি	৬২
সম্পাদকীয় (পরার্ধ)	৭৮

পরিশিষ্ট

(ক) ত্রিবেণী পত্রিকাতে প্রকাশিত অংশবিশেষ।

(খ) রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বনাম মহারাজ বীরচন্দ্র Suit No 35 of 1874. এর প্রতিলিপি

(গ) ঐ Suit No 23 of 1880 এর প্রতিলিপি।

(ঘ) ঐ মোকদ্দমায় বীরচন্দ্রের লিখিত বক্তব্যের প্রতিলিপি।

(ঙ) ঐ মোকদ্দমায় রাধাকিশোরের লিখিত বক্তব্যের প্রতিলিপি।

(চ) নবদ্বীপচন্দ্রের হস্তাক্ষর।

'আবর্জ্জনার ঝুড়ি'র প্রসঙ্গে (পূর্বার্ধ)

মহামান্যবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মার আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আবর্জনার ঝুড়ি' সম্পর্কে প্রাজ্ঞজনের মুখে অনেক কথা শুনেছি। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে রচনাটি পড়ার কৌতূহলও প্রগাঢ় হয়েছিল। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপি বা প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটাই জোগাড় করতে পারিনি। সম্প্রতি অনুজপ্রতিম শ্রীমান অরুন দেববর্মা আমাকে 'আবর্জনার ঝুড়ি'র একটি জেরক্স্ কপি দেন। অসীম উৎসাহ নিয়ে ঐ পাণ্ডুলিপি পড়তে শুরু করি। অনেক ক্ষেত্রে হস্তাক্ষর বুঝতে না পারার জন্য এবং শেষদিকে পৃষ্ঠাঙ্কবিহীন প্রচুর কাটাকুটিসহ অনেকগুলি পৃষ্ঠার পারম্পরিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে বেশ সময় কেটে গেছে। বার্ধক্যজনিত অবসাদে চক্ষুও বেশীক্ষণ সহযোগিতা করে না।

এই পাণ্ডুলিপির ভূমিকা থেকে জানা গেল যে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'ত্রিবেণী' নামক মাসিক পত্রে 'আবর্জনার ঝুড়ি' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারের জটিলতা থেকে মুক্তি পাবার আশায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'ত্রিবেণী'র সন্ধানে লেগে গেলাম। একে একে চৈতন্য লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, তালতলা রিডিং লাইব্রেরী আন্দুল রাজবাটী লাইব্রেরী, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার খুঁজে অবশেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ ত্রিবেণী পত্রিকার ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১ম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পেলাম। এই দুই সংখ্যাতে মূল পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তী সংখ্যাগুলি উপরোক্ত কোন গ্রন্থাগারেই নেই, তাই প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানতে পারছি না। ইতিমধ্যে কলকাতাস্থ 'আমাদের ত্রিপুরা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য জানালেন যে তিনি ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে 'আমাদের ত্রিপুরাতে' 'আবর্জনার ঝুড়ি' প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে মুদ্রিত পত্রিকার কপি বা মূল পাণ্ডুলিপি কিছুই নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে খোঁজ নিতে উপদেশ দিলেন কারণ তিনি তাঁর পত্রিকার কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে পাঠিয়েছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে "আমাদের ত্রিপুরা" নামক ত্রিমাসিক পত্রিকার একটি মাত্র বাঁধানো গ্রন্থ পেলাম যার মধ্যে ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক ও মাঘ সংখ্যাতে 'আবর্জনার ঝুড়ি' মুদ্রিত রয়েছে। মোট চার পৃষ্ঠাতে দুটি প্রবন্ধে যা মুদ্রিত রয়েছে তা ত্রিবেণীতে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকেও কম। আর কোন সংখ্যা জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই। কাজেই প্রচুর শ্রম স্বীকার করেও পুরো প্রকাশিত অংশ, অবশ্য যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে, উদ্ধার করা গেল না। তবে যে অংশের মুদ্রিত রূপ পেয়েছি তা শ্রীমান অরুন দেববর্মা প্রদত্ত জেরকস্ কপির প্রতিরূপ। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে আলোচ্য জেরকস পাণ্ডুলিপি প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এবারে যথালব্ধ পুরো পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। 'ত্রিবেণী' ও 'আমাদের ত্রিপুরা'তে প্রকাশিত অংশ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হল।

মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। পরিচয় ও জন্মকথা, মায়েদের, সহ ভ্রাতা ও ভগ্নীদের কথা, কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের চরিত্রাভ্যাস, পিতা ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক, রাজবাটীর রীতিনীতি, বাল্যকালীন শিক্ষা-দীক্ষা, হিন্দুস্থানী উত্তমর্ণদের ক্রিয়াকলাপ, ঈশানচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও গুরুভক্তি, রাজকোষের অবস্থা, গুরু বিপিন বিহারী গোস্বামীর কার্যকলাপ, ঠাকুর সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও বাধ্যবাধকতা, ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু ও বীরচন্দ্রের ক্ষমতাপ্রাপ্তি, ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার সূচনা, বীরচন্দ্র দ্বারা ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, রাজকুমারদের উত্তরাধিকারের মোকদ্দমা, বীরচন্দ্রের শিক্ষা সংস্কার, বীরচন্দ্রের সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রকলা প্রীতি, রাজমালা পাঠ করার রীতি, রাজমালা মুদ্রণের প্রয়াস, ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ ও কুমিল্লাতে বসবাস শুরু, ঢাকা নগরীর কিছু বিবরণ, আগরতলায় কলেরা মহামারী, চাকলা রোশনাবাদের জমিদার ও তালুকদারদের ব্যবহার, কলকাতা নগরীর অবস্থা, কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ, সেকালে ত্রিপুরার যাতায়াত ব্যবস্থা, কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রূপে জনহিতকর কাজের বিবরণ ইত্যাদি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যাচ্ছে। এক কথায় এই স্মৃতিচারণ সে কালের ইতিহাস রচনায় মূল্যবান আকর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, নবদ্বীপচন্দ্রের রচনাতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। বরঞ্চ সর্ববিষয়ে তিনি খুড়ো মহারাজের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। রাজ্যত্যাগের কারণ কিছুই উল্লেখ করেননি। মোকদ্দমাতে জড়িয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলেও কখনও বীরচন্দ্র মাণিক্য সম্বন্ধে কোন কটুক্তি বা রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেননি। এটাই তাঁর চরিত্রের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মাধুর্য। প্রসঙ্গত বীরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা এসেছে কিন্তু রাধাকিশোর ও রবীন্দ্রনাথ বা বীরেন্দ্রকিশোর ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আশ্চর্য নিরবতা পালন করেছেন। কিছুই উল্লেখ করেননি অথচ সব বিষয় তাঁর জানা ছিল। তাঁর লেখা পড়ে ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্রের লিখিত বৃত্তান্ত একপেশে এবং কিছুটা বিদ্বেষভাবাপন্ন বলে মনে হচ্ছে। মোকদ্দমাতে হেরে কুমিল্লাতে বসবাস কালেও তিনি বীরচন্দ্রের ব্যক্তিগত স্নেহ হারাননি বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা কোন বিবরণী সঠিক বলে ধরে নেব, আনন্দ বা কষ্টভোগীর স্বীকারোক্তি, না বন্ধু ঐতিহাসিকের নথিবদ্ধ বক্তব্য?

পুস্তকটি অসম্পূর্ণ, যেন হঠাৎ লেখনি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কি কারণে তা হতে পারে? অনুমান করা যেতে পারে যে বাল্য ও যৌবনের স্মৃতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন খুব সম্ভবত প্রবাস জীবনে কুমিল্লাতে বসবাস কালে। লেখা নিজেই কাটাকুটি করে পরিচ্ছন্ন করেছেন। তবুও লেখার মধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে 'ত্রিবেণী' সম্পাদক ১৩২৪ বঙ্গাব্দে উল্লেখ করেছেন যে সে সময়ে মহারাজ কুমারের বয়স ৬৪ বৎসর। "মহারাজ কুমারের কপিটা অপর কাহারও দ্বারা নকল করিয়া পাঠানো। মহারাজ কুমার স্থানান্তরে দূরে থাকেন। এ অবস্থায় নকল কর্তার ত্রুটিতে কোন ভুল প্রমাদ ঢুকিলে বা কোন কথা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িলে, তাহা সংশোধন করাইয়া আনা সময় সাপেক্ষ। এবার আমরা সে সুবিধা পাই

নাই; এজন্য কপিতে যাহা আছে, অবিকল মুদ্রিত করিলাম। এজন্যে কেহ প্রবন্ধ লেখককে দায়ী না করেন। প্রবন্ধ লেখক রাজকুমার হইলেও ইংরেজী ও বাংলায় সুপণ্ডিত। তাঁহার লেখনি হইতে বিশেষ একটু কিছু ভুলভ্রান্তি বাহির হওয়া সম্ভব নহে।" ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে) বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা। তাঁরই অনুরোধে মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে) কুমিল্লা ত্যাগ করে আগরতলায় আসেন এবং ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দের ১৩ কার্তিক এক রাজকীয় ঘোষণায় তাঁকে রাজমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হয়। সেই থেকে শুরু করে ত্রিপুরার সরকারী কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য তাঁকে ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে তিনি কলকাতায় পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যে ও জমিদারীতে ৩ দিবস শোকপালন করা হয়। এই জন্য অনুমান করা যেতে পারে যে বংশধরদের আনুকুল্য ও যথোপযুক্ত সম্মান পাবার পরে তিনি 'আবর্জনার ঝুড়ি'র বাকী অংশ মুদ্রিত করতে বা আরও লিখতে অনুপ্রাণিত হননি। অথবা রাজকার্যে বিশেষ মনোযোগ দেবার ফলে তাঁর সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাত ঘটে এবং লেখা সমাপ্ত করার জন্য সময় করতে পারেননি।

'আবর্জনার ঝুড়ি' সাধুভাষায় লিখিত অতি উচ্চ শ্রেণীর গদ্য রচনা। নিজের ব্যক্তিগত কথা, ত্রিপুরার কথা ছাড়াও নানা বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করেছেন। গম্ভীর বিষয়বস্তু অবলীলায় হাস্যরস উদ্রেককারী ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। তাঁর অধ্যয়নের পরিধির ইঙ্গিতও লেখার মধ্যে স্পষ্ট। তিনি যে নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন তা তাঁর লেখাতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'আবর্জনার ঝুড়ি' তাই সমকালীন বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে বিবেচিত হতে পারে।

— দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী

নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা

মহামান্যবর মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর উনিশ-বিশ শতকের ত্রিপুরা রাজ্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের একমাত্র জীবিত পুত্র প্রাসাদ-রাজনীতির কূটজালে বিধ্বস্ত হয়ে তাঁর পিতার পরে ত্রিপুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর প্রাথমিক পদ হিসেবে বড়ঠাকুর বা যুবরাজ কোন পদই পাননি। তাঁর এবং বংশধরদের ত্রিপুর সিংহাসন অধিকারের সমস্ত সম্ভাব্য পথ রূদ্ধ হয়ে গেছ্ল। তিনি ভারতবিখ্যাত সংগীতবিদ্ শচীনদেব বর্মনের পিতা হতে পারেন, কিন্তু ত্রিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সুযোগ তাঁর হাতে ছিল না।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ৩য়া মহারাণী ছিলেন কৈশাম কন্যা জাতিশ্বরী। জাতিশ্বরীর ৩য় পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র ১৪ মাঘ ১২৬৩ ত্রিপুরাব্দে (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। জাতিশ্বরীর পিতা কৈশাম মদনকে শ্রীহট্ট থেকে আগরতলায় আনা হয়েছিল এবং তাঁর তৃতীয়া কন্যা জাতিশ্বরীকে ঈশানচন্দ্র বিবাহ করেন।[১] ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৭ শ্রাবণ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা যায় ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৬ শ্রাবণ তারিখের এক রোবকারীতে তিনি তাঁর ভ্রাতা বীরচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ পদে, জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্রকে বড়ঠাকুর এবং নবদ্বীপ চন্দ্রকে কর্তা পদে নিয়োগ করে গেছেন।[২] এই রোবকারী বলে বীরচন্দ্র সিংহাসন দখল করেন এবং বৃটিশ সরকারও বীরচন্দ্রকে Defacto রাজা স্বীকার করে রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করতে দেন। বীরচন্দ্রের ভ্রাতৃদ্বয় মহারাজকুমার চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ "এই রোবকারী অসত্য"— এরূপ মত প্রকাশ করে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারীর স্বত্ব সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজ্জু করেন। ব্রজেন্দ্রচন্দ্রও নবদ্বীপচন্দ্র নাবালক থাকার ফলে ঈশানচন্দ্র তাঁদের ভ্রাতা বীরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রেখে যান এই আশা করে যে বীরচন্দ্রের পরে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হবেন। এই আশাতেই ঈশানচন্দ্রের প্রধানা মহিষী রাজলক্ষ্মী দেবী ও মহারাণী চন্দ্রেশ্বরী প্রমুখ রানীগণ চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ কর্তৃক আনীত বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাতে বীরচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষী দেন।

'আবর্জনার ঝুড়ি' পাঠে জানা যায় যে তাঁর পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১২৬৮ ত্রিপুরাব্দে যথাবিহিত শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে 'হাতেখড়ি' দিয়ে বিদ্যারম্ভের সূচনা করা হয়। পাথরের থালাতে খড়ি দিয়ে বর্ণমালা লিখতে হত কারণ তখনও স্লেট প্রচলিত হয়নি। রাজপুত্রদের বিদ্যাদান করতেন রামদুলাল শর্মা বিদ্যাভূষণ। রাজপুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র তাঁর নিকট লেখাপড়া শিখতেন। বিদ্যাভূষণ তাঁদের সেকালীন রীতি-অনুযায়ী ভারতীয় প্রথাগত শিক্ষাই দিতেন। রামায়ণ, মহাভারত,

পুরাণের কাহিনী, হিসাব করার মত অংক প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পরে তাঁদের অভিভাবক বীরচন্দ্র মাণিক্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রাজপুত্রদের যুগোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে ঢাকা জেলা নিবাসী আনন্দবিহারী সেন মহাশয়কে তাঁদের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। আনন্দবিহারী সেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য ভাবধারার যুবক। তাঁর নিকট নবদ্বীপচন্দ্র ইংরাজী ভাষা, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি আধুনিক বিষয় শিক্ষালাভ করেন। আনন্দবিহারী সেন যুবরাজ রাধাকিশোরকেও ইংরেজি শেখাতেন। অবশ্য সেন মহাশয়ের কার্যকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নবদ্বীপচন্দ্রের ভাগ্য—

বিপর্যয়ের সঙ্গেই তাঁর কার্যকালের সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য তিনি পরবর্তীকালেও ভাগ্যহত রাজপুত্রের একান্ত হিতৈষী ও উপদেষ্টারূপে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর নিকটেই নবদ্বীপচন্দ্র যুক্তিবাদে দীক্ষিত হন এবং সংস্কারশূন্য উদার মনোভাব আয়ত্ত করেন। ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখেন। বস্তুত তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করে আনন্দ পেতেন এবং নিজের দুঃখময় অবসরকালে বইকে সঙ্গী করেছিলেন। নিজেকে তিনি সেকালের শিক্ষিত সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন স্থানীয় বিচারপতি সদর আমিনবাবু জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় বীরচন্দ্রের দাবী নসাৎ করে, নীলকৃষ্ণের অনুকুলে রায় দেন। বীরচন্দ্র হাইকোর্টে আবেদন করেন। "১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর চিপ জাস্টিস নরমেন, জাস্টিস ক্যামপ ঈশান চন্দ্রের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের অনুপস্থিতিতে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে নীলকৃষ্ণ অপেক্ষা বীরচন্দ্র ঈশানচন্দ্রের দ্বারা যুবরাজ পদে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া ঈশানচন্দ্রের নাবালক পুত্রগণের অভিভাবিকা রাণীগণ, বীরচন্দ্রের যুবরাজ পদে নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতেছেন না, এমতাবস্থায় এ সম্বন্ধে অন্য তদন্ত নিষ্প্রয়োজন; প্রধানত এই হেতুবাদে বীরচন্দ্রের আপিল ডিক্রি ও নীলকৃষ্ণের মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন"।[৩] পরে প্রিভি কাউন্সিল ও হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন (১৫ মার্চ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে) ফলে বীরচন্দ্র Dejure রাজারূপে গণ্য হন এবং নজরানা প্রদান করে বৃটিশ সরকারের খিলাত গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মোকদ্দমা চলাকালে মহারাজকুমার যুবরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। ফলে নবদ্বীপচন্দ্রই ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী রূপে জীবিত ছিলেন।

নজরানা বিষয়ে অধিক ঘাটাঘাটি না করে নজরানা প্রদান করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে "মহারাজ বীরচন্দ্র তৎকালে ঈশানচন্দ্রের একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সর্বনাশ সাধনানুষ্ঠানে ও গীত বাদ্যাদির আমোদ অনুষ্ঠানে মত্ত ছিলেন।"[৪] সাধারণভাবে নবদ্বীপচন্দ্রের পরিবার পরিজন এবং প্রধান রাজকর্মচারীদের একাংশ আশা করেছিলেন যে বীরচন্দ্র স্থায়িভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই নবদ্বীপচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান করে পথ তৈরি করবেন যাতে তাঁর পরে নবদ্বীপচন্দ্র ত্রিপুরা সিংহাসনের অধিকারী হতে পারবেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র তাদের আশা "ষোল কলায় পূর্ণ করতে কৃত-সংকল্প হইলেন।".... নবদ্বীপচন্দ্রকে একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া

রাখেন। অনাহারে অবরুদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তদন্তর প্রায় একবৎসর তিনমাস নবদ্বীপচন্দ্র, মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা রাজভবনে অবরুদ্ধ ছিলেন। এই কালমধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ করেন। নবদ্বীপচন্দ্রকে তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র 'নবদ্বীপচন্দ্র নগর' নামক একটি জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজ বীরচন্দ্র তাহাও বাজেয়াপ্ত করিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র বলেন— নবদ্বীপচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য নবদ্বীপচন্দ্রের বিমাতা মহারাণী রাজলক্ষ্মী ও মহারাণী চন্দ্রেশ্বরী তাঁহাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই অপরাধেই—

অল্পকাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র মহারাণী চন্দ্রেশ্বরীর খেয়াইস নামক তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রত্যুপকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন"।[৫] তারপরেই ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের) ১৬ ভাদ্র তারিখে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকিশোরকে বীরচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।[৬] মুনসী ঈশানচন্দ্র গুপ্ত, কুমিল্লা জজ-আদালতের উকিল, বীরচন্দ্র মহারাজকে পরামর্শ দেন যে নবদ্বীপ বাহাদুরকে যুবরাজ পদ না দিলে নবদ্বীপ বাহাদুর আদালতে নালিশ করলেও কোন সুবিধাই করতে পারবেন না। রাধাকিশোরকে যুবরাজ ঘোষণা করেই মহারাজ বীরচন্দ্র মুনসী ঈশানচন্দ্রকে পুরস্কৃত করেন। তাঁকে চাকলা রোশনাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র অনেক যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে স্বীয় মাতাকে নিয়ে দীনবেশে কুমিল্লায় উপস্থিত হন।

নবদ্বীপচন্দ্র কুমিল্লায় এসে মহারাজ বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে চাকলারোশনাবাদের দাবীতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করতে উদ্যোগী হলেন। এই মামলা (১৮৭৪ খ্রিঃ অঃ ৩৫নং মোকদ্দমা) ত্রিপুরা রাজ্যে বীরচন্দ্রের অনুগ্রহপুষ্ট ঠাকুরগণ এবং মন্ত্রী নীলমণি দাস বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। নবদ্বীপচন্দ্র আবেদনে বলেন যে তাঁর পিতা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বীরচন্দ্রকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত না করে পরলোকগমন করেছেন, সুতরাং শাস্ত্রমতে তিনিই স্বর্গীয় পিতার ও স্বর্গীয় কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের ত্যজ্য সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। বীরচন্দ্র তাঁর জবাবে নিজের কুলে কিছু কালি লেপন করলেন এবং বললেন যে (১) এরূপ মোকদ্দমার বিচার করবার এক্তিয়ার বৃটিশ আদালতের নেই, (২) বাদী দাসীর গর্ভজাত সন্তান, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তিনি ঈশানচন্দ্রের ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন না এবং (৩) মহারাজ ঈশানচন্দ্র বীরচন্দ্রকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করে গেছেন সুতরাং রাজবংশের চিরপ্রচলিত প্রথামত যুবরাজই রাজ্যের অধিকারী। "১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার জজ ফাউল সাহেব এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। তাঁর দ্বারা এরূপ অবধারিত হয় যে, এই মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার বৃটিশ আদালতের আছে। নবদ্বীপচন্দ্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র এবং শাস্ত্রানুসারে তিনি তাঁহার পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী; কিন্তু বীরচন্দ্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র দ্বারা যুবরাজ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং কুলাচার অনুসারে তিনিই রাজ্যাধিকারী।"[৭]

নবদ্বীপচন্দ্র হাইকোর্টে আপিল করলেন। হাইকোর্ট ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তারিখে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখলেন এবং নবদ্বীপ চন্দ্র ত্রিপুরা সিংহাসন অধিকারের পথ থেকে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। চাকলা রোশনাবাদের জমিদারী ত্রিপুরার কোন রাজার উপার্জিত সম্পত্তি নয়। উহা কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরদের অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তি। বংশের মধ্যে এক ব্যক্তি, ম্যানেজার রূপে ঐ সম্পত্তির দেখাশোনা করেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতিগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃত্তি পেতেন। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বনাম যুবরাজ দুর্গামণির মোকদ্দমায় ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত রায় দেন যে—" Respondent should hold the Zamindari subject to usual charge for maintainance of the members of the family and other established disbursements."[৮]

অর্থকষ্টে বিপন্ন নবদ্বীপচন্দ্র ১২৮৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে) এক মোকদ্দমা দায়ের করেন। এখানে তিনি ঈশানচন্দ্রের পূর্বোক্ত রোবকারীর বলে চাকলায় অধিকার অর্জন ও ভরণপোষণের জন্য বৃত্তির প্রার্থনা করেন। ত্রিপুরার জজ টাওয়ার সাহেব তাঁর বৃত্তি মাসিক ৬০০ টাকা ধার্য করে দেন।[৯] বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্ট রায় দিলেন—"ত্রিপুরাধিপতি একজন স্বাধীন নৃপতি, তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ মোকদ্দমা বিচার করবার অধিকার আমাদের নাই।"[১০] সত্যিই কি অপূর্ব রসিকতা বৃটিশ শাসকদের। এতদিন পরে পূর্ববর্তী দুইপুরুষের মোকদ্দমা সাধারণ আদালত থেকে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত দৌড় করিয়ে অবশেষে বৃটিশ সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হল। তা হলে ধরে নিতে হয় পূর্ববর্তী বিচারগুলো সিংহ মহাশয় নিদ্রিত অবস্থায় করেছিলেন। এর ফলে নবদ্বীপচন্দ্র অকূল সাগরে ভেসে গেলেন। শেষ পর্যন্ত বঙ্গদেশ সরকারের ভূতপূর্ব প্রধান সচিব পিকক্ সাহেবের হস্তক্ষেপে ও সৌজন্যে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র মহারাজের কাছ থেকে মাসিক ৫২৫্ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন।

মোকদ্দমায় হেরে যাবার পরে নবদ্বীপচন্দ্র আগরতলা ত্যাগ করে কুমিল্লাতে বসবাস করতে শুরু করেন। অবশ্য সেকালে কুমিল্লাতে অন্যান্য বিতাড়িত ত্রিপুরার রাজবংশধরগণ অনেকেই বাস করতেন। সুশিক্ষিত নবদ্বীপচন্দ্র কুমিল্লাতে নানা জনহিতকর কাজে লিপ্ত হন। কাজেই নিজের চরিত্রবলে তিনি সাধারণ জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। সেজন্যই এক সময়ে তিনি কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে বৃত হন। প্রায় ৪০ বৎসর এরূপ প্রবাস জীবন কাটাবার পরে তাঁর ডাক পড়ে জন্মভূমি ত্রিপুরাকে সেবা করার জন্য। ততদিনে খুল্লতাত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ও তাঁর রাজভ্রাতা রাধাকিশোর মাণিক্য গত হয়েছেন। ত্রিপুরার নায়ক তখন রাধাকিশোরের পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য। বীরেন্দ্র কিশোরের অন্যতম নীতি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের লোকদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত না করে রাজবংশীয় সমর্থ আত্মীয়দের উচ্চ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত করে রাজ্যে প্রশাসন চালান। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অভাবে সবক্ষেত্রেই সে এই নীতি কার্যকরী করতে পেরেছেন তা বলা যাচ্ছে না।

মানসিক দিক থেকেও বীরেন্দ্রকিশোর রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী রাজপুত্রদের জন্য বেদনা বোধ করতেন এবং তাঁদের কার্যক্ষমতা স্বদেশের সেবায় নিয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র কিশোর (লালুকর্তা) ও তাঁর সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন। সেজন্যই বীরেন্দ্রকিশোর প্রবাসে বসবাসকারী রাজপুত্রদের স্বরাজ্যে ফেরাবার কাজে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিযুক্ত করেন। সে সময়ে উল্লেখযোগ্য দুই রাজপুত্রকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে ব্রজেন্দ্র কিশোর উদ্যোগী হন। তাঁরা হলেন খুল্লতাতদ্বয় মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র ও বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র। নবদ্বীপ বাহাদুরকে রাজ্যের অবস্থা বিবৃত করে রাজ্যের কল্যাণে প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে কাজ করতে আবেদন করেন। তাঁদের আন্তরিকতায় নবদ্বীপ বাহাদুর মুগ্ধ হন এবং রাজ্যের শাসনে অংশগ্রহণে রাজী হন। ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দে তিনি আগরতলায় আসেন কুমিল্লা ত্যাগ করে। কিন্তু বড় ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র আর ফিরে আসেন নি।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর তাঁকে সমাদর করে ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দের ২৩শে কার্তিক এক ঘোষনায় রাজমন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন।[১১] ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দের ২৮ পৌষের এক ঘোষণা দ্বারা তাঁর 'তনখা' মাসিক ৫০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়।[১২] সে সময়ে নবদ্বীপ বাহাদুরের বয়স প্রায় ষাট বৎসর। 'তনখা' ও বেতন সমার্থক। রাজপরিবারের ব্যক্তিবর্গ যেহেতু নির্দিষ্ট মাসোহারা পেতেন, তাঁদের উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করলে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তদতিরিক্তভাবে বেতনের পরিবর্তে 'তনখা' গ্রহণ করতেন।[১৩]

নবদ্বীপবাহাদুর খুবই দক্ষতার সঙ্গে রাজমন্ত্রীর কার্যভার পালন করেন। ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দের ১৭ চৈত্র স্টেট কাউন্সিল গঠন করা হয়।[১৪] ১৩২৮ ত্রিপুরাব্দের ১৩ আষাঢ় এক ঘোষণা বলে স্টেট কাউন্সিলের একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হয় এবং নবদ্বীপচন্দ্রকে অন্যতম সদস্য ও সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। রাজা স্বয়ং সভাপতির পদ অলংকৃত করেন কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে নবদ্বীপচন্দ্রকে সভাপতির পদ গ্রহণ করে সভার কাজ পরিচালনা করার আদেশ দেওয়া হয়।[১৫] বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দের ২৩ অগ্রহায়ণ বীরবিক্রম কিশোরের নাবালক অবস্থায় যে কাউন্সিল অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠিত হয় তার সভাপতি পদে নবদ্বীপচন্দ্রকে নিযুক্ত করা হয়।[১৬] ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দের ১৭ ভাদ্র বীরবিক্রমের আমলে ব্যবস্থাপক সভা (Legislative) কাউন্সিল গঠিত হয় এবং নবদ্বীপ বাহাদুরকে কাউন্সিলের সদস্য ও সহ-সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়।[১৭] ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখের এক ঘোষণায় বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য যে মন্ত্রী পরিষদ বা একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করেন নবদ্বীপ বাহাদুরকে সেই মন্ত্রীসভার সভাপতি তথা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন।[১৮] বীরবিক্রম তাঁকে 'মহামান্যবর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের ২৯ ভাদ্র কলিকাতায় নবদ্বীপচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ২২ বৎসর তিনি রাজ্যের প্রশাসকের মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এরূপ শিক্ষিত বিরল চরিত্রের মানুষ সবযুগেই শ্রদ্ধেয়।

তাঁর মৃত্যুতে ৩ দিন ব্যাপি রাজ্যে ও জমিদারীতে শোক পালন করা হয় এবং অফিস আদালতে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

তথ্যনির্দেশ ঃ—

১। মরূপ, শরৎ কী ঈচেল, ১৯৮০ খ্রিঃ পৃঃ ১১৩।
২। সিংহ কৈলাসচন্দ্র ঃ রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত (বর্ণমালা সংস্করণ), পৃঃ ১৬২।
৩। সিংহ কৈলাস চন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৬৬।
৪। তদেব ঃ পৃঃ ১৬৮।
৫। সিংহ কৈলাসচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত , পৃঃ ১৬৯।
৬। তদেব ঃ পৃঃ ১৬৯।
৭। তদেব ঃ পৃঃ ১৭৫।
৮। Decision of the Sadar Dewani Adalat dated 24.3.1809 Ramganga Deo appilent vs. Durgamani Jubaraj.
৯। সিংহ কৈলাস চন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লেখিত, পৃ ঃ ১৮২
১০। তবে ঃ পৃঃ ১৮২।
১১। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংল, পৃঃ ১২৮
১২। তদেব ঃ পৃঃ ১২৯
১৩। তদেব ঃ পৃঃ ১৭২

ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক অবস্থা

নবদ্বীপচন্দ্রের কালের আগরতলা তথা ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করার পূর্বে ত্রিপুরা রাজপরিবারের অন্তঃপুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। ত্রিপুরার রাজাদের পূর্বেকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত হয়েছে মণিপুরী কন্যাদের রাজমহিষী করে অন্তপুরে আনার সময় থেকে। পূর্ব ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে ত্রিপুরার রাজাগণ ত্রিপুর সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ কন্যা বধূরূপে নির্বাচন করতেন। বিশেষ করে প্রতাপশালী প্রধান সেনাপতিদের কন্যা এক সময়ে ত্রিপুরা অন্তপুরে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। নিজের গুণপনায় তাঁদের এ কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাজার তরবারির জোর ও ক্ষমতাই তাঁদের রাজমহিষী হতে বাধ্য করেছিল। রাজবধূ হবার পরে রাজার নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের নতুন নাম রাখা হত। যেমন 'আচোঙ্গ ফা রাজা/ আচোঙ্গা মা রানী' বা অমর মাণিক্যের রানী অমরাবতী ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক কালে ত্রিপুর সমাজের বাইরে বিবাহ করার সূচনা করেন ২য় রাজধর মাণিক্য। তিনি মণিপুরের রাজা বিখ্যাত জয়সিংহের কন্যা হরিশেশ্বরীকে বিবাহ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন রাণীর সঙ্গে অনেক সেবক সেবিকা আসে ত্রিপুরাতে। তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে তৎকালীন রাজধানী সংলগ্ন মেখলীপাড়া। ত্রিপুরীরা মণিপুরীদের 'মেখলী' নামে আর মণিপুরীরা ত্রিপুরীদের 'তাখেল' নামে অভিহিত করে। তারপর থেকেই ত্রিপুর-রাজগণ, নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করার তাগিদেই হউক বা মণিপুরী রমণীদের রূপ লাবণ্যের প্রভাবেই হউক, মণিপুরী নারী বিবাহ করতে শুরু করেন। ত্রিপুর-রাজগণ নিজেদের হস্তিনাপুর-সম্ভূত ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতেন। যাই হউক, ঐ সময় থেকে তাঁরা আসাম ও মণিপুরের নব্যক্ষত্রিয় মহিলাদের ঘরণী করে নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যে রত ছিলেন। মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য (১৮১৩-১৮১৯ খ্রিঃ) থেকে শুরু করে শেষ নৃপতি বীরবিক্রম কিশোর পর্যন্ত এ প্রয়াস অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে বিশ শতকের প্রায় তিন দশক অবধি মণিপুরী রমণীরা ত্রিপুর অন্তঃপুরে আধিপত্য করেন। রাধাকিশোর মাণিক্য অবধি তারাই পাটরানী বা প্রধানা মহিষীর পদ দখল করে থাকেন। রাধাকিশোর মাণিক্য ক্ষত্রিয়ত্বের খুঁটি বেশ শক্তভাবে লোকহৃদয়ে গেঁথে গেছে বিবেচনা করে, নিজের দানশীলতার প্রভাবে, উত্তম বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে প্রথমে উত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবার চেষ্টা করেন। তিনি সাফল্য লাভ করেন, পুত্র বীরেন্দ্র কিশোরের বিবাহ নেপালের রানা পদমজঙ্গ বাহাদুরের কন্যাদের সঙ্গে দিয়ে। তারপর থেকে আর কোন মণিপুরী রাণী প্রধান রানীর পদ অলংকৃত করেননি। মণিপুরে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ, বার্মার সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে অনেক মণিপুরী দেশত্যাগ করে কাছাড় ও বাংলাদেশের শ্রীহট্টজেলাতে চলে আসে। উর্বর কৃষিভূমির সন্ধানে ও শান্তিতে বসবাস করার প্রয়াসে বেশ কিছু উদ্বাস্তু পরিবার ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে বসবাস করতে শুরু করে। ত্রিপুরার মণিপুরী প্রজাবৃদ্ধি শুধু বৈবাহিক

সূত্রে নয় বরং বাঁচার তাগিদেও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দেখা যায় বধূ নির্বাচন কালে শুধুমাত্র রাজবংশীয় কন্যাদেরই গ্রহণ করেন নি বরং সাধারণ মণিপুরী কন্যা ত্রিপুর-রাজঅন্তঃপুরে রাণী রূপে প্রবেশ করেছে।

আমাদের আলোচনার পরিধি নবদ্বীপচন্দ্রের কাল অর্থাৎ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অভ্যুদয়ের পূর্বপর্যন্ত। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩৩ বর্ষকালে মণিপুরী রমণীরা ত্রিপুর রাজঅন্তঃপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মণিপুরী রাজকুমারী কুটিলাক্ষীদেবী মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্যের প্রধানা মহিষী। মণিপুররাজ মারজিৎ এর কন্যাত্রয় চন্দ্রলেখা, বিধুকলা ও অখিলেশ্বরী কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাণী। এছাড়াও তিনি মণিপুরী ব্রাহ্মণ কুমারী পূর্ণলেখাকেও বিবাহ করেন। পরবর্তী রাজা কৃষ্ণকিশোরের পুত্র ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। তিনি তিন মণিপুরী কন্যা বিবাহ করেন। তাঁরা হলেন মইবাংথেম বালা মুক্তাবলী, কৈসাম বালা জাতিশ্বরী এবং খুমনথেম বালা চন্দ্রেশ্বরী দেবী। মুক্তাবলীর পুত্র রাজকুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, জাতিশ্বরীর পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র ও রোহিনীচন্দ্র এবং চন্দ্রেশ্বরীর এক কন্যা। দেখা যাচ্ছে, এই তিন পুরুষে ত্রিপুর অন্তপুরে মণিপুরী চাঁদের হাট বসেছিল।

মণিপুরীগণ গোঁড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দেবতা বিগ্রহ নিত্যসেবা পূজা করে থাকেন। হরিশেশ্বরীর নিজস্ব বিগ্রহ রাধামাধব আজও রাজধানীর উল্লেখযোগ্য দেবতা। এই রাণীগণ তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা ত্রিপুরঅন্তঃপুরেও প্রবাহমান রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র প্রভৃতির উপাসনা, ভজনা, পূজা, অর্চনা অব্যাহত রাখেন। ধর্ম মণিপুরীদের প্রাত্যহিক জীবন চর্চা। তাঁরা নানা উৎসবে দেবতার সামনে নৃত্য গীতাদি পরিবেশন করতেন। দৈহিক রূপের সঙ্গে কলাবিদ্যার পারদর্শিতায় ত্রিপুর জনসমাজ মুগ্ধ হলেন। প্রাসাদে বৈষ্ণব ধর্মীয় গ্রন্থাদির পাঠ ও কীর্তন শুরু হল। গ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্তন ধর্মশ্চর্যার অঙ্গ। কৃষ্ণসেবাতে তুলসীপত্র আবশ্যক, কাজেই প্রাসাদে তুলসীগাছ বসানো হল, তুলসী মঞ্চ তৈরি হল। তাঁদের নৃত্যগীতে ত্রিপুররাজগণ এতই মুগ্ধ হলেন যে প্রাসাদ অঙ্গনে তমালবৃক্ষ রোপন করা হল। তমালবৃক্ষ ঘিরে পাকা বেদী তৈরি করা হল। এই বেদীতে রাসলীলার নৃত্যগীত সম্পন্ন হত। এই রাসলীলাতে অন্তঃপুরিকা মণিপুরী রমণীগণ বিভিন্ন ভূমিকাতে অভিনয় করতেন নৃত্যগীত সহযোগে। এ ভাবেই ত্রিপুর অন্তঃপুরে এক অপূর্ব বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া তৈরি হল। এবং এই বাতাবরণেই ত্রিপুর সন্ততি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

অবশ্য ত্রিপুররাজগণ পূর্ব থেকেই অনেকে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। মুকুন্দ মাণিক্য প্রভুনিত্যানন্দের বংশধর বৃন্দাবনচন্দ্র দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নির্মাণ করিয়ে মন্দির তৈরি করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন রাজধানী উদয়পুরে। গুরুর প্রতি ভক্তিবশত বিগ্রহের নামাকরণ করেন বৃন্দাবনচন্দ্র। মধ্যযুগীয় ত্রিপুরার মুদ্রাগুলির বিশদ পরীক্ষা করলে বিশেষ রাজার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষ্য মেলে। নারায়ণ চরণপর, শিব, কালী ও বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্যের বন্দনা বিরূদগুলিতে করা হয়েছে। ত্রিপুরী ঘরাণাতে বৈষ্ণব ভাবধারা পূর্বেও ছিল, শ্রীহট্টের সঙ্গে ভৌগলিক ও রাজন্যশাসনের দীর্ঘ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, মণিপুরী কলাবতী রাণীদের সাহচর্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে

ক্রমে প্রাসাদ অতিক্রম করে রাজধানীর সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য এজন্য ত্রিপুরদের কুলদেবতা চতুর্দশ দেবতা বা কুলদেবী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর রাষ্ট্রীয় পূজাতে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়নি। জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মীয় উৎসব পালনের প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রজাগণ একসঙ্গে ঢোলক বাজিয়ে সুমধুর সঙ্গীত সহযোগে রাজপথে নৃত্য করে হোলি উৎসব পালন করে প্রত্যেকে প্রত্যেককে আবির মাখাচ্ছে এ দৃশ্য তৎকালীন দেশীয় রাজ্যে অকল্পনীয়।

অপর দিকে ত্রিপুরার রাজাদের প্রাচীন সংস্কৃতি কি ছিল তার বিশেষ বর্ণনা রাজমালা জাতীয় আকর পুস্তকগুলিতে পাওয়া যায় না। মিথিলা থেকে আগত সঙ্গীতবিদ দ্বারা ত্রিপুরায় সঙ্গীতের প্রসার প্রভৃতি ব্যতীত বিশেষ কিছু আকরগুলিতে পাওয়া যায় না। সে কালে আগরতলায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা, রাগাশ্রয়ী, কীর্ত্তন, হোলি, গাজন প্রভৃতির গান হত। বাংলার ব্রতকথা ও বাংলা সাহিত্য চর্চা খুবই হত। কের ও খারচী ব্যতীত অন্য কোন উৎসবের তাৎপর্য বা বর্ণনা রাজমালাতে নেই। তার অর্থ এই নয় যে একটি বিশেষ নরগোষ্ঠীর সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি কিছুই ছিল না। সোজা কথায় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রাচীন সঙ্গীত ও নৃত্য সে সময়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। ক্রমাগত পরিচর্যা বা চর্চার অভাবে আদি ত্রিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্য ম্লান হয়ে যে শূন্যস্থান তৈরি করেছিল সেই শূণ্যস্থানে মণিপুরী নৃত্যগীত জাঁকিয়ে বসেছিল। উপযুক্ত বিষয়বস্তু, উজ্জ্বল বর্ণময় পোশাক, যথাযোগ্য শিক্ষা ও তালিম এবং কলাবিদদের রূপ প্রভৃতি গুণে সেকালে মণিপুরী সংস্কৃতি আগরতলার সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল। কোন বিশিষ্ট অতিথির সম্মানে ত্রিপুরী নয়, মণিপুরী নৃত্যগীত পরিবেশন করেই অতিথির মনোরঞ্জন করার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল।

এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে নবদ্বীপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যকাল ও শৈশব কাল এই সাংস্কৃতিক পরিবেশেই কাটিয়েছেন। নবদ্বীপচন্দ্র তাঁর বৈষ্ণব পিতার অসীম গুরুভক্তি প্রত্যক্ষ দেখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে পরে তিনি জেনেছেন যে রাজা গুরুভক্তি হ্রাস হবার ভয়ে কিভাবে জীবনদায়ী ঔষধ গ্রহণ না করে কেবল গুরুর অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মহারাজা ঈশানচন্দ্রের আচরণই প্রমাণ করে যে বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া কি ভাবে রাজপুরী ছেয়ে ফেলেছিল যার ফলে নীলমণির সেবক রাজগুরু প্রবলপরাক্রান্ত পুরুষানুক্রমিক শাসকগোষ্ঠীর ত্রিপুরদের পর্য্যুদস্ত করে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন। পিতা ছাড়াও তিন মাতার প্রভাব নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনে পড়েছিল। অবশ্য এভাবে প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। গৃহহারা রাজপুত্রের উৎকণ্ঠা আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রবাসে তাঁর মাতৃদেবীর বাসনা চরিতার্থে আয়োজিত নারায়ণ পূজার সামগ্রী সংগ্রহ ও পুরোহিত নির্বাচনে। মায়ের মনোমত পূজার সাফল্যে তিনি কুল পুরোহিত নতুন করে নির্ধারণ করেছিলেন। ঈশানচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় ভাব, কীর্তন, ভজন, কবিতা রচনা, ঢোলক বাদন ও গুণী সমাবেশকরণ সে কালের ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এভাবে পুরো রাজপরিবার বৈষ্ণবীয় আচারে, আচরণে, কৃত্যতে ভরপুর হয়েছিল মণিপুরী রাণীদের প্রভাবে। তাই এই কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সেকালে ত্রিপুরা বিশেষ করে রাজধানীর সাংস্কৃতিক জগৎ মণিপুরী সংস্কৃতিতে আপ্লুত হয়েছিল।

১

সকল সন্তাপহারী শ্রীহরি জননীকে অকৃতী লেখকের গর্ভবহন-দুঃখ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন ১৭৭৫ (১২৬০ সাল) শকাব্দের মাঘ মাসের ১৪ই। পোনর বৎসর পরে প্রবীণ রাজজ্যোতিষী বৃন্দাবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় Extra strong Blue Laid foolscap কাগজে খয়েরের জুলসে কালিতে "সমানি সমশীর্ষানি ঘনানি বিরলানি"—লেখার মধ্যে জ্যামিতিক ঘন ক্ষেত্রের আকার এবং গুঢ়ার্থগর্ভ নর-শরীর চিত্রের অবকাশে অসহনীয় সমত্বরূপ বিমেচিতপ্রায় একটা মোটা নলের মত বটা কোষ্ঠীপত্র আমাকে আনিয়া দিলেন। আমি কোষ্ঠীটা জননীদেবীর হাতে নিয়া দিতেই তিনি তখনই শুভাশুভ ফল জানিতে চাহিলেন। আমি শুরু করিলাম—সৌর মাঘস্য চতুর্দশ দিবসে জীববাসরে-কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ দিবা কার্ম্মিক ষড়দণ্ডাভ্যন্তরে-কুম্ভলগ্নে- শনেঃ ক্ষেত্রে-চন্দ্রস্য হোরায়াং-কুঞ্জস্য দ্রেবকানে-কুজস্য নবাংশে শুক্রস্য দ্বাদশাংসে-বুধস্য ত্রিংশাংশে-বুধস্য সপ্তাংশে কুজস্য যামার্দ্ধে রবোর্দস্তে-মাহেন্দ্রস্য ক্ষণে-বুধাদিত্যযোগে-গুরুচন্দ্রমাযোগে—রাহুতুঙ্গীযোগে শুক্রশনি-রাহুনাং কেন্দ্রীযোগে-আদি সিংহাসন যোগে-হেমচ্ছত্র যোগে-শনিরাহু যোগে-ষটশূন্যযোগে গুরুর্মূল ত্রিকোণ যোগে-উভয়চরী যোগেষু-

২

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ভূপতেঃ শুভদ্বিতীয় কুমার শ্রীমন নবদ্বীপ দেববর্ম নাম, তস্য মূলানক্ষত্রাশ্রিত ধনুরাশৌ চন্দ্রকৌণপগণোয়ং ক্ষত্রিয় জাতি রাশিঃ।" তারপরে ক্রমে যোগবর্গ-কোষ্ঠী-কলাদি একে একে পড়িয়া গেলাম। শাস্ত্রে আস্থাবতী মাতৃদেবী অত্যন্ত মনযোগ দিয়া শুনিলেন। আয়ুর নির্দেশ শুনিয়া তিনি নীরব থাকিতে পারিলেন না, সাগ্রহে বলিলেন—" মহারাজ তাহাই বলিতেন।" জননী মাতৃস্নেহ সঞ্জাত মিশ্র শঙ্কা-ভরসা-প্রার্থনায়ই যেন অঞ্জলীবদ্ধ হস্ত মাথায় তুলিলেন। আমার ভিতরকার সুপ্ত সয়তান জাগিয়া উঠিয়া একথার লাইমলাইটের দাবীদার হইয়া পড়িল। আমি এমন বেসুর ধরিলাম যে music -র স্কেলেটাই বেজার উলট পালট হইয়া গেল। পুরাতন শাস্ত্রের দৈবমাত্র সংস্কারটা বাড়ন্তর দিকে চলিয়া শেষকালে প্রতিক্রিয়ার বিক্ষেপটাকে জোর করিয়াই যেন আপনার উপরে টানিয়া লইয়াছিল। আবার পৌরষ বাদটা নূতন খোলা মাঠে তখনই তেমনই অসংযত অশ্বের মত যথেচ্ছ দৌড়িতে শুরু করিয়া দিল। সেই তখনকার সাধারণ mentality -র কথা আমি বলিতে বসিয়াছি, যখন নূতন শিক্ষা ও সংস্কার হইতে কেন্দ্রবিসপী (centrifugal) বিদ্যুদ্বিকিরনের মত এই প্রতিক্রিয়ার শক্তিটা ছড়াইয়া পড়িয়া electric area -র আকারে ছোট বড় শিক্ষার্থী মাত্রেরই ঘনীভূত আবরণরূপে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তরুণের অসহিষ্ণু মস্তিকে যে এই অসংযত বিদ্রোহের শক্তিটা অধিকতর জাগ্রত থাকিবে সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি প্রশ্ন তুলিলাম —"এই যে বিদ্যারত্ন মহাশয় যোগের ফল লেখিলেন, কোথাও 'হয় গজ -নর-নৌকা-মেদিনী মণ্ডলাং

ভবাতি বিপুললক্ষী রাজ রাজ্যে। ধনাঢ্যঃ কোন স্থলে 'ভূপালগণ সেবিতঃ' আবার ধনাঢ্যোমাননীয়ো নৃপানাং অন্যত্র 'নৃপশ্চির গোমহিষাশ্ব কুঞ্জরৈয়ুক্তা ভবেন্নরপতি ধনেনো গুণাঢ্যঃ' আবার 'নৃপএব যোগঃ স্বরাজভুঙতে' পুনর্বার 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি'— ইত্যাদি।

৩ক

ইহাতে যদি সেই সময়ে ভুমিষ্ঠ বহুজাতকের সকলেরই সাম্রাজ্যলাভ হয় তাহা হইলে সকলের জন্য ঠাঁই হওয়াও ত সহজ ব্যাপার নয়।" বলা বাহুল্য জননী, পুত্রের এই শাস্ত্রদ্বেষ ও অনাদর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মর্মাহত হইয়াছিল। এবং তাহার শিক্ষাদীক্ষার উপরে যে তাঁহার ভরসার স্থলে ভয় আসিয়া স্থান জুড়িয়া লইয়াছিল, তাহাও বলাবাহুল্য। কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিয়া গেলেন না। তিনি দৈব পুরুষাকারের সঞ্চিত বিশ্বাসটি নানা কথায় আমার মনে সংস্কার ধরাইবার চেষ্টা করিলেন। সে বহু কথা, তার সকলগুলি বাদ দিয়া যে কথার ছাপ বাস্তবিকই আমার মনে ছাপ ধরারই মত রহিয়া গেল, আজিও মুছিয়া যায় নাই, কেবল তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করি। বাস্তবিক শিক্ষা বলিতে যাহা বোঝায় জননীদেবীর তাহা আদৌ ছিল না। শৃঙ্খলিত যুক্তি বা বিচারণার সুপ্রণালী তাঁহার ভাষায় ছিল না। এক কথাকেই অনেক কথার সাহায্যে যদি বুঝাইতে পারেন তাঁহার লক্ষ্য ছিল তাহাই—তার অনেকটাই "Argumentum advercumdium-প্রীতিন্যায় বা ভক্তিন্যায় "হিন্দু বৈজ্ঞানিক কোষ" An appeal to a persons modesty. যা হৌক জননীদেবী কথাটাকে "কর্দমযষ্টি" ন্যায় বলা চলে। কাদায় হাঁটিতে গেলে যষ্টির প্রয়োজন পড়ে কিন্তু সকলেরই যষ্টি জুটিয়া উঠে না; আবার যে কয়জনের যষ্টি সংগ্রহ হইয়া ওঠে তাহাদের যষ্টিলাভবত্তায় প্রভেদ না থাকিলেও যষ্টি ব্যবহারের অসমান যত্নে কেহ কেহ পদ-স্খলন এড়ায়, অনেকেই তাহা এড়ায় না। এইক্ষন এই বহু জাতকের মধ্যে একটি কি দুইটি মানুষের মত মানুষ থাকিতে পারে যাহাদের যষ্টি আদ্যন্ত পথ তৃতীয় পদেরই মত কাজ করিয়া যায়। সাম্রাজ্যলাভ এই একটি কি দুটি মানুষের জন্য সম্ভবপর হয়। এবং তাহা হইলে এই ঠাঁই হওয়াও নিতান্ত কঠিন ব্যাপার দাঁড়ায় না!

আনি অনুভব করিলাম, আমার তর্ক-বুদ্ধির ধার বাস্তবিক মোটাই হইয়া গিয়াছে।

৩খ

বাস্তবিক এই শিক্ষার মন্বন্তর আসিয়া পড়িয়াছিল সংক্রামক মহামারীই মত, যাহা এড়াইবার জন্য উদ্বিগ্ন অভিভাবকের পথ খুঁজিবার অবসর ছিল না। বালকের মুখে প্রলাপের মত কথাও শুনিয়া যে তাহাদের একেবারে চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে ইহা বলিতে হইবে না। পূর্বে বৃদ্ধ যুবক বালক, অন্যদিকে পণ্ডিত অ-পণ্ডিত এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কয়টা ক্রম, সকলেরই ভাব-ভাবনা ও অনুপ্রেরণার উৎপত্তিমূল ছিল মাত্র একটি। তার মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তাহা কেবল ন্যূনারিতেকের ক্রম লইয়া—পরিমাণ মাত্রার প্রভেদ মাত্র। 'দাতাকর্ণ' কাহিনী এবং যম নচিকেতা সংবাদ পড়িয়া বালক ও পরিণতবয়স্কের মনে সন্দেহের বর্জিত পরদা বাজিয়া উঠিত না।

অথবা 'দৈবপ্রভাব' বিশ্বাসই আসিয়া যখন তখন উপায়হীন মানুষের ভিতরে সম্পূর্ণ সঙ্গতি সাধন করিয়া দিয়া যাইত। অসঙ্গতি আসিবার ও পূর্বে Libenity এবং দার্শনিক মতে বিদচিৎ দুইয়েরই সৃষ্টির পূর্বে তাহাদের মধ্যে সঙ্গতির অনাদি প্রতিষ্ঠার মত (prescribed harmoney) সমাজের মনেরই শান্ত নিরুপদ্রব এমন অবস্থা আসিয়া দেখা দিল একটা বেয়াড়া বিদ্রোহী নমুনার বিচার ও ভাবনার পদ্ধতি। ছয়মাস পূর্বে যে বালক দাতাকর্ণ পড়িয়া বৃষকেতুর মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কাহিনীর মধ্যে বিশ্বাস না করিবার মত কিছু ভাবিয়া পাইত না, ছয়মাস পরে সেই বালক বিদ্যালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরের দেবমূর্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলে—

"পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না"— ইত্যাদি এখন তাহা হইতেই কি বিদ্যালয় ও বাড়ির শিক্ষার এই অপূর্ব হরগৌরী চেহারা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল কি না কে জানে।

আনি জননীর পায়ের ধূলি হাতে করিয়া মাথায় ঘষিয়া বিদায় লাইলাম। তিনি সশ্রুলোচনে চাহিয়া রহিলেন। "কচ্চিদেতং ক্রুতং পার্থ....।" পঞ্চম বর্ষ বয়সে হাতেখড়ি। বিদ্যারম্ভের জন্য শুভ দিন নির্ধারিত হইল। স্নান করিয়া ফোঁটা কাটিয়া, কৌষেয় পরিধেয়-উত্তরীয় পরিধান।

৪

করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত ভালমানুষটি সাজিয়া, দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। তখন ভগবতী বাগ্দেবীর অর্চনা শেষ হইয়াছে। পুষ্প বিল্বদলে বৃহৎ ঘটকুম্ভ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। পুষ্প, চন্দন ধূনা অগুরুর গন্ধ ত নয়, বিহ্বলকারী বাস্তবতার গুরুচাপ, যেন গৃহবায়ু বহিতে পারিতেছিল না। শঙ্কামিশ্রিত কৌতূহলে দেখিলাম, পিতৃদেবের সম্মুখে ভবিষ্য শিক্ষক মহাশয় রামদুলাল শর্মা বিদ্যাভূষণ। ব্রাহ্মণের সদ্য মুণ্ডিত বৃহৎ মস্তক, চন্দনচর্চিত প্রশস্ত ললাট, প্রভাময় আয়ত চক্ষু, প্রতিশব্দ সেবিত কণ্ঠস্বর! ষাটের উপরে এমন একটা বিশিষ্টতাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে প্রথম সাক্ষাতের অনুভূতি ভুলিতেই পারা যায় না। তাঁহার ডোঙ্গার মত আঁজলের একরাশ পুষ্প বিল্বদলের বোঝা আমার ক্ষুদ্র করপুটে চাপিয়া রাখিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'অঞ্জলীর' মন্ত্র পড়াইলেন। তখনও স্লেটের সাক্ষাৎ দর্শন মিলে নাই, আদিম যুগের প্রণালীতে কৃষ্ণ প্রস্তরের থালায় খড়ির লেখা বর্ণমালার উপরে হাত চালাইতে হইল। এই হইয়া গেল বিদ্যারম্ভ। সে জন্য পঞ্জিকা বিচারের ত্রুটি অবশ্যই হয় নাই। অর্থাৎ তিথি,বার নক্ষত্রাদির এবং যুগকরণাদির সম্মিলনে এমন একটা ব্যূহ নির্মান করা গিয়াছিল যে, বহির্দিক হইতে জড়তা জিনিসটা কোন পাকে প্রকারেও প্রবেশের পথ না পায়। কিন্তু জিনিসটা যদি আদৌ ব্যূহের ভিতরেই পড়িয়া গিয়া থাকে! যা হৌক তারপর হইতেই বাগ্দেবীর নিত্য পাতায় কমলে

দাদার এই অগ্রজের কথা পরে বলিতেছি।

৫

অর্চনার পালা আরম্ভ হইল। দেখিতাম অধ্যাপক মহাশয়ের অধরে মধুর হাস্য তেমনি দক্ষিণ-পাণির মধ্যে স্বতঃ কম্পিতাগ্র যুগলীকৃত অঙ্গুল বেত্রের মুষ্টি সদাই বিদ্যমান থাকিত। আরও দেখিতাম শেষোক্ত পদার্থের আদবে পোশাকি লক্ষণ নাই, অর্থাৎ তাহা শোভা সাধনার্থে

বিদ্যাভূষন মহাশয়ের পাণি অলঙ্কৃত করে নাই, ঘাতপ্রতিঘাতে পিষ্ট বিপিষ্ট অগ্রভাগ বরং আটপৌরে ব্যবহারেরই সাক্ষ্য দান করিত। বলাবাহুল্য যে নূতন ছাত্রের লিখন পঠনের গতি আরম্ভের দিকে দমআঁটা ঘড়ির মতই চলিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে বড় বিহুলই থাকিতে হইল— একে ত এই মধুর রৌদ্ররসের সমাবেশে বিসদৃশ্য দৃশ্য সেই সঙ্গে শিরোপড়োর (অগ্রজের) শান্ত উদাসীন ভাব, এমন দেশ-কাল-পাত্রের বেখাপা সংস্থান জুটিয়া গেল কি উপলক্ষে বিশেষত কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া! আলোক বিজ্ঞানামোদিত দৃষ্টিপাত থাকিত প্রায় ৯০° কর্মীর স্বহস্তের কার্য্যে আর বিডনান্তর মতে ৪৫° ডিগ্রী দৃষ্টি চলিয়া যাইত, পরহস্তটার সঞ্চালনের দিকে; কেন না বেত্রযুগ্মের আস্ফালনের পূর্বাভাস সকল বার ঠিক পাওয়া যাইত না। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল অধ্যাপক মহাশয়ের দ্বিজিহ্ব শাসন শায়ক, ছাত্রপৃষ্ঠ বর্জন করিয়া ভূপৃষ্ঠ বা কাষ্ঠ নির্মিত ডেস্ক পৃষ্ঠের সহিত লেনাদেনার নিত্য সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছে। ছাত্রপৃষ্ঠের এই বিশেষ অধিকার বা অনধিকার যেমন দিনের পর দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে চলিল, অন্যদিকে পূর্বোক্ত, ঘটিকাযন্ত্রের চলতিতেও কিঞ্চিত ব্যভিচার।

৬

দেখা যাইতে লাগিল। যাহা হৌক একদিন শিরোপড়োর উদাসীনতার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। অসম্পূর্ণ দগ্ধ কালোমাটির গোলাকার মস্যাধার তার স্থলভাগ হইতে সমান্তরালে তিনটি সচ্ছিদ্র কর্ণ বা উদ্গতাংশ, বহন সৌকার্য্যার্থে ছিদ্র তিনটিতে রজ্জুবিদ্ধ করিয়া শিকাগড়া; খোল মুখ, তবুও Simplicity এবং economy র চূড়ান্ত বন্দোবস্ত। তরল মসী বিগলিত হওয়ার পথ রোধ করার জন্য ন্যাকড়া পুরিয়া দেওয়ায় কেবল লেখনীর অগ্রভাগ আদ্র করিবার পরিমাণ মসীটা মাত্র বাহির হইয়া আসিত। তাহারই অনুকরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, শতবর্ষ ব্যবহারের মসীপূর্ণ বিলাতি দোওয়াত বাহির হইয়াছিল—হায়রে প্রাচ্যসভ্যতা! বিশ্বশিল্পীর নির্মিত নলের লেখনি, মাথার চুল ছিল Penbrush; কানের Penrest কিনিবারও দরকারই হয় নাই, অধিকন্তু "চৌরেণপি ননীয়তে।" গৃহ-প্রদীপের শিখায় কালি, বৃক্ষপত্রে কাগজ, সে কি দিনই গিয়াছে! এই সকল স্টেশনারী সংগ্রহ করিয়া সারদা দেবীর উপাসনায় ভরতি হওয়া গিয়াছিল। আমাদিগের তখনকার যুগে লেখাই ছিল শিক্ষার প্রধান বা ব্যাপক অঙ্গ, অর্থাৎ যাহাতে 'Exact man' হওয়া যাইত আর কি। আপনার লেখাই পাঠ্য ছিল। তাহা ব্যতীত ছিল চাণক্য পণ্ডিতের সেই eternal নীতি সমুচ্চয়" কণ্ঠস্থ করা। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ছন্দঃপাত ত্রুটিটা অত্যন্ত লাগিত। তখন—

৭

তাঁহার বেত্রশায়কের আঘাত ভীষণ প্রতিধ্বণীতে গৃহ-ব্যোমটাই নাদময় হইয়া উঠিত। অধ্যাপনায় বসিলে তাঁহার জন্য রেকাব ভরা পানসুপাড়ী আসিত। সেই অভ্যাস তাঁহার পরবর্তী জীবনেও তেমনই রহিয়া গিয়াছিল। তিনি আমাকে বলিতেন, "তোমরা যে অভ্যাসটা

ধরাইয়াছিলে তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি পাই নাই। তিনি সুস্থ, সবল আয়ুষ্মান পুরুষ, বৃদ্ধবয়সে কাশী বাস করিতেন, এবং নব্বই বৎসরেরও অধিক বয়সে বিশ্বেশ্বরের পদতলে দেহমুক্ত হইয়াছিলেন। অধর্ম অন্যায়ের বুদ্ধিতে তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিকল-বিবশ হইয়া পড়িতেন। সেই নির্ধন তেজস্বী ব্রাহ্মণের পৌরুষময় ত্যাগের এবং প্রেমসম্পদের কতই না পরিচয় পাইয়াছি। একদিন তিনি অশ্রুভরা চক্ষে বেদনাপুষ্ট স্বরে বলিয়াছিলেন—"আর সন্ধ্যা পূজা করিব না, এই 'আমিটাই'; আছে আর সেই 'আমির' কাহারও নিকট কোন দায়িত্ব নাই!" যে ধর্মবিশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসেরই মত জীবনকে পোষণ করিয়াছিল তাহারই প্রত্যাখ্যান! মনের যে অবস্থায় মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়—'I do not understand how God, the father of men can torture his children and grandchildren and hear their cry without being tortured himself"— এ নিশ্চয় সেই নৈরাশ্য ক্লিষ্ট হৃদয়ের ভাষণ। এ ত উত্তেজনার ভাষা নয়-মস্তিষ্কে রস-রুধিরের উদ্দাম উৎসপূর্ণ জ্ঞানের বিনাশ নয়, Apoplexy নয়, এ যে অবিক্ষিপ্ত জ্ঞানের অবস্থা বেদনায় হৃৎপিন্ডের সমস্ত রক্ত বাহির হইয়া পড়ার রোগটা রাজ যক্ষা কি সে মর্মবিদারী অভিমান। প্রত্যাখ্যানের সামগ্রী কতখানি হৃদয় জোড়া! কিন্তু এই তেজোবত্তা, এই ফল্গুসিকতার অনন্তি নিম্নেই বাহিত, শীতল প্রীতির প্রবাহ। পিতৃবিয়োগের পরে, তাঁহার সান্ত্বনাশীতল অঙ্কে শান্তিশ্রুতি কত না পুরাণ কাহিনী শুনিয়াছি; শুনিতে শুনিতে কখন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছি; ক্বচিৎ কোনদিন জাগ্রত হইয়া দেখিয়াছি, তাহার বৃহদায়তন চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত, ঘন শ্বাসে বক্ষস্ফীত, তবুও ছাপাইবার যত্নপরতার ত্রুটি নাই। বয়স্ক হইয়া যখন যে দুর্ব্বোধ্য সমস্যায় পড়িয়াছি মাত্র সুরাহা পাইবার জন্য তাঁহারই নিকট দৌড়িয়া গিয়াছি।..... (পাঠ উদ্ধার করা যায় নি।)

৮

গলাধঃকরণ করতে হয় নাই কখনও উত্তর। এই প্রবল আকর্ষণী আমাদিগকে তাঁহার নিকট টানিত। আমাদের মধ্যে কেহ বলিয়াছিল যে তাঁহার ভাবনা যেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিচিত প্রণালীর বাহিরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহার উত্তরে, আমার মনে আছে, তিনি বলিলেন যে তাহা হইয়া যায়, কেবল আমাদের রুচির খাতিরে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভাবনা বা ভাবদ্যোতনার ধারা হারাইয়া তিনি সত্যিই অব্রাহ্মণ হয়েন নাই। রাজসভায় কেন, রাজপুরীতে যাহাদের অবস্থান, তাহাদের নির্দিষ্ট কর্তব্যের প্রকৃতি যাহাই হউক, সকলেরই রাজনৈতিক বৃত্তিটার অনুশীলন করতে হয়, জলচরের সন্তরণ শিক্ষার মত অপরিহার্য করাবেই। আর আবশ্যকতার সঙ্গে সফলতার সমাবস্থান বিধাতারও একটা ব্যবস্থা। এমন কথা অনেক সাধুসন্ন্যাসীর নিকট শোনা গেছে যে, যে বনে সবিষ সর্প প্রচুর সংখ্যায় বাস করে সেখানে অনুকূল মৃত্তিকা বায়ুর প্রভাবে বিষ-চিকিৎসার সৌকার্য্য সাত্বক গুল্ম-লতাদিও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জন্মায়। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার অনুকূলে বায়বীয় অবস্থা দাঁড়াইয়া গেলে যে উচ্ছলিত পরিমাণে ফসল জন্মাইবে সে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন পড়ে না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাজদ্বারে পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী ছিলেন, সে কেবল স্মৃতির ব্যবস্থার জন্য তদানীন্তন

রাজামন্ত্রীর মন্ত্রণাগারেও তাঁহার অনেক সময় কাটিত। তিনি সাহিত্যচর্চাশীল ছিলেন। সমস্ত সংহিতা হইতে 'রাজধর্ম' সংগ্রহ নামে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেখানি মুদ্রিত হইয়া গেলে তিনি আর একটি স্মৃতির ব্যবস্থা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

৯

সেখানি মুদ্রিত হয় নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় মুদ্রিত পুস্তকখানাও এখন পাওয়া যাইতেছে না। আমার বিমাতা দিগের মধ্যে প্রথমা রাজমহিষী বা ঈশ্বরী *রাজলক্ষ্মী মহাদেবী প্রসূতিকা ছিলেন না। পাঞ্জাব হইতে যে সকল ক্ষত্রিয়েরা পশ্চিমবাংলায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন, জেলার ভাগে তাঁহাদের অধিকতর সংখ্যাই বর্ধমান জেলা নিবাসী। বর্ধমান জেলার তাঁরাচাদ বর্মা রাজলক্ষী মহাদেবীর পিতা। তিনি কন্যা দান করিয়া ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতামহ মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের একজন প্রধান সভাসদ ছিলেন। জাত-সন্তানা গর্ভধারিণী এবং অপর দুইজন রাজমহিষী। তাঁহারা তিন জনেই মণিপুরী ক্ষত্রিয় বংশীয়া। ইঁহাদিগের মধ্যে আমার একজন বিমাতা প্রথমে কন্যা এর পরে পুত্রসন্তান প্রসব করেন। লেখক তৃতীয় সন্তান। চতুর্থ 'কন্যা সন্তান' অন্য বিমাতার গর্ভজাত। পঞ্চম লেখকের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। লেখক ছাড়া সকলেরই ন্যূনাধিক অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ হইয়াছে।

এখানে অল্পায়ু জ্যেষ্ঠের কয়টি কথা বলিব। তিনি আমার কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরের বড় ছিলেন, অর্থাৎ ১২৬১ ত্রিপুরাব্দের (বাংলা সন ১৩৫৮) পৌষ মাসে ভূমিষ্ঠ হন। অগ্রবর্তীতার সাধারণ (ত্রিপুরার রাজমহিষীরা ঈশ্বরী নামে পরিচিতা।)

১০

ক্রমিকগতি ছাড়াও তাঁহার চিত্তবৃত্তির উন্মেষের আর একটি সহায় ছিল প্রতিভা। দুই কেন্দ্র হইতে এই দ্বিগুণিত বেগবল তাঁহাকে আমার যথেষ্ট পুরোভাগে চালিত করিত। প্রতিভাশালী ব্যক্তি নিত্যায়াসশীলতার দাসত্ব স্বীকার করে না। এই বিশেষত্ব দাদার স্বভাবেও সুব্যক্ত ছিল। কণ্ঠস্থের কথায় কোন কালেও কর্ণপাতও করিতেন না। সকল প্রকার সাধনার জন্য আগামী কালের প্রতীক্ষা থাকিত। আর শেষ মুহূর্তে প্রবল আবেগের দুর্ধর্ষ শাসনের নিষ্পত্তি—এ প্রায় প্রতিকার্য্যেই দেখা যাইত। স্বীকৃত জড়তার সহিত অবিচ্ছেদ্য যত্ন-পরতার পোষাণি থাক, বা না থাক, আবেগটা দেখা যায় প্রতিভার সুপরিচিত গতিশক্তি। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে দাদা সর্বদাই কঞ্চির কলমে কলার পাতে চিত্রকলার অনুশীলন করিতেন। অনেক দিনের কথা, প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, একদিনের কথা মনে হয়; বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে ঙ এর ফলা লেখাইতে আরম্ভ করিয়া একটু বিব্রত হইয়াছিলেন, নিয়মটা আমাকে সহজে ধরাইতে পারিতেছিলেন না। শেষটা তিনি দাদাকে ভার দিলেন—'ফলাটা তোমার ছোট ভাইকে খুব সহজে বুঝাইয়া দেও ত। গোল করিতে পারিবে না। দেখিও।" দাদা

প্রথমে পাঁচটা বর্গের পঞ্চম গুলিতে ক্রমে এক দুই তিন চারি পাঁচ সংখ্যা বসাইয়া গেলেন। তারপরে আমাকে বুঝাইতে শুরু করিলেন 'ক' হইতে শুরু করিয়া প্রতি পাঁচটা বর্ণ, এক দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যার দেওয়া বর্ণের নীচে পর পর বসাইয়া যাও। এ হইয়া গেলে 'য' হইতে 'ক্ষ' কেবল

১১

'র' ছাড়া সবগুলি 'ঙ' নীচে বসাইয়া যাও, আমি অতি সহজে নীতিটা বুঝিয়া পাইলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন— "আজ আমাদের ছুটি"। এ বিবৃতিটা অপূর্ণ একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের, আপনার। এ সকল কথা পিতৃদ্বয়ের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু দেখিতাম, তিনি কথাশুনিয়া প্রফুল্ল হইতেন না বরং করুণ নিঃশ্বাসই ত্যাগ করিতেন। আমার অগ্রজ ও কনিষ্ঠ সহোদর স্বল্পায়ু হইবেন, পিতৃদেব কাহাকেও গোপন করিতেন না। তাহাদের কথা উঠিলেই তিনি দুর্ম্মনায়মান হইয়া পড়িতেন —তাঁহার বিবর্ণ অধরোষ্ঠে নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট আকুঞ্চন আসিত। আমি, সেই বয়সে প্রহেলিকার মত শুনিতাম, পিতৃদেবের সেই নৈরাশ্য ক্লিষ্ট স্বর আমাকে নির্দেশ করিয়া বলিত "কে জানে, ও কি আমার দায় শুধিবে"?

বস্তুর অস্বচ্ছ পৃষ্ঠে সূর্য্যের প্রতিকৃতি পড়ে না, মুকুরে পড়ে। সূর্যালোকে উদভাসিত ভিন্ন প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুতে আলোকমাত্র প্রতিফলিত হয়। মুকুরে কেবলই আলোক নয়, সূর্য্যের বিম্বত্ত সুস্পষ্ট পতিত হয়। তাই সেই সুস্পষ্ট বিম্ব হইতে কেবল আলোক নয়, উত্তাপ প্রতিক্ষিপ্ত হয়। 'রিতরসি গুরু প্রাজ্ঞে' কিন্তু হায় অকৃতি সন্তান! তোমার এই মার্জনাবিহিন মলিন মুকুরে পিতৃঋণের মাহাত্ম কেমনে বিম্বিত হইবে? তামস আবরণটা তোমার কেবল শরীরে নয় মনেরও বর্ম দাঁড়াইয়া গেল, এই যে যুগ যুগান্তর, সুর্যাস্তে ও সূর্য্যোদয়ে কাটিয়া গেল, কেবল স্থূল আদান প্রদানের মোটা সূতাই ত কাটিলে, কেবল আবর্জনাই ত কুড়াইলে; এখন যে দিগ্বলয়ের অন্ধকার।

১২

ঘনাইয়া মাথার উপরকার আকাশ ছুঁইতে চলিল, দিনের আলোক উদ্ভাসিত সহায়সম্পদ-গৌরব -উল্লাস সকলি যে একে একে দুর্বোধ্য ধাঁধার অন্ধকারে গ্রাস করিয়া ফেলিল; প্রতীক্ষাও তোমার কেবল বৈতরণী ফেরতা খেওয়া নৌকার!

১৩

পিতৃদেবের রাজত্বকাল অপূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষ। অর্থাৎ তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ১২৫৯ ত্রিপুরা সনের মাঘমাসে এবং স্বর্গারোহণ করিলেন ১২৭২ এর শ্রাবণে। বয়সের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই শোচনীয় ব্যর্থতার দৃশ্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যখন তাঁহার দেহত্যাগ হয় তখন তাঁহার বয়স ছিল তেত্রিশ বৎসর মাত্র। দায়িত্বের অনুপাতে বয়সের

ব্যবস্থিতির বিচার করিতে গেলে, মানিয়া লইতে হয় যে রাজ্য-শাসনোপযোগী বয়স তাঁহার সবে শুরু হইয়াছিল। যে দেশে শিক্ষিতের হার অত্যন্ত উচ্চ সেখানেও তেত্রিশ বৎসর রাজনৈতিক জীবনে পরিণত বয়স নয়। ফ্রান্সের ক্লেমেন্সা ৭৭ বৎসর বয়সে 'The grand young man' বলিয়া পরিচিত। ভারবহন ও উপভোগ দুইটা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রিত - Electric Battery র পরস্পর বিষম ক্রিয়া সঞ্চারী বিপরিত প্রান্ত (Negative and Positive)-দুই দিক। যখন এই ভার বা দায়িত্বের উপরে প্রভুত্বের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়া যায় তখন স্পষ্টই দেখা যায় যে যথেষ্ট উপভোগ তাহারও মধ্যে আছে। কিন্তু যে সময়টা তাহার জন্য চাই পিতৃদেব তাহা পায়েন নাই। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে তিনি রাজ্যভার সবেই রহিয়াছিলেন, রাজ্যভোগ তাহার জন্য সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার এই ত্রয়োদশ বর্ষ ব্যাপি রাজত্বকালের প্রথম ভাগে বলরাম দেওয়ান সাহেব, মধ্যে ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব এবং শেষের দিকে রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী মন্ত্রত্ব করিয়াছিলেন। অবশ্য, ইতিহাসের বাহিরে

১৪

তাঁহাদের বিস্তারিত প্রসঙ্গের ঠাঁই করা যায় না। আমি আমার প্রয়োজনে এই রাজমন্ত্রী তিনজনের কর্মজীবনের অংশবিশেষ স্পর্শ করিয়া যাইব মাত্র।

স্বতঃ বর্ধনশীল ব্যয়ের মুখ কমতির উল্টাদিকে ফিরাইয়া ধরা অবশ্যই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তবু অসাধ্যও নয়। যেহেতুক সেস্থানে মানুষেরই কাজ করে, আর একজন মানুষ আসিয়া হাত দেয়, দেবতার কাজে নয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে যেখানে সুচালক লোকটি আসিয়া জোটে সেখানে দেবতার প্রতিকূলতাকেও জিন লাগাম পরিয়া শান্ত বাহনটি সাজিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। ত্রিপুরার অর্থ সমস্যার পথে তদ্রুপ চালক বহুকাল আইসে নাই। তাই যখন ব্যয়ের চলতি আয়ের সীমা ডিঙ্গাইয়া গেল তখন, পাকা চুলে কলপ মাখা তৃপ্তির মত, আশুতৃপ্তি দায়ক সমাধান পাওয়া গেল কুসীদজীবি হইতেই। শেষে বড় বড় ব্যাপার দূরে থাকুক, সামান্য সাংসারিক কাজের জন্যও উত্তমর্ণের শরণ লওয়া রাজসরকারের নিত্যকর্ম হইয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরার নৈতিক বায়ুমণ্ডল হীনতার এত নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল যে বাহিরের দৃষ্টান্তে রাজার নির্লজ্জ আত্মীয়স্বজন এমন কি দাসদাসীরাও রাজ-সংসারের ব্যয়সঙ্কুলনের জন্য, শতকরা বার্ষিক তিনটাকা সুদ লইয়া, ধার দিতে থাকিল। রাজগৌরব রক্ষার সারবান যুক্তি, সম্মানরক্ষার উদ্বেগানুভূতি এবং উদ্দাম অতি তৎপরতার প্রতিযোগিতা বেশ কিছুকাল চলিয়াছিল। ওদিগে বৃটিশ ভারতে ত্রিপুরা-রাজ-জমিদারীর রাজস্ব বাকী পড়ে আর ত্রিপুরার আকাশ জুড়িয়া 'গেল গেল' হাহাকার উঠে।

১৫

শ্রেণীবৃত্তি ব্যবসায় অভেদে রাজ সংসারের উত্তমর্ণের গণ্ডি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর তার বৃদ্ধি ও 'পয়স্তি' বালির চড়ারই মত অবিরাম চলিল। বড় বড় ঋণের টাকা বাহির হইত, বর্তমান 'যুক্তপ্রদেশ বাসী' 'দেশওয়ালী', ('মুখ্যার্থে'), ব্রাহ্মণের ভিক্ষার ঝুলি হইতে। কিন্তু

ভিন্ন জাতির ব্যবসা ধরিলেও ব্রাহ্মণেরও জন্মজাতস্বত্ব-ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণের যে অধিকার তাহা ঘুচিবার নয়—"জন্ম না ব্রহ্মণো জ্ঞেয়'। সাহেব সাইলক হইতে হইতে আধুনিক কাবুলি এবং মধ্যবর্ত্তী বহু সমাজের কুসীদজীবির কোন একটির সহিত বক্ষ্যমান ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য প্রণালীর সাদৃশ্য ছিল না। এই ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় এই যে তাঁহাদের সূক্ষ্ম সংবেদন শক্তি এবং পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির আমলে বুকে ছুরি বা মাথায় লাঠির বাড়ীর মত মোটা সোজা অনিপুণ পন্থার ঠাঁই ছিল না। তাঁহারা 'ধরণায়' বসিয়া পরিতেন রাজবাড়ীর ঠাকুর ঘরের দরজায় বা রাজারই দরজায়। স্থান মাহাত্ম্যে যে ধরণার প্রভাব বাড়িয়া যায় সে সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণগণের কিঞ্চিনমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই ধরনের তাড়সটা ও খুব ছোঁয়াচেও হইয়াছিল। প্রথমে দুই তিন ক্রমে আরও দুই তিন, শেষে পল্টনই সাজিয়া বসিল। পানাহার বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ দুয়ারে বসিয়া—ক্ষত্রিয় রাজারও আহার বন্ধ। রাজকোষ একেবারে শূন্য, কি বিষম সঙ্কট।

১৬

নীতি হারাইয়া অর্থসমস্যা চলিল বিড়ম্বনার পথে, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত বেগেই। ভগ্ন বিন্দুর (Bracaking point) কাছাকাছি বিক্ষেপের বেগ বর্ধিত হইয়াও থাকে, ইহাতেও ছিল তাহাই , বাস্তবিক। কিন্তু কর্মফলের জন্য দায়ী কর্মীরা জানিলেন না। তবুও তাহা তাঁহাদেরই কর্মসমষ্টির পরিণতি এবং বিভিন্ন কর্মীর দ্বারাও একই পথে চালিত হইতেছিল, সমবেষ্টিত ধারায় না চলিয়াও। জমা দেওয়ার ভাণ্ডারও একাধিক নয়। একজন ঐন্দ্রজালিকের অঙ্গুলীস্পর্শে যে এক এক অপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটিতেছিল, আমি তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই দিন পিতৃদেব দৈহিক পূজা সারিয়া একজন রাজকর্মচারীকে দুই চারিটি অতি ক্ষুদ্র ব্যয়ের ভার দিতেছিলেন। সে ব্যয় কয় গণ্ডা পয়সা মাত্র। কর্মচারী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া জানাইলেন, সেই সামান্য পয়সাও সেদিনকার তহবিলে নাই। পিতৃদেবের সম্মুখে তাঁহার গুরুদেব বিপিন বিহারী গোস্বামী ছিলেন। তিনি উপহাসে উচ্চহাস্য তুলিলেন— রাজকোষের সম্পন্নতার শ্রী কয়গণ্ডা পয়সারও নিম্নে অবতরণ করিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় একবারে অসম্ভব, অপ্রত্যাশিত এক কথা বলিয়া ফেলিলেন। সংক্ষেপে তিনি শিষ্যের রাজ্যভার পরিমিত কালের জন্য ধারে লইবেন এবং অনাদৃতা ও লাঞ্ছিতা দেবী লক্ষীকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার শূন্য পাদপীঠে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু সেই কার্যের জন্য অসাধারণ আত্মোৎসর্গ চাই। সে হইল— কয় বৎসরের

১৭

জন্য চিরানুশীলিত শান্তির সাধনা, সন্ধ্যাপূজা ধ্যানধারণাদি পরিহার করা। তিনি ঠিক তাহাই করিলেন। শ্রোতারা, বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়াও, উপন্যাসের মত এই বাক্যালাপ শুনিয়া গেলেন। তাহারা রাজগুরুর কথা প্রলাপোক্তি মনে করেন নাই। কেননা এই রাজগুরুর বিবেক বুদ্ধির প্রচুরতায় সাধারণের এমন সন্দেহ ছিল না যে তিনি বেজায় ভাল মানুষের মত যেখানে সেখানে সাহস দেখাইতে যাইবেন। আবার বিশ্বাসীর মুখোশ পড়িয়া স্থাপ্যাহরনের

পথ পরিষ্কার করিবেন এমন সন্দেহ কাহারও ছিল না। শিষ্যকে বঞ্চনা করা যেমন তাঁহাতে সম্ভবপর ছিল না নিজেই তিনি আত্মপ্রবঞ্চকও ছিলেন না। বাস্তবিক রাজগুরু সকলের চক্ষে জীবন্ত রহস্যেই দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রভুপাদ বঙ্গের গোস্বামী সন্তান, তাঁহার ভাবনার প্রবাহ ভক্তি স্রোতস্বতীর খাত এড়াইয়া চলে নাই। সেই অর্ধ শতাব্দীর পশ্চাৎ দিকে দৈবাৎ যাবনিক শব্দ জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িলে যাঁহারা দশবার হরিনাম আবৃত্তি দ্বারা এবং ডাকের পত্র হাতে ঠেকিলে স্নান করিয়া প্রাণ ও অন্নময় কোষের শৌচসাধন করিতেন তিনি তাঁহাদেরই একজন। সেই যুগের 'শুচিব্রত' 'শ্রবণকীর্তনাদি', 'সাধনা', 'ভাব' এবং 'প্রেম' প্রভৃতি বহুলক্ষণা ভক্তির অনুশীলনকারী গোস্বামী ব্রাহ্মণের মুখে বিষয়সেবার অঙ্গীকার শোভা ত পায়ই নাই জীবনের সহিত বাক্যের সম্পূর্ণ অসঙ্গতিই প্রকাশ পাইল।

১৮

পিতৃদেব তাঁহার গুরুদেবের কথায় বিচলিত রহিলেন। কোন উচ্চবাচ্য হইল না। সেদিন রাত্রিতে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে মন্ত্রণা হইয়া গেল, রাজবাটীর উৎকর্ণপ্রকৃতির দেওয়ালগুলি পর্যন্ত, বাইবেলের ভাষায় মূক প্রস্তরের প্রাচীরে পরিণত হইল। যাহা হৌক আলোচনার ফলের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই প্রকার তলব কাহারও উপরে দুইবার আইসে না। এবং বিধাতার বিধানে ঠিক সময়টি না আসিলে ঠিক মানুষটি আসিয়া হাজির হয় না। পিতৃদেবেরও সেই প্রকার বিশ্বাস ছিল, দেখা যায়। তিনি রশিটা নেন নাই, অপেক্ষাই করিতে ছিলেন। পরের দিন, আষাঢ় মাসের ষোল তারিখে (১২৬৫ ত্রিপুরাব্দ) যথা নিয়মে আদেশ প্রচার হইল,রাজ্য-শাসনের সম্পূর্ণভার রাজগুরুর হাতে গেল। এই শাসনভার তাঁহাতে অর্পিত হইলে রাজগুরু বিপিন বিহারী গোস্বামী 'কর্তাপ্রভু' আখ্যায় পরিচিত হইলেন। রাজগুরু=প্রভু এবং শাসনকর্তা=কর্তা। তখন পর্যন্ত শাসনকার্যের ভার ছিল ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেবের হস্তে। তিনি পিতৃদেবের সমবয়স্ক এবং কৈশোর সহচর। কেবল তাহাই নহে, সংস্কার শিক্ষা দর্শন এবং নিষ্ঠার পিতৃদেবের অনন্যবৃত্তি ছিলেন। বলবান উৎসাহশীল, উদ্ভাবন দক্ষ হওয়াতে বাস্তবিক উচ্চদায়িত্ব বহন করিবার মত বহুগুণ তিনি ধারণ করিতেন।

ত্রিপুর বা ত্রিপুরা রাজ্যের ঠাকুর রাজ্যের অভিজাত বংশ

১৯

দ্বাদশটি উচ্চতম পরিবার লইয়া ইহার আদিগঠন হয়। ক্রমে এই বীজকেন্দ্র (Nucleus) পরিবেষ্টন করিয়া পরপর অনেক ভাঁজ (accerition) পড়িয়া গিয়াছে। এই দ্বাদশ মৌলিক ঠাকুর বংশ হইতে যাবতীয় রাজ্য শাসন বিভাগের অধ্যক্ষ নির্বাচন হইত। তখনকার সাধারণ নীতি, (এই বিশিষ্ট পরিবার সকলের অধিকার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যও) অনুসরণ করিয়া সেই কার্য্যাধক্ষ্যের পদগুলি পরিবারানুগত করা হইয়াছিল। এই মৌরুসী অধিকারের নিয়ম থাকায়, সমাজের অভিব্যক্তির একটা প। সেইজন্য ন সমাজের তাহার দ-ছাড় দেখা যায় না। কালে এই মৌলিক দ্বাদশ পরিবারের বাহিরে, বহু নূতন ঠাকুর পরিবার সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শিষ্টোক্তিতে

যদিও ঠাকুর বংশের লোকেরা সকলেই ঠাকুর কড়াকড়ি প্রয়োগ ধরিতে গেলে ঠাকুরপদ আজিও ব্যক্তিগত সম্পদ, কত যুগের পর যুগ গিয়াছে আজি তাহা কুলপরিচায়ক পদ্ধতি দাঁড়ায় নাই। যে দ্বাদশ উচ্চপরিবার মধ্যে কার্য্যধক্ষতারপদ কুল ক্রমাগত হইয়া গিয়াছিল তাঁহাদেরও সম্পর্কে এই সাধারণ প্রথার ব্যতিক্রম হয় নাই। উৎসব পর্বাদি বিশেষে, সেই প্রাথমিক রীতিতে গন্ধমাল্যাদি সহযোগে, রাজাদেশে যোগ্যব্যক্তিকে ঠাকুরপদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যেমন (Bery tree) বা (laurid tree)র পল্লবদ্বারা বিজয়ীর শিরোভূষণ গঠিত হইত, এবং পরবর্তী

৩০

কালেও প্রথাটি সামান্য রুপান্তরিত হইয়া, বিদ্যাবত্তার সম্মান দ্যোতনার্থ তদ্রূপ শিরোভূষণ নির্মিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য ও যুগাযুগান্তর অনবচ্ছেদে সেই রীতি ঠিক ঠিক চলিয়া আসিতেছে। সেই পল্লব, সেই সূত্র এবং সেই প্রকৃতির গ্রন্থী সকলই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। চিরন্তন প্রথাটিকে কোন পরিবর্তন স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই (ঠাকুর) অভিজাত বংশ ত্রিপুর সমাজগঠনের একটি বরণীয় উপাদান এবং বহুযুগ ব্যাপি ত্রিপুরা নাটকের এমন কোন অঙ্ক নাই যেখান কার অভিনয়ে এই বংশীয়েরা বড় ছোট নায়কের অংশ গ্রহণ করে নাই।

বহুপূর্বে ত্রিপুরা যুগের প্রভাতে যখন ত্রিপুর নরপতিরা দেশ ও সমাজ গড়িতেছিলেন। তখন তাঁহাদের অধিকার বিস্তারের সহায় ছিলেন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজারা এবং ততোধিক ক্ষুদ্র সনাথ পল্লীবাসীরা। বলাবাহুল্য ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রধান প্রতিযোগিতা ছিল বাহুবলের। পাশব ও মানব শক্তির মধ্যে বিশ্লেষণের রেখাপাত তখন ও সেখানে সুব্যক্ত নয়। আর এই বাহুবলের প্রতিযোগিতাকে survivial of the fittest 'যোগ্যের জয়' হিসাবে ধরিলেও তাহাকে একেবারে নীচের ধাপেই স্থান দিতে হয়। ত্রিপুরার নরপতিরা যেমন একদিকে রাজ্যবিস্তার ও রক্ষার জন্য এই শক্তির পরিচালনা করিতেছিলেন তেমনই শাসন এবং বাসস্থাপনাদির জন্য

৩১ক

অনুভব করিতেছিলেন একটি নায়ক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কেননা মিলিত বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ শক্তি ছাড়া রাজত্ব জিনিসটার 'অচল-প্রতিষ্ঠা' সম্ভবপরই নয়। বশিষ্ঠ = বশিন + ইষ্ট = বর্গীকরণে অতিশয় ক্ষমতাশালী যে। কেবল রাজ্য বাড়াইলেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, তারজন্য এই বশীকরণের শক্তি লাভ করা চাই। কথাটাকে ব্যাপকরূপে ভাবিতে গেলেও দেখা যায় অলব্ধকে লাভ করা এবং লব্ধকে রক্ষা করা পুরুষকার। গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে "যোগ + ক্ষেম।" পুরুষকার অক্ষরেখার এই দুই প্রান্ত (Pole)। যাক সে কথা। এই ব্রাহ্মণ্য শক্তির মিশ্রণে রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে, সমাজের আদি উষায় যেমন আজিকার এই বৈজ্ঞানিক মধ্যাহ্নে ও তেমনই। মানুষ এই পুরাতন সত্য দেখিয়া আসিতেছে, ইতিহাসের

অতীতকাল হইতে। উপরে যাহার উল্লেখ করিয়াছি "নায়কশ্রেণী" বলিয়া তাহাই ত্রিপুরা নরপতিগণের Kin অধিকতর সমীপবর্তী পরিবেষ্টনে দাঁড়াইয়া গেল। তাহারাই হইলেন ত্রিপুরা রাজ্যের 'ঠাকুর' = ত্রিপুরা দেশের বিশিষ্ট শক্তি।

৩১খ

কর্তা প্রভুর পূর্ববর্তী শাসনকর্তা ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব বাস্তবিক নীতিকুশল জননায়ক ছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহার গুণবত্তা সুপ্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু যে কালের কথা কহিতেছি, তখনকার প্রয়োজনের স্পন্দনে তাঁহার উপযোগিতা বাস্তবিক প্রতিস্পন্দিত হইতে ছিল না। তাই ভিন্ন যোগ্যতার ডাক পড়িয়াছিল এবং তাই কর্তাপ্রভুর অভ্যুদয়। তদানীন্তন এই শৃঙ্খলাশূন্য উদ্দাম বিভ্রান্ত অবস্থাকে যদি সদ্যোধৃত দুর্দম্য বন্য ভল্লুক কল্পনা করা যায় তাহা হইলে তার নাকের রশি টানিবার যে হাতটা চাই তাহাই ছিলেন রাজগুরু এই বিপিনবিহারী গোস্বামী। রাজা হইতে শুরু করিয়া রাজ্যের যাবতীয় লোকের 'গেজিয়ার ' রশির অন্ততঃ এক দিকটা এই রাজগুরুর অঙ্গুষ্ঠ তর্জনীর মধ্যে স্থান পাইয়া গেল। 'প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি'— যেখানে যেটার প্রয়োজন, সেইটাই সুরে বাঁধা পাকা তারের মত, তাহার ডাকে প্রাণভরা সাড়া দিয়া উঠিল। অশ্রুজলের প্রবাহপীড়নে, অভিসম্পাতের দহনে, ভয়ের ধিককারে, কদাচিৎ প্রেমের প্রেরণায়, রৌপ্য মুদ্রাগুলি, অভেদে, চিত্তহারী নিক্কন তুলিয়া কোষাগারের

৩২

শূন্যগর্ভ লৌহময় আধার অধিকার করিয়া নিতে থাকিল। কর্তাপ্রভু গুরু-লঘু অভেদে সকল রাজকার্য্যের আলোচনায় ব্রজমোহন ঠাকুর সাহবের এবং বাঙালী কর্মচারী গুরুদাস মুনসির * সহায়তা লইতেন একটা অনতিক্রম্য নীতির হিসাবে।

অবশেষে কর্তাপ্রভু ঋণ-শোধের পালা আরম্ভ করিলেন। উত্তমর্ণেরা কর্তাপ্রভুর মুখে সুস্পষ্ট কথাও নিলেন, যে ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে এতকাল যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে; এইক্ষণ তাহার ব্যয়ের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঋণ রাখা চলিতেছে না, যেহেতু এখানে বিকার আসিয়া পড়িয়াছে। বিকারের ঘোর কাটিয়া গেল যাহারা অতিরিক্ত, সুদের মোহ এড়াইতে পারিবেন, কর্তাপ্রভুর মুষ্টির ভিতরে তাহাদের জন্য যথেষ্ট স্থান থাকিবে। কেন না ঋণের প্রতিষ্ঠান নিয়া কোন বিবাদ নাই। তাহা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। বিবাদ বাঁধিয়াছে কেবল ঋণগ্রহিতা-দাতা উভয়ের একত্র সংযম হারাইয়াছিল বলিয়া। সংবাদটা শ্রোতাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল," অবশ্যই; এবং 'প্রাণ' যে আকুল করিয়াছিল তাহাতেই সন্দেহ নাই। বিবাদ কেবল আকুল কারী রস লইয়া। সংবাদদাতাটি আপনার পথ ছাড়া পদচালনা করিতেন না। এই ব্যক্তিত্বের হাল ঠিক থাকায় তাঁহার নৌকা ঠেকিত না, অন্যের উপরে সকল সময় অধিকার খাটাইতে না পারা গেলেও তাঁহার উপরে অপরের অধিকার খাটিত না।

* গুরুদাস মুনসি্

৩৩

ঋণ পরিশোধের সত্বরতার অবিদ্যমানে উত্তমর্ণের প্রাণ বর্জনের অতিতৎপরতা রূপ প্রপঞ্চ * ইতপূর্বে এক সময় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তখন দুর্লভ জীবন রক্ষার জন্য উচ্চতর সুদের হারে খত পরিবর্তিত হইয়া যাইত। পটপরিবর্তনের অর্থাৎ ঋণের তিরোভাব সম্ভাবনার আকস্মিক আবির্ভাবে উত্তমর্ণেরা কিঞ্চিত বিহ্বল হইয়া ছিলেন। টানাটানিতে রশির মাঝখানটা ছিড়িয়া গেল যে! তখন সমস্যার কিনারা ধরিবার ভাবনায় সমাসীন উত্তমর্ণদিগের পশ্চাৎপঙক্তি হইতে একটা নিশ্চয়াত্মক স্বাগত ভাষণ শোনা গেল যে, ব্রিটিশ রাজ্যের স্বল্পবৃদ্ধি বাহিনী 'পরমেশ্বরী' পত্রিকা + ত্রিপুরায় চালাইলে ও স্থান কাল পাত্র হিসাবে উত্তমর্ণেরা প্রয়োবেশনের পথ ধরিবেন না। যদিও সত্য কথনটা সনাতন ধর্মের ভেদবিলোপী কলিমাহাত্ম্যে তাহার দৃঢ় আস্থা না থাকিলে, লোকটা পুরোবর্তী আসনাসীন দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ও অগ্নিহোত্রী দিগের জ্বালাময়ী দৃষ্টির শরবৎ হইবার কৌতূহল অবশ্যই সম্বরণ করিত। কর্তাপ্রভু 'মধুরে শেষ' করিতে যাইয়া পুরাতন কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

"গিরৌ ময়ূরা গগনে পয়োদা,
লক্ষান্তরের্ক শ্চ জলেষু পদ্মম।
ইন্দুদিলক্ষং কুমুদস্য বিন্দু
যোথস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্।।"

৩৪

উত্তমর্ণেরা, কেহ টাকা পাইয়া, কেহ বা কর্তাপ্রভুর মুষ্টির মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া কথার মীমাংসা করিলেন। দুশ্চিন্তাকাতর ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবীরা শুনিলেন যে কর্তা প্রভুরখেয়ালের বিষম বিপ্রকর্ষ শক্তিতে পড়িয়া তাহাদিগের বার্ষিক শতকরা তিনশত তঙ্কা নিরিখের সুদ অনুচিত উদ্দামবেগে একেবারে দ্বাদশ তঙ্কায় অধোগমন করিয়াছে, যদিও সপারিষদ কর্তাপ্রভু তাহাদের উপর আরোপিত গুজবটার তত্ত্ব রাখিতেন না। যাহা হৌক সেই শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণপত্র সকলের হাতবদলের অত্যন্ত সত্বরতা পড়িয়া গেল। তাহারা যে ঘাতসহ স্থূল চর্মীর আশ্রয়ে গেল, তাহা বলা বাহুল্য। কর্তাপ্রভুর অন্তত একটা কৃতিত্বে কাহারও দ্বিধা ছিল না; সে হইল তাঁহার মধুরামধুর ভাষণে তুল্যরূপ তৎপরতা। উহা যেমন কর্তব্যের ফেরে পড়িয়া কর্তা প্রভুর নিত্য উপভোগ্যে দাঁড়াইয়াছিল তেমনি যাহারা অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইয়া তাহার স্বাদ প্রাপ্ত হইতেন, এমন একটা তন্ময়তা তাহাদিগকে পাইয়া বসিত যে,. একমাত্র সময়ের ওঝাগিরি ছাড়া উক্ত প্রভাবাপসারিত হওয়া তাহাদের পক্ষে শক্ত হইত। কর্তাপ্রভুর সাফল্যের নির্ভর ছিল আটআনা এই 'বোবায় ধরা' * প্রভাবের উপরে এবং সফলতাও তাহার হস্তগত হইত সত্বরতার সহিত।

---

* Phenomenon

'+' Interest rate.

বাস্তবজীবনে এই প্রকার কাব্যসুলভ বিচার সচরাচর ঘটিতে দেখা যায় না। সেই জন্যই প্রস্তুত হওয়ার অবকাশও থাকে না। যাহা হৌক, সৌভাগ্যবশতঃ যদিও এই প্রকার ঘটনা সর্বদা পাওয়া যায় না,

৩৫

তবুও এই সবে আরম্ভ শেষ কতদূর। কর্তা প্রভুর অভ্যুদয়ের মূল অভিপ্রায়টি ছিল রাজসংসারের ঋণাধিক-ধনসম্পন্নতা পাকাপাকি গড়িয়া তোলা। কিন্তু তাহা সহজসাধ্য হয় একেবারে ১৬ আনা শাসন কর্তৃত্ব পাইলেই। যদিও তখনকার দিনে শাসনের জটিলতা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, তবুও কেবল ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা লইয়া রাজ্যশাসন যদি শুরুও হয়, শেষ হবার নয় অবশ্যই। সুতরাং কর্তাপ্রভুর সঙ্গে উত্তমর্ণদিগেরই পরিচয় চর্চা হইতেছিল এমন কথা নয়; এবং তাঁর সঙ্গে দেশ-ব্যাপী পরিচয়টার উপরে প্রীতির প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল তাহাও সত্য নয়। পক্ষপাতের সহিত যে জনপ্রিয়তার সহজ-সম্বন্ধ অর্থাৎ তাহা যে বিচার বা ন্যায়ের এলাকার সম্পূর্ণ বাহিরে। সেই জন্যই যে সকল নরনারী ন্যায়ের পথ দিয়া লোকপ্রীতির অধিকার অর্জন করেন তাঁরা তা ভোগ করিতে পারেন না। ইংরেজীতে একটা কথার প্রচলন আছে popularity isn't a matter of justice - its a matter of sympathy. একথা শতকরা নব্বই জন কথিক জনপ্রিয়রা মনে মনে স্বীকার করিবেন। তাকে দেখার পূর্বে কোন দলের স্তাবকরা তাদের বাঁশী শোনে অন্যরা স্বপন দেখে এই পর্যন্ত প্রভেদ। বাস্তবিক কর্ত্তাপ্রভুর সে কালের অবস্থার সহিত Disraili বর্ণিত *Schoutte র বিপন্নতার বেশ একটা সাদৃশ্য আছে।

৩৬

শতশত নরনারী সেকালে কর্ত্তাপ্রভুর বাক্যবিন্যাস এবং অঙ্গচালনাদির ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ লইয়া অক্লান্ত প্রতিযোগিতায় মাতিয়া যাইত --তাহাদের মধ্যে অনুকরণকুশল অতি অল্পই ছিল, যদিও। এবং মুরুব্বিরা ও মিজাজিরা কর্তাপ্রভুর আলোচনায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সংক্ষেপে সস্তা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতেন—ভারি ত! এমন আমরাও পারিতাম —ইত্যাদি। এই হইল আপামর সাধারণের কথা,

৩৭

আদম সুমারীর হিসাবে যে শ্রেণীটা খুব বড়, এবং ইচ্ছার প্রতিকূলে কোনো সত্যকে স্বীকার না করিবার জন্য জীবনধারণ করে, সেই সম্প্রদায়ের লোকের কথা। কিন্তু এই ব্যাপক আতিশয্যের মূলে একটা মর্মোচ্ছাস ছিল —একটা স্পর্শসংবেদ্য, সমাজের মজ্জাস্পর্শী, অস্বস্তির

---

*nightmare

*Schoutte was the Minister of state in France in 1759. That period was a critical one. The treasury was in exhasuted condition and Schoutte, a very honest man, who would hold no intercourse.

অস্তিত্ব ছিল। তাহার বেগ তখনও ক্ষয়িত হয় নাই। যে কাল হইতে ত্রিপুরা রাজ্যশাসন স্থায়ীপদ্ধতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, তখন হইতেই শাসন বিভাগের সর্বত্র ত্রিপুরা সন্তানেরই অধিকার মূলক স্থান হইয়া গিয়াছিল। দফতরী হইতে রাজমন্ত্রী এবং পদাতিক হইতে প্রধান সেনানায়কের কার্য তাঁহাদেরই হাতে পড়িত। বহুশতাব্দীর অবসানে এই নীতির ব্যতিক্রম আসিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৌর জগতের গোঁটা ভাবটা একটা সৎপদার্থের মহাবন্ধনী শক্তিতে সাবয়ব ও স অখণ্ড রহিয়া যায়। স্থূল-সূক্ষ্ম নির্বিশেষে সকলকে জড়াইয়া এই Coherence শক্তির খেলা চলিতে থাকে। পর্য্যায়টার ব্যতিক্রম, এই শক্তির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে। মহাশক্তি, তখনও নিষ্ক্রিয় নয়, কিন্তু তার চলতি তখন বিশ্লেষণের অভিমুখে - ভাঙচুরের দিকে। এই বন্ধন মুক্তির খেলাই মহাশক্তির লীলা। অনেক কালের পরে ত্রিপুরায় এই পর্যায়ের পরিবর্তনের পালা পড়িয়া গেল।

৩৮

রাজ্যের শাসন হইতে ত্রিপুরা কর্মচারীরা যেমন ক্রমে ক্রমে অপসরণের পথ ধরিলেন তাহাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে থাকিলেন বঙ্গীয় কর্মচারীরা কেননা কর্মের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান ছিল, ত্রিপুর কর্মচারীরা তাহা সঙ্গে লইয়া যায়েন নাই। এই রূপে একের ব্যবধান এবং অপরের সান্নিধ্য অবাধ পর্যায়ে চলিতে লাগিল। কেবল কয়েকটি অনন্যসাধারণ দায়িত্বের পদ যে ত্রিপুরসন্ততির অধিকার হারাইল না তারই মূলে এই বিশ্বশিথিলতার প্রভাব মাঝে মাঝে ঠেলা মারিত। যে শ্রদ্ধাস্পদ, কর্তাপ্রভুর পূর্বে অপরিবর্তনীয় ধারায় ত্রিপুর সন্তানেরই নিজস্ব

৩৯

অধিকারে ছিল, সঙ্কট কালে তাহারও জন্য ত্রিপুরতর জাতির ডাক পড়িয়া গেল। শাসনের সর্বোচ্চ পাদপীঠে প্রথম বঙ্গ সন্তান আমাদের এই কর্ত্তাপ্রভু। এই অবস্থাটা সহজে বোঝা যাইত যদি বাঙলার রাজা যাইয়া ত্রিপুরা দেশ জয় করিয়া লইতেন। অন্তর্বিপ্লবও দেশে ছিল না যাহাতে প্রতিযোগী বিপ্লবীপন্থী ত্রিপুর ও বাঙালী সমাজ বলপ্রয়োগে একে অন্যকে রাজ্যশাসন হইতে অবসৃত করিয়া দিতে পারিত। ঠিক তার কোন অবস্থা বর্তমান ছিল না। যাহা সত্য সত্য ছিল বা হইয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাস লেখক তাহা বাহির করিবেন। এই বাহির প্রবণ-বৃত্তির কবলে সমাজের পর পর একাধিক পুরুষ ব্যাপি জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা দ্বারা।

বাঙালীর এই সর্বোচ্চ শাসনাধিকার লাভে ত্রিপুরা সন্তান মাত্রেরই শিরাস্নায়ু দিয়া একটা কম্পন আসিয়াছিল। কিন্তু যাহারা তাহাদের মধ্যে হাজারে দশজন অর্থাৎ সমাজের মস্তিস্ক স্থানীয় তাহাদের স্নায়ুচক্রে ধাক্কাটা লাগিয়াছিল অধিক পরিমাণে অথচ বিচলিত হইলেন না তাহারাই আবার অন্যদিকে তাহারা পৌরাণিক তন্ত্রের অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিয়া

৪০

লইয়া ও দার্শনিক উপেক্ষার মত অনাশক্ততা তাহাদের ছিল না। অপরিহার্যকে অস্বীকার না করিয়া ও তাঁহারা সহিষ্ণুতার শান্ত-প্রতিক্ষার অনুশীলন করিতেন। একবার সময় ফিরিয়াও

ছিল, কর্তাপ্রভুর অধিকার স্খলনের পরে। এই মুষ্টিমেয় কুশলী ত্রিপুরা নেতারা তাহা ফিরিয়া পাইয়া তাহার যথার্থ গৌরব রক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ফিরিয়া পাওয়ার জন্য তাহাদের সাধনা ছিল কবি বর্ণিত কৃষকের সাধনারই মত — কৃষক অগ্নিকুন্ডের দগ্ধ মৃত্তিকায় অশ্রুজল ঢালিয়া কাদা করিয়া বীজবপন করিয়াছিল এবং তাহাতে হৃদয় শোণিতের উষ্ণসার দিতেও ভুলিয়াছিল না। এই সাধনায় কেন্দ্রস্থলে ছিলেন প্রাগুক্ত, ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব যাঁহার নেতৃত্বে সহকারী নেতারা সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিয়াছিলেন।

কর্তাপ্রভুর শাসনের আরম্ভের দিকে একটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার আসিয়া জুটিয়াছিল। স্বনামধন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন রায় (তখন বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়) আগরতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার বেশ মনে হয় পিতৃদেব আমাদিগকে উপাদেয় মিষ্টান্ন এবং চাঁদিরূপায় তৈরি দেশী কারিগরের ভিন্ন ভিন্ন

৪১

Child's set ইত্যাদি মনোরম উপহার দক্ষিণারঞ্জন রায়ের নামে করিয়া দিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তখন যৌবনের উপান্ত কঠোর কর্ম-তপস্যার বয়স, যশের তৃষ্ণা অতর্পনীয়; তিনি নূতন কর্মক্ষেত্রের অন্বেষণে তখনকার কালে অপেক্ষাকৃত অনবেক্ষিত ত্রিপুরা রাজ্যে রবাহুত প্রবেশ করিয়াছিলেন। মাথা বোঝাই কল্পনা লইয়াই আসিয়াছিল। এদিকে কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পিত শাসন-সংস্কার কি আকারে শুরু হইয়া কোথায় গিয়া ঠেকিবে তাহার একটা ঔপক্রমিক সংস্করণ পরিষ্কার প্রকাশ হইয়া গেল, দুদিনের মধ্যেই অবশ্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুখব্যাদন করিবার অবকাশ পাওয়ার পূর্বে। রাজকর্মচারীদিগের মধ্যে একটা তীব্র সংবেদন তড়িৎসঞ্চারের ন্যায় ফেলিয়া গেল এবং Cynemic দৃশ্য পরিবর্তনের মত (আশ্চর্যের কথা নয় , রাজনৈতিক স্মৃতির ক্ষনস্থায়িত্বের আইন নজিরের অভাব নেই) কর্তাপ্রভুর সমগ্র শাসনের উপরে, যে হাতের তুলিতে আলকাতরার পোঁচরা পড়িয়াছিল সেই তুলিতেই তাহার সংস্কার হইয়া গেল, কালোর জায়গায় গোলাবি রং ফুটিয়া উঠিল। দক্ষিণারঞ্জন ত্রিপুরায় আসিলেন কি করিতে? সেইটাই প্রথম প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসু যাঁহারা তাঁহাদের সত্য-ঔৎসুক্য থাকা চাই। অর্ধেক উত্তর আসিয়া পড়ে এই প্রকৃতি উৎসুক্য হইতেই। যাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— দক্ষিণারঞ্জন কি করিতে আসিলেন—তাঁহারা আপন বিবেক বুদ্ধিতে সে প্রশ্ন করেন নাই, করিলে পিঠ পিঠ উত্তর বাহির হইত—

৪২

বেজায় করিবার ছিল, তাহা না থাকিলে কর্তাপ্রভুরও আগমন হইত না। " Hour produces the man"– কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু যদিও কর্তাপ্রভু আসিলেন, অবাধ গতি সঞ্চারিত শক্তি হাতে লইয়া, সেই শক্তির মুখে, উদ্ভাবনী শীলতার কারখানা গড়া এনজিনের (Engine) মত ক্ষেপণীয় সামগ্রীটি আসিয়া জুটিয়া ছিল না। শক্তি ব্যয়িত হইত সত্যই, তবুও

শক্তির ও ত একটা অর্থ বিজ্ঞান আছে। ঋণ সমস্যার বাহিরে সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিলেও সে সহায়তা হাতের কাছে ত ছিলই না, আপনা হইত আসিয়া জুটিবার সম্ভাবনা ও ছিল একান্ত দৈবাধীন ব্যাপার। 'দৈবাধীন' ই দক্ষিণারঞ্জন দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে জানিয়া যাচিয়া লইতে, এমন কি খবরদার, বিশ্বাস করিয়াছ কি মরিয়াছ — Deplomacy যে চাণক্য পণ্ডিতের ছিল তাঁহারও ত তেমন নিষেধাজ্ঞা নাই, বুঝি। নীতিকুশল পণ্ডিত অনবাহিত্য, স্খলন চিত্ততা এবং বিশ্বাসের সদোষ শিথিলতারই নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণারঞ্জন জাতককে কি ক্রূর গ্রহের প্রভাবে ত্রিপুরা হইতে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল? তবুও শুভগ্রহের প্রভাবেরও ত অপ্রাচুর্য দেখা গেল না। কোন্ গ্রহের প্রভাবে ত্রিপুরার ফেরতা দক্ষিণারঞ্জনের একাধিক অসহজসাধ্য কর্মক্ষেত্রে সফল কর্মিত্বের পরিচয়

৪৩

দিবার পথ অর্গলমুক্ত হইয়াছিল? বিশ্বমাতা প্রকৃতিদেবীর প্রতিবিন্দু স্তন্যে, অস্থিমাংসের সহিত (necessary sines of war) যে মানুষটার শরীরের মধ্যে পরিপোষণ পাইয়া তাহার প্রবল ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল আমরণ তাহার পুরুষাকার পুষ্ট কার্য পরম্পরায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হৌক, এ স্থলে যে এত কথা আসিয়া পড়িল, দক্ষিণারঞ্জন স্বয়ং তার উদ্দিষ্ট কি নির্দিষ্ট সেই কৈফিয়তের ত্বরা নাই, ভাবনাও নাই। ভাবনা চলিয়া যাইতে চায়— দলাদলির সনাতন নীতি সূত্রেরই দিকে। যে কালেই এবং যেখানেই পরের বিষয় লইয়া দুইটা মুরুব্বির দল কটিবন্ধন পূর্বক পরস্পরের সম্মুখীন দাঁড়াইয়া উঠেন, সর্বত্রই দেখা গিয়াছে, দায়িত্বের signal point এ উপস্থিত হওয়া মাত্র তাহারা 'কুর্মাঙ্গের' মত আপনার পা হইতে মাথা পর্যন্ত উদর গহ্বরে প্রবিষ্ট করাইয়া লয়েন। সেই হইল তাহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং ব্যবসায়ের বিশেষত্ব। সুতরাং যত চাপ আর যত বোঝা সব বিষয় যার তারই স্কন্ধের জন্য চিহ্নিত হইয়া সসাবধান তোলা থাকে। রাজ সাক্ষাৎকার ভাঙ্গিয়া গেল, নাট্যোচিত ক্ষিপ্রতার সহিত, একেবারে শেষ মুহূর্তে; কিন্তু ব্যর্থ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কার্যের ফলটা লয় পাইল না। নশ্বরদেহী কর্মীরা দিনে দিনে সকল-কর্মের-বাহিরের লোকে চলিয়া গেলেন, কিন্তু অবিনশ্বর কর্মকাল যে থাকিয়া গেল তাহাকে যেমন ভুল বুঝিবার উপায় নাই, উপেক্ষা করাও চলে না। ত্রিপুরার অবস্থান যদি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে - যদি নবীনযুগের উল্কাগতি আবিষ্কার উদ্ভাবনাদির চির বর্ধমান সম্পদৈশ্বর্যে তাহার ভাগ না পড়ে তা হইলে সে অভাবের সে দৈন্যের লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে হইবে, ত্রিপুরাকেই।

৪৪

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজদর্শন প্রার্থী হইলে পিতৃদেব, সময় নির্ণয় করিয়া সাদর উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ সাক্ষাৎকারের ফল যে প্রমাদজনক, অতিনির্বন্ধশীল রাজদরবারীরা সূক্ষ্মন্যায় ধরিয়া কর্তা প্রভুকে সমঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা আর কেহ নহেন,

একেবারে অপরিচিতি নহেন। কর্তাপ্রভু যে উচ্চ কুসিদগ্রাহী রাজসম্মান রক্ষকের অন্তেষ্টি ক্রিয়া সবে মাত্র শেষ করিয়া স্নান করিয়াছিলেন সেই উষ্ণ চিতাভস্ম হইতেই আরবদেশীয় পৌরাণিক ফিনিক্‌স (Phoenix) পক্ষীর ন্যায় তাহাদের পূণর্জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু নিরীহ প্রভুকে টোপ গিলিতে হইল। প্রভুর সেদিন হঠাৎ স্মরণ হইল যে, ভাগবতের অধ্যায় বিশেষ পিতৃদেবকে শ্রবণ করান হয় নাই। কর্তাপ্রভু ভক্তি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, সুপাঠক ও ছিলেন। তিনি একেবারে পাঠে বসিয়া গেলেন, এবং এইরূপে মুখোপাধ্যায়ের মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়াও অনেকক্ষণ ভাগবত ব্যাখ্যায় কাটিয়া গেল। পিতৃদেব অবশ্যই বুঝলেন, তাঁহার গুরুদেব দক্ষিণারঞ্জনের সাক্ষাৎকারের অত্যন্ত পক্ষপাতি নহেন। দক্ষিণারঞ্জন উপাখ্যানের উপসংহার এইরূপ।

পরদিন মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজার পত্র লইয়া গ্রীনবোটের গলুই ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি নৌকায়ই ছিলেন। কাহাকেও সংসারের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইলে তাহাকে প্রথমে কয়েকটি সামগ্রী কুড়াইতে হয়। সেগুলি হইল ভক্তিতে বিদ্রূপ, দায়িত্বে বঞ্চনা, দারিদ্রে ঘৃণা এবং সফলতায় হিংসা।

৪৫

তারপরে অতিআহরণে বা আহারে অরুচি বা অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সেই অবস্থাতেই স্তুতিনিন্দায় মানুষ বিচলিত হয় না। বরং যখন বাহিরে কাজের ডাক পড়ে, তার জন্য বাহিরের ছুটাছুটি ছাড়িয়া একদম ভিতর দিকে দৌড়িয়া যায় —যেখানে বুঝাইবার জন্য তর্কযুক্তির অপরিচ্ছন্ন প্রয়াস নাই, ঘাড়ে বা পায়ে ধরিবার কেলেঙ্কারী নাই, আছে খুব সাদাসিধা ধূলিবালি ঝাড়া অবিসম্বাদি একানুভূতি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবন একঘেয়ে চলে নাই. সুতরাং সংসারের অভিজ্ঞতারও সংগ্রহ তাঁহার অপ্রচুর ছিল না। কিন্তু বাকী থাকিলেও এইরূপ ক্ষেত্রে তাহা সঞ্চিত ছিল বৈ কি। জীবনের পরবর্তী ভাগে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়া গেল তাহাতে কি তিনি প্রলুব্ধ হয়েন নাই যে, তাঁহার অনুকূল গ্রহেরই প্রভাব Occult influence একটা দেশের লোকমত সাজিয়া, তাঁহাকে ক্ষেত্রান্তরে প্রেরণ করিয়াছিল?

কাজ হাতে লইয়া কর্তাপ্রভুর পরিবর্তন অত্যন্ত চমৎকার হইয়াছিল। তিনি অলকচ্ছিন্ন বিষয় চিন্তায় তন্ময় হইয়া, তাঁহার পূর্বপ্রকৃতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দিন নাই রাত্রি নাই, আহারের কালাকাল নাই, সন্ধ্যা-পূজায় মন নাই, আছে উদ্দিষ্ট ও টাকা, নির্দিষ্ট ও টাকা, অন্তর্ব্বহির্ভেদে কেবল টাকা। এই তপস্যায় দেবী ধনাধিষ্ঠাত্রী মুখ তুলিবেন না কেন? টাকা আর টাকা। মাতা কমলার চারিপাশে নিক্কণের লহরী তুলিয়া কেবল রজতধল হাসি। আর সেই শুভ্রছটায় উদ্ভাসিত কর্তাপ্রভুর বিষয়ী সুলভ হাসির আলোক।

৪৬

তবুও শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বল নয়, কেননা তখন মুক্তার পংক্তি কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। কেবল উহার দুই চারিটি বিরল সঙ্গীরা অতীত সম্পদের আঙ্গিক প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে

রহিয়া গিয়াছিল। কর্তা প্রভুর গৃহে 'নীলমণি' শিলাচক্রের পূজা হইত। সেই দেবতার মন্দির এখন আর পুষ্পল স্তুতিগানে মুখরিত নয়। জলভার-মেদুর মেঘ নিস্বনে 'বৃন্দাবন চন্দ্র কি জয়" শব্দ শোনা যাইত না। তাঁহার প্রিয় গোবৎস 'সম্মানী' -"কাঞ্চনমালারা" পূজা সমাপ্তির ইঙ্গিতের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, ঘণ্টানাদ সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিত না। মন্দিরের দ্বারে কেহ আর স্বাদু নৈবেদ্য বিলাইত না। তখন কর্তাপ্রভু উচ্চৈস্বরে ডাক পাড়িতেন " বোলাও মদন জমাদার কো", সমি দারগাকো, বা গোলাপ খাঁ হাজারীকো"। তবু সময় সময় এই অসামান্য উৎসাহী পুরুষের মনেও অবসাদ আসিত। বৃদ্ধ রাজজ্যোতিষী "রামজী বিদ্যাসাগর" " শ্রীপাটের "(রাজগুরুগৃহ) নিকটে বাস করিতেন। মাঝে মাঝে কর্ত্তাপ্রভু তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন—যদি তাঁহার রূপান্তরীকরণ বিদ্যার সাধনা থাকিত তাহা হইলে, এই দেহের বদলে কিরূপ দেহ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল?

৪৭

প্রাচীন রামজী এতবড় একটা প্রশ্ন শুনিয়া দিশাহারা হইয়া অগত্যা একটা দেবতারই নাম করিয়াছিলেন। আর কর্তাপ্রভু তাহার স্বল্পাবশিষ্ট সকল দন্তগুলি বিকাশ করিয়া হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেন। ক্লান্তি যেদিন এই পরিহাস প্রবণতা অতিক্রম করিয়া যাইত তিনি আপনিই উত্তর করিতেন তাহা হইলে তিনি একটা প্রস্তরখণ্ড হইয়া কর্মবিরতির বিশ্রাম লইতেন, নিশ্চয়ই।

৪৮

পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের প্রায় তিন বৎসর পূর্বে অকস্মাৎ ভয় পাইয়া আমার স্নায়ুবিকার জন্মিয়াছিল। আমার দৃষ্টিতে নানা ভীষণ অপার্থিব মূর্তি অস্পষ্ট আকারে ফুটিয়া উঠিত। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরও আসিতে লাগিল। শেষটা আর জ্বর আসিত না, কিন্তু বিকট ছায়াদর্শন রহিয়া গেল। কখন দিনে একাধিকবার, আবার কখনো আট দশ দিনও ফাঁক যাইত। বিকারের ভয় দূর হইলে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া প্রায়ই দেখিতে পাইতাম, পিতৃদেব শিয়রে বা পাশে বসিয়া আমার শরীরে কি সকল কাল্পনিক রেখা অতিশয় লঘু স্পর্শে টানিয়া যাইতেছেন। যাহাহোক ক্রমে ভয়ের বিকার ও ছুটিয়া গেল। কয়েক মাস পরে আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলাম। ভয় বিদ্যমানে যে সকল ভীষণ মূর্তি আমি দর্শন করিতাম বয়স্ক হইয়া ভাবিয়া কুল কিনারা পাই নাই, এমন ভাবপুষ্ট ভীষণ রসের নির্দোষ চিত্র, এমন বিশদ সুপরিচ্ছন্ন (Elaborate) কল্পনা একটা তরুণবয়স্ক বালকের কাঁচা মস্তিষ্কে আসিত কেমনে? কৌতূহল বাড়িয়া গেল, এগুলি সত্ত্বাবিশিষ্ট কিছু, না কেবলই কল্পনা? এবং কাল্পনিক হইলে কাহার সেই কল্পনা বিশ্ব- কল্পনা? বেজায় বড় কথা। একটা কথা ঠিক সে ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের কল্পনাজাত নিশ্চয়ই নয়। শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব নাই ঠিক, কিন্তু কৌতূহল তৃপ্তির জন্য শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। প্রাচীন প্রণালীতে জ্ঞান যত উর্ধে উঠে ততই গুহ্য হইতে চলে। একদিকে শাস্ত্রবেত্তাও দান করিতে চাহেন— দান গৃহীতার অধিকার যাচাই করিয়া, অন্য দিকে বৈদেশিক অবাধ শিক্ষা প্রাপ্ত অসহিষ্ণু বিদ্যার্থীরা আদায় করিতে চায় অব্যাহত দান, না দিলে জবরদস্তি করিয়াও।

৪৯

আমাদের কিনা—"ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর"। ইয়ুরোপের আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনের সমিতির পথ ধরিয়া কেহ কেহ কিছুদুর অগ্রসর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পথ আগুলিয়া রহিয়াছে বিরাট অন্তরায় প্রাকৃতিক বা ভৌতিক বিজ্ঞানের বদ্ধ-সংস্কার। খোলাসা পথ কোন দিকেই পাওয়ার উপায় নাই। বয়স্ক হইয়া নভেল পড়িতে গিয়া একদিন 'Zanoni' -তে " Dewellers of the Threshold" এ পড়িলাম - সেও কবির কল্পনা যদিও, —" Fear (or horror) fan whose ghostliness men are protected by the opacity of the region of prescription and custom: The moment this protection is relinquished, and the human spirit pierces the cloud, and enter alone on the unexpected regions of nature, the natural horror hunts it and is to be successfully encountered only by the Defiance, aspiration towards and reliance on the former and Director of nature, whose messenger and instrument of reassurance is faith."– কিন্তু যে ধারা (prescription), ব্যবহার (custom), এবং লোকের কথা (region) হইল তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার করার গুলি ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে সম্ভবপর কি? তবে ঘোর (opcity) ঘুচিয়া গেল কি রূপে? মীমাংসা ত আসিল না। তবুও এই নিয়ত অনুসন্ধান পরীক্ষার দিনে একবারে হাত ধুইয়াও উঠিতে পারা যায় না। এই যে হিন্দুশাস্ত্রে রাগরাগিণীর

৫০

স্বরূপ এবং স্বভাব প্রদত্ত হইয়াছে আজগুবি বলিয়া উহাদের উপেক্ষা করিতে এমন সাহসে কুলায় কি? ক্রমে শোনা যায় যে সুরের অন্ততঃ বর্ণ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে। আরও শোনা যায় যে অন্ধদিগেরও ছাপার বই পড়ার উপায় বাহির হইয়াছে। " অপ্টোফোঁ" (optophone) যন্ত্রের সাহায্যে ছাপার বর্ণমালা সুরের বর্ণমালার পরিবর্তিত হইবে। এই যে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ তিন শ্রেণীর পদার্থ বিভাগ, বিদ্যাসাগর যুগ হইতে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের স্থাবর জঙ্গম-বিভাগের আসন, উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া দখল নিয়াছিল তাহাও ত আবার উড়িবার জন্য পাখা মেলিতেছে। থিওসফির বিচারে এবং জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষনায় তথাকথিত অচেতনের অচেতনত্ব ও সে উড়িতে চলিল। মধ্য —দিনের যুগ যে আসন্ন; দুই চারিটা করিয়া প্রভাত শুভ্র কিরনরেখা ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই সংবাদ ঘোষণা করিতেছে।

১২৭১ ত্রিপুরাব্দে শারদীয়া পূজার কিছু পূর্ব্বে পিতৃদেব কুমিল্লায় গিয়াছিলেন। সেখানে চাকলা রোশনাবাদের কাছারি বাড়িতে ত্রিপুরেশ্বররা মধ্যে মধ্যে প্রবাস করিয়া যাইতেন। এই কাছারি বাড়ির রাজবাড়ি পরিচয় উহা হইতে। কিন্তু রাজারা এই ভদ্রভাষিত রাজবাড়িতে চিরকাল কিঞ্চিৎ অস্বাচ্ছন্দ্যে আত্মনিগ্রহের প্রবাস কাটাইয়া যাইতেন। কিছুকাল হইতে পিতৃদেব শারীরিক সাধারণ অস্বস্তি অনুভব করিতে ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করিতেছিলেন, নিয়মিত ব্যায়ামের অভাবে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু নিত্য অপরাহ্নে তাহার প্রিয় চেলিসজ্জা আরবী ঘোড়া নির্দিষ্ট সময়ে জিন বাধা। পিঠে সম্মুখে দাঁড়ানো থাকিত,

৫১

চড়িতেন না, কোনদিন মালপোওয়া খাওয়াইয়া , কোনদিন হাত বুলাইয়া বিদায় করিতেন, চড়িতেন না। মুক্ত বায়ুতেও হাঁটিয়া বাহির হওয়া চলে না, প্রজামণ্ডলীর সেই সে যুগের ভাব-ভূয়িষ্ঠতা আসিয়া রাজার পদ-ব্রজ- ভ্রমনে বাধা দিত। শরীর চালনার অভাব হইতে ক্রমে তাঁহার শরীরে বাতরসের সঞ্চার হইতে লাগিল। কুমিল্লার বাড়ীতে পত্র লিখিতে বসিয়া একদিন তাঁহার অসাড় আঙুল হইতে কলম পড়িয়া গেল। তিনি স্বভাবতই বলবান পুরুষ ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩৩ বৎসর। অনুশীলনে সেই বলবত্তারও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যথেষ্ট। কিশোর বয়সে "আখড়ায়" নামিয়া কুস্তি করিতেন এবং পুরাদস্তর মল্লবেশে ধূলি বালি মাখা শরীরে পিতৃদর্শনে যাইতেন। পিতামহ মহারাজ সস্মিতমুখে গল্প করিতেন — তিনিও নিত্য পিতৃ-সন্দর্শনে যাইতেন, সেই বেশে সাজিয়াই, তখনকার যুগরুচি। তখন বাহুবলের আদর অত্যন্ত ব্যাপক দাঁড়াইয়াছিল। শারীরিক শক্তির অনুশীলন অপরিহার্য্য হইয়াছিল, রাজা প্রজা নির্বিশেষে সকলেরই। রাজাদিগের পার্শ্বচর নির্বাচনে বলবত্তাটা একটা উচ্চ প্রতিযোগিতার লক্ষ্মণের মধ্যে ধরা হইত। হিন্দুস্থানী এবং প্রতিযোগী পাঞ্জাবী প্রণালীর ব্যায়াম এবং তরবারি চালনার দক্ষতা তখন তরুণ ত্রিপুরার আদেশে গৃহীত হইয়াছিল। তখনকার ভারতের উৎকর্ষ সাধিত স্বচ্ছন্দ সুন্দর অসি আবর্তন এবং 'সম্মিলিত ভারত-পাঞ্জাব প্রণালীর মল্লবিদ্যা বর্তমানের 'কেনয়িৎসু' এবং যুযিৎসু'র অগ্রবর্তী ছিল। কিন্তু এইক্ষণ জাপানী প্রণালীর নীতি ও বিজ্ঞান এবং শরীর মনের বৃত্তিনিচয়ের ক্রম বিকাশের পন্থা উদ্ভাবিত হইয়া সমবেত জাতীয় চেষ্টা, এই 'কেনয়িৎসু-যুযিৎসু' কে নিয়মের বন্ধনে বাঁধিয়া যে প্রয়ান পথে চালাইয়া নিতেছে, ভারতীয়

৫২

প্রণালী পৃষ্ঠপোষণ হারাইয়া আপনাআপনি তার উল্টা পথ ধরিয়াছে। লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত্রিতে গোটা ঝুনা নারিকেলটা ক্ষুদ্র তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা আজিও ত্রিপুরার আমোদের একটা বিশেষত্ব রূপে সজীব রহিয়াছে। এই উপলক্ষে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শৈশবের কাহিনী আমাদিগের কৌতূহল বাড়াইয়া তুলিত। শৈশবে তিনি দেখিয়াছেন, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, মোটাতলীর 'মুণ্ডা' চটি পায়ে ছোবড়া শুদ্ধ ঝুনা নারিকেলটা পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া দিতেন।

পিতৃদেবের পীড়ার কথা হইতেছিল। তিনি কুমিল্লার কার্য শেষ করিয়া সত্বর আগরতলায় ফিরিলেন। প্রবাহপীড়িত সেতুবন্ধের আড়াআড়ি যদি ছুরির ফলকের সরু রেখটাও পড়িয়া যায়, অতি অল্পক্ষণেই সেতুবন্ধের সমস্ত চিহ্ন সেই রেখাবাহী জলের মুখে ভাসিয়া যাইতে পারে। পিতৃদেবের স্বাস্থ্য, পীড়ার মুখে তেমনি তেমনই করিয়া ভাসিয়া চলিল। হস্তপদাদির প্রান্ত হইতে শরীর কাণ্ডের দিকে অসাড়তা দিন দিন অত্যন্ত সত্বর গতিতে চলিয়াছিল। দুই তিন মাসের মধ্যে তিনি অবশ শরীর লইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পূর্ণযৌবন, সুদৃঢ় অঙ্গ, সংস্থান এবং অসাধারণ বলবত্তার অভিমান তস্করের সমক্ষে ধনসম্পদের দম্ভের মতই অসার।

তিনি প্রায় একাদশ মাস ঘণ্টা মিনিট গননা করিয়া রুগ্নের নিরুদ্দম জীবন্ কাটাইয়া ছিলেন। বালাবাহুল্য, বিকলাঙ্গ যাহারা, এমনকি নিরিন্দ্রিয় যাহারা তাহাদের জীবনে কর্মের ও উদ্যমের ভিন্ন ক্ষেত্র থাকিয়া যায়, অনেক খঞ্জ-মুক-বধির-অন্ধের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু রুগ্নের জীবন সম্পূর্ণ বিকল দাঁড়াইয়া যায়।

৫৩

পিতৃদেব তাঁহার গুরুদেবের স্বীকৃত ওষধই গ্রহণ করিতেন। নীতির সাধক যাহারা তাহারা একটা অপূর্ব শক্তি লাভ করেন, যাহাতে তাঁহাদের বিষম বিপদে পড়িয়াও মনের সম্পূর্ণ শান্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হয়েন, অন্ততঃ বিকারবিহিন অবস্থাটি তাহাদের লক্ষ্যচ্যুত হয় না। তাহাদের নৈতিক শক্তি আর ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ও সম্পূর্ণ অভিন্ন, তাই তাহাদের পথ রচনাকারী অন্যকেহ নহেন, তাহারা নিজেরাই। বিপদকে তাহারা পরাজিত বা পথভ্রষ্ট করিতে পারুন বা না বিপদের দ্বারা তাঁহারা পরাজিত বা পথভ্রষ্ট হয়েন না। পিতৃদেবের প্রধান সাধনা ছিল শারীরিক কষ্টের কথা লইয়া কাহার ও সহিত আলোচনা না করা, অবশ্য চিকিৎসক ছাড়া। এই চিকিৎসকেরাও তাঁহার মুখে stoic প্রকৃতির আলোচনা শুনিতেন, এমনকি তাহার মধ্যে রহস্যও বাদ পড়িত না। তাঁহার রহস্যের অভিধানে ডাক্তার কবিরাজেরা ছিলেন "হাতুরিয়া ধন্বন্তরি"। আয়ুর্বেদে তাঁর অক্ষুন্ন আস্থা ছিল। কিন্তু তাহার বিশ্বাস ছিল কেবল অধ্যয়নেই শাস্ত্র জ্ঞান লাভ হয় না। ভূয়োদর্শনে - দীর্ঘকালার্জিত পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতায় তাহা লাভ করা যায়। সেই জন্যই পূর্বকালে একজন বৈদ্যের স্থলে বর্তমান উপার্জনস্পৃহী ও অসহিষ্ণুতার যুগে শত কবিরাজ আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে— অধ্যয়নের বাহিরে পূর্ব্বে যে ধীর প্রতীক্ষার সাধনা ছিল তাহা এইক্ষণ অপ্রচলিত ও অযথা কালগত হইয়া পড়িয়াছে অথবা সে আবশ্যকতা ও সমাজ অস্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম তাঁহার অস্থি মজ্জাগত ছিল, ভক্তিতে তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল অথবা তাঁহার ব্যক্তিত্বের asset ই ছিল ভক্তি। সকল পুরুষাকারের উপরে তাঁহার এই ভক্তিনীতি চলিত এবং উচ্চপুরুষাকারও যে ত্যাগের ভিত্তির উপরেই গড়িয়া উঠে তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

৫৪

তখন যে সকল কথা রোগ শয্যায় পড়িয়া পিতৃদেব বলিয়া যাইতেন আমি তাহার কিছুই বুঝিতাম না। সেবা যে কি তাহাও বুঝিতাম না। কেবল গুরুজনের কথায় শায়িত পিতার পদতলে বসিতাম এবং পিতৃদেবের কথা শুনিয়া শুনিয়া কোনদিন রাজবৈদ্যেরা যে একেবারে নির্বাক নিস্পন্দ হইতেন, তাহাই কেবল লক্ষ্য করিতাম। বালক বলিয়া পিতৃদেবের উপেক্ষা পাই নাই। বুঝিতাম না তিনি জানিয়াও ঔসক্য লক্ষ করিয়া যাইতেন। কেবল নিদ্রায় পাইয়া নাসিকা গর্জন তুলিলে সরাইয়া নিতে বলিতেন। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে বৃদ্ধ রাজবৈদ্য অনেক কাল পরে চক্ষুর জলে ভাসিয়া একথা আমার নিকট বলিয়াছিলেন। একদিন পিতৃদেবের জ্বরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে বৈদ্য যে বড়ির ব্যবস্থা করিলেন কর্তাপ্রভু তাহারা উপেক্ষা

করিয়া ভিন্ন ঔষধের নাম করিয়াছিলেন। বৈদ্য সকাতরে নিবেদন করিলেন, শেষোক্ত ঔষধের ফল সাংঘাতিক দাঁড়াইবে। কিন্তু পিতৃদেব সাদরে বুঝাইলেন যে তাঁহার গুরুদেবের আদেশে যে সফলতা রহিয়াছে তাহাতে তিনি বিশ্বাস হারাইবেন না।

৫৫

তিনি গুরুদেবের ঔষধ সেবন করিয়া স্বাচ্ছন্দ লাভ করিলেন। কর্তাপ্রভুর শাসনের গুরুভার অত্যন্ত প্রসন্ন মনে বহিয়া চলিয়াছিলেন। কিছুতেই তাহার চিত্তপ্রসাদ বিক্ষুব্ধ হইত না। বালকবালিকারা খেলার ভিতরে আপনাকে একেবারে মিশাইয়া দেয়, তিনিও কাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়া বালির প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে ছিলেন। শিষ্যকে ঋণমুক্ত করিয়া রাজ্যভ ার ছাড়িয়া দিবেন। সেই কল্পিত কার্যশেষের দিক যত অগ্রবর্তী হইতেছিল, কার্যের উপরে সমর্পিত আগ্রহও তেমনই বাড়িতে ছিল। তারমধ্যে একদিন তাহার বালির অট্টালিকার বাধন শিথিল হইয়া গেল। তাহার দীর্ঘসূত্রিতার শ্লথ পদ্ধতি প্রত্যাখান করিয়া এক নিমেষে শিষ্যবৎসল গুরুর গুরু, শিষ্যকে এক সম্পূর্ণ অঋণের রাজ্যে লইয়া গেলেন।

৫৬

পিতৃদেবের জন্য একটি নূতন গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই শ্রাবণ প্রভাতে পিতৃদেব আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করেন। কর্তাপ্রভু সে দিন বিরাট ঘটায় মহোৎসব করিয়াছিলেন। সমস্ত দিন মহোৎসবের হরিনাম ধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ প্রতিশব্দায়মান রহিল। পরদিন প্রভাতে আবার পিতৃদেবের স্বর্গ-প্রয়াণের সংবাদ—আর একবার হরিধ্বনীর মহারোল রাজভবন প্রতিধ্বনিত করিয়া, উর্ধ্বলোকে চলিয়া গেল।

৫৭

পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পরে তাঁহার কনিষ্ঠ, অব্যবহিত পরবর্তী ত্রিপুরেশ্বর বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাদিগের অভিভাবক হইলেন। তিনি নব্যরুচিমান, শিক্ষাপ্রবণচিত্ত, স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার নূতন আলোক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে। নবযুগের শিক্ষায় তাঁহার অতিপক্ষপাতিত্ব ঘরে ঘরে অনুকূল প্রতিকূল আলোচনা চলিত। পিতৃবিয়োগের পরেই তিনি আমাদিগের ইংরেজী অধ্যাপনায় ব্যবস্থায় হাতে দিলেন। আমাদিগের ইংরেজী অধ্যাপক আসিলেন - ঢাকা জেলার অধিবাসী আনন্দ বিহারী সেন। সেন মহাশয় তখনকার নূতণ আদর্শে গঠিত যুবক। অতিপুরাতন বিধি-বিধানের গোড়াপত্তনেই তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গাঘাত জোরে জোরে লাগিতেছিল। যুগের পরে যুগ প্রবাহের পরে প্রবাহ আসিয়া গিয়াছে কিন্তু এতকাল বোধ করি স্রোতের বিস্তারই ছিল এবারে যেমন, বিস্তৃতি

দ্বি. না. গোস্বামী (৫৪, ৫৫, ৫৬ পৃঃ পাণ্ডুলিপিতে নেই। সাযুজ্যতা লক্ষ্য করে কিছু পৃষ্ঠাহীন পাতা থেকে নেওয়া হল।)

গভীরতা ও বেগও তেমনি । মহাভারতের জরুৎকারু মুনি এবং 'মুষিক ছিন্নমূল উশীর স্তম্ব অবলম্বন করিয়া মহাগর্বে লম্বমান" তাহার পিতৃগণের উপাখ্যানটি, এখানে যেন রূপকত্ব বর্জন করিয়া একেবারে অনুক্ষেপণীয় সজীব সত্যে দাঁড়াইয়া গেল। বিশ্বহিন্দুত্ব নিম্ন মহা অন্ধকারের দিকে মাথা ঝুলাইয়া রহিয়াছে, আর যে " উশীর" তৃণ ধারণ করিয়া ঝুলিতেছিল, তাহার পাড়ায় আবার বিদেশী ইঁদুর লাগিয়াছে। ঝোলা ত নয়, কেবল বিনাশের প্রতীক্ষা। গোড়া ছিঁড়িবারও বিলম্ব নাই, ছিঁড়িলেই একেবারে অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বর। এ হইল এদিককার দৃশ্য। বিপরীত দিকে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনস্বিগণের।

৫৮

দ্যোত প্রতিভায় দূরপাতি বেগগামী বৈদ্যুতিক Search light সমাজে নূতন তৎপরতা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিল। নূতন আমলে নূতন টাঁকশাল হইতে যে অগনন উজ্জ্বল মুদ্রা বাহির হইতেছিল আনন্দবিহারী সেন তার একটি। আমি অগ্রজের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চরণে বিদায় লইয়া, কলার পাত চিরকালের তরে ত্যাগ করিয়া, রঞ্জিত মলাট পরিচ্ছন্ন প্যারীচরণ সরকারের নূতন সংস্করণের " First Book of Reading " হাতে লইয়া ভারতীদেবীর মন্দির পথের ভিন্ন শাখা ধরিলাম; এবং পৃথিবীর গড়ন চেপ্টা নয়, কমলালেবুর মত গোলাকার, পৃথিবী অচলও নয় চিরগতিশীল, অণ্ডাকার কক্ষ বাহিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে— সূর্য্যের সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী পরিভ্রমণের কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক-কুর্ম বাসুকীর পিঠ মোড়ামুড়িতে ভূমিকম্প হয় না; প্রথমাবস্থায় পৃথিবী যে একটা উষ্ণ বাষ্পময় গোলক ছিল, ক্রমে শীতল হইয়া বহির্দিক হইতে যে জমাট বাঁধিতেছে, ভিতরের অংশটা এখনও যে তরলোষ্ণ অবস্থাতেই রহিয়াছে এবং তাহার বহিরাবরণ বা ভূত্বকটা আঁটিয়া আসিতে ভূগর্ভস্থ তরল ভাগে চাপনের নড়া চড়া পড়িয়া যে অনবরত ন্যূনধিক কম্পন চলিতে থাকে—তার বাড়াবাড়ি হইলেই যে আমরা তাহা অনুভব করিয়া থাকি; চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি গ্রহেরা যে সজীব নহে এবং রাহু-কেতুও দৈত্য নহে, তাহারা সূর্য চন্দ্রকে গ্রহণ করে না, গ্রহণ হয় পৃথিবী ও চন্দ্রের আড়ালে পড়িয়া — আর ছোট বড় কত কিছু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অকাট্য—গুলি দিন সাতেকের মধ্যে আমরা একেবারে কাঁচা কাঁচা উদরস্থ করিয়া ফেলিলাম।

৫৯

কাল মাহাত্ম! কিন্তু তখন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিয়ই বি + এ = বে, সি + এ = কে এলাকার মধ্যে ঘোরপাক খাইতেছিলাম।

তখন ও শাসন কার্য্য কর্তাপ্রভুর হাতে ছিল। তিনি এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে অবিচলিত ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। আমরা ইংরাজী অধ্যায়ন শুরু করিবার দিন কতক পরে দেখিলাম, রাজদ্বারের লৌহ কর্মশালার অধ্যক্ষ, গোপীমোহন মুনসি, যাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের ৬০ পলও নীচে নয়, আমাদিগের অদূরে বসিয়া বি + এ = বে বানান কণ্ঠস্থ করিতেছেন।

চক্ষে নরম চাঁদিরূপায় বাঁধা মতিবিন্দু চশমা, ডালি দুইটা একাধিক স্থানে বাঁকিয়া যাওয়ায় যথাস্থানে ঠিক রাখিবার চেষ্টায় মাথার পশ্চাতে তৈলসিক্ত, ঘুনসীতে বাঁধা এবং তাহার সম্মুখস্ত Murray's Spelling Book টির প্রথম পশ্চাদ্দিকের কয়টি পাতা ছিঁড়িয়া গেলেও তিনি কল্পনা করিয়া লইলেন যে অন্তত বি + এ = বে-র পৃষ্ঠাটি রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাঁহার বি + এ = বে র গুঞ্জন টি অবাধ চলিতে থাকিল। আমরা নষ্টামি করিয়া বি + এ = বে-র অব্যবহিত পরেই এল + এ = লে পড়িতে শুরু করিলে উৎকর্ণ গোপী মুনসি সন্দিগ্ধ মনে গুঞ্জন বাদ রাখিয়া কেবল ওষ্ঠ নাড়িতেন। তারপর ক্ষণেই যদি কেহ বলিত বি + এ = বে, এর পরেই সি + এ = কে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার জীর্ণ বই ধরিয়া সকলকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেন — সি + এ=কে টা পৃষ্ঠার একেবারে নীচে রহিয়াছে কিনা, তাইতে —ইত্যাদি। গোপীমোহন বিদ্যার্থীর দর্শনাকাঙ্খী অনেক লোক পাঠাগারের দরজায় জড় হইত, এবং রুদ্ধ হাসির বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ অনেকে পরস্পরের উপরে পড়িতে যাইয়া শান্তিভঙ্গ

৬০

করিত। কিন্তু এই হাস্যরসের উপরে দাবী অনেকদিন টিকিল না। অচিরে শিক্ষক মহাশয় জানিলেন, বৃদ্ধ মুনসিটি হঠাৎ ইংরাজী ভাষায় মহিমায় বিমোহিত হইয়া বয়োধর্মন এবং নিজের একশত এক ভাবনা ভুলিয়া যাইতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, এমনকি আনন্দবিহারী সেন মহাশয়ের অপূর্ব অধ্যাপনার আকর্ষণেও। আসলে মুনসীপ্রবর ছিলেন কর্তাপ্রভুর গুপ্তচর এবং তাহার প্রতি আদেশ ছিল আমাদের বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে ধর্মবিরুদ্ধ শিক্ষাও চলিয়া যায় কি না, তিনি কর্তা প্রভুকে নিত্য গোচর করিবেন। কর্তাপ্রভু নাকি শুনিয়াছিলেন যে যেখানে ইংরেজী শিক্ষা গিয়াছে তার সঙ্গে এই সকল অত্যাচারও প্রবেশ করিয়াছে। এখানে বুঝি তার ব্যতিক্রম হইতেছিল। শিষ্য বাৎসল্যের নির্বন্ধই কি তাঁহার এই দায়িত্বের প্রসারকে অপর যাবতীয় হিসাব অতিক্রম করিয়া টানিতে ছিল না? বলিবার প্রয়োজন নাই যে হাস্যরসটির পিঠপিঠ আসিয়া জুটিল ঠিক তার বিপরীত রসটি। আনন্দবিহারী সেনের আসন্ন বিপদ। আর আমাদেরই বা খালাসের সাফাই কি? সেই সঙ্গে বা আমাদের ইংরেজী পড়ারও আসন্ন কাল না আসিয়া পড়ে! কিন্তু দৈব চক্রের সালিসিতে গতিক ঘুরিয়া গেল। গোপীমোহন মুনসি যেদিন বেলাবেলি পাততাড়ি গুটাইয়া সটান লৌহ কর্মশালার দিকে ছুটিলেন, সে দিন শোনা গেল যে রাজ্য শাসনে হাতবদল হইয়া গিয়াছে।

কর্তাপ্রভু বহুকাল পরে বহুদিনের উপেক্ষিত মহানিধি "নীলমণিকে" আবার বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিলেন। গোটা বেহালার আওয়াজ বসিয়া গেলে সুদক্ষ বেহালাবাদক যন্ত্রটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবার জুড়িয়া লয়।

৬১

তাহাতে নাকি যন্ত্রটার প্রচ্ছন্নসুর প্রকট হইয়া পড়ে। এই ভাঙ্গার পরে জোড়ার মত বিচ্ছেদের অন্তে মিলনে ও বুঝি হৃদয়ের কোণে খোঁজে লুকাইয়া যাওয়া সুপ্ত সুরগুলি রেশ ধরিয়া বাজিয়া উঠে। মনের উপর যাঁহাদের প্রভুত্ব আছে তাঁহারা, এমনকি, আপনার ব্যক্তিত্বেরও ড্রিল (drill) করাইয়া থাকেন। দেখা গেল গতকল্যের ঘোর বিষয়ী কর্তাপ্রভু আজ নিদ্রোত্থিত নিদিধ্যাসশীল প্রভু গোস্বামী। কিন্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা পথের লোকের সঙ্গে তুলনায় বরাবর জিতিয়া যায়েন না। শেষোক্ত বা সমাজের উপেক্ষায় পড়িয়া বিস্মৃতির মধ্যে তলাইয়া যায়। প্রসিদ্ধেরা তেমন সহজে নিষ্কৃতি পায়েন না। বিশ্ব সামাজিক কার্য্য বিধির অনুশাসনে তাঁহারা জীবিত থাকিতে বিচারের ডাক আইসে না। তাঁহারা যখন থাকেন না তখনই মানুষের বদলে মানুষের নামকে আসামীর কাঠগড়ায় ঠাসিয়া দেওয়া হয়। আর সেই বিচিত্র বিচারে— ফরিয়াদি সাক্ষী, উকিল ও হাকিম এক অভিন্ন ব্যক্তি। বলাবাহুল্য যে কর্তাপ্রভুরও নামে সমনজারী হইয়াছিল।

ইংরাজী অধ্যাপনায় আনন্দবিহারী সেন মহাশয়ের ছাত্র কেবল আমরা দু'ভাইই ছিলাম না। রাজঘরের অদূর সম্পর্কিত কয়জন এবং ঠাকুর পরিবারেরও কয়টি শিক্ষার্থী জুটিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কেহ কেহ পরিণত বয়সে উচ্চ রাজকার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন, নিন্দিত আত্মীয়ানুরাগের ফলে নয়। মানুষ হওয়ার আসরে শক্তি ও দৌর্বল্য দুই বাহির হইয়া পড়ে।

৬২

কিন্তু তাহারি মধ্যে কোন দুইজন মানুষের ভবিষ্যতে এক রূপ দাঁড়ায় না? যাঁহারা উপাদান পরীক্ষা দক্ষ তাহারা নিশ্চয়ই দেখিতে ছিলেন যে এই নবীন তন্ত্রের শিক্ষিতের মধ্যে অন্ততঃ কয়টি লোক পরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বৎসর ঘুরিয়া আসিল। পিতৃদেবের সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধের পূর্বদিন আমরা দুই ভাই যথাবিধ 'সংযত' হইলাম। রাজপণ্ডিত পুরোহিত এবং অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে রাজবাড়ির বহিরাঙ্গনে, যেখানে পরদিন সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ হইবে, দানের দ্রব্য সম্ভারের স্তূপ এবং অন্যান্য বিবিধ আয়োজন দেখিয়া গৃহে ফিরিলাম। তখন রাজধানীতে কলেরা রোগ প্রবলভাবে চলিতেছিল, কিন্তু এই সংক্রামক রোগের আতঙ্ক শ্রাদ্ধে আহত বা রবাহুত কাহারও গতিরোধ করিল না। নিয়তিকে আত্মবিক্রয় করিয়া ভারত সন্তান ঔদাসিন্যের হাসির দাবি হাসিল করিয়া বসিয়াছে— এখানে জন্মার্জিত সংস্কারের প্রভাবে মৃত্যুভয়টাও যে প্রায় atrophied হইয়া গিয়াছিল তাহা সহজে বোঝা যায়। এ স্থলে আমার একটা কথা মনে পড়ে, আমি যখন কুমিল্লা মুনিসিপ্যালিটির চ্যারমেন তখন মুনিসিপাল এলাকার মধ্যে একটা পল্লীর মধ্যে কলেরার মড়ক পড়িয়াছিল। বলাবাহুল্য যে আমি আমার সাঙ্গোপাঙ্গো পল্লীস্থ একটি মাত্র পুষ্করিণীতে লাল রংয়ের নিশান গাড়ী করিতে যাইয়া মহাবিজ্ঞের মত পাড়ার লোককে সামাজিক দায়িত্ব এর germ theory ঝাড়িলাম (অবশ্য অশিক্ষিত ও অল্পবুদ্ধি পল্লীবাসীকে যত সহজ বাংলায় বুঝাইতে পারা যায়), আহা বেচারারা!

শ্রোতাদিগের মধ্যে পাড়ারই একজন প্রাচীন লোক অন্যের সঙ্গে তুলনায় সমধিক মন দিয়া বক্তৃতা শুনিয়া গেল।

৬৩

তারপরে যোড়াহাত দুইটি মাথায় ঠেকাইয়া বলিল,—"আপনি মা বাপ, তাই বলিয়া আমাদের কষ্টে ফেলিলেন; কিন্তু আপনি যদি দয়া করিয়া আজ্ঞা করেন, আমি আপনার সম্মুখে এই জলটার এক ঘটি খাইয়া ফেলি, আর আগামীকাল যেমন সময় হুকুম করেন, অফিসে যাইয়া আপনার পায়ের ধূলি লইয়া আইসি।" শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনের কথা হইতেছিল। রাজপথে জনতা এবং অব্যক্ত কোলাহল ক্রমে বর্ধিত হইতেছিল। শুইতে যাইয়াও বালিসে মাথা রাখিয়া তাহাই শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম, বালকের নিদ্রার সাধনা নাই। শেষ রাত্রিতে গৃহের মধ্যে কোলাহল এবং ক্রন্দনের রোলে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দাদার কলেরা হইয়াছিল তিনি জীবিত নাই, দুইবার রেচনের পরেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। অগ্রজ স্বর্গারোহণ করিলেন। সপিণ্ডকরণ বাধা পড়িল। মৃতাশৌচ কাল অতীত হইলে একদিনে পিতা এবং ভ্রাতার শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিলাম। এই ঘটনার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোহিনচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পরে তিন বৎসরের মধ্যেই তাহার অতি আশঙ্কা ফলিয়া গেল। মৃত্যুদেবতা নিরলস আতিথ্য স্বীকার করিয়া গেলেন।

গৃহে মুখে মুখে হাহাকার, বান্ধবের বাষ্পাকুল চক্ষু— আমার অস্বস্থ ভার-পীড়িত হৃদয় কোথাও সান্ত্বনার আশ্রয় পাইতেছে না। দিনরাত্রি পর পর আসিয়া যায়। নিরানন্দ বিশেষত্ব বিহীন-জীবন কেবল জাগরণ নিদ্রায় পালা করিয়া কাটাইয়া চলিতে থাকিল। কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার একদিকে দুইহাতে খড়গ এবং সদ্য ছিন্ন মুণ্ড, আর দুই হাতে সান্তনা ও আর্শীবাদ — কোন জোড়া হাতেরই কি বিশ্রাম নেই। লীলা বটে! কিন্তু এই দুঃখ -তাপের দিনেও প্রকৃতির স্নেহ-সোহাগের একটু বিরতি নাই। চিরতরুণ শব্দ, স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-সাজানো ডালাখানি

৬৪

সে কেবল সুখীজনের একচেটিয়া ভোগ ধরিয়া দেয় না, দুয়ারে দুয়ারে লইয়া ফিরে, এহাত এড়াইয়া পালাইবার ঠাঁই নাই। ঘুমের রাজ্যেও পিছু পিছু চলে— চোখ মুছাইতে হইবে; মধু আনিতে হইবে—বাতাসের গতিতে , সমুদ্র হইতে চুয়াইয়া, ওষধি বনস্পতি নিঙড়াইয়া, এবং তাহাই ছড়াইতে হইবে নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া-হাসি ফুটাইতে হইবে-মরজগতেরই অধরে; তোমার স্বপ্নময় স্রোতস্বতীর বক্ষে দিবসের কাঞ্চনচ্ছটা এবং রজনীর রজত প্রভা প্রত্যক্ষ করিবার যে ইন্দ্রিয় , সে ত তারই অযাচিত দান, আর সে প্রত্যক্ষ সিদ্ধির-সিদ্ধির জন্য ত আবার সময়ের মঞ্জুরী লওয়া perspecrtive এর অপেক্ষা নাই। তোমার জবরদস্তির উপেক্ষা যে তাহার লক্ষ্যের মধ্যে ঠাঁই পায় না। চির নবায়মান বসন্ত-বর্ষা-শরৎ, নূতন হইয়া নূতন লইয়া, অঙ্গে পুরাতনের চিরাকাঙ্ক্ষিত মধুরস্পর্শ মাখাইয়া, ফিরিয়া আসে কাহার জন্য ? চিরকাল

তোমার প্রাণের স্পন্দন ভোগ করিয়াও ত তাহার তৃপ্তি আসিল না। সে ত খেয়ালের বেহিসেবি বাড়াবাড়ি নয়। তাড়িত প্রবর্তক শক্তির volt এর হিসেবের মত কলানুবন্ধী ব্যবস্থা-যা চাই তাই, যতখানি চাই ততখানি। শব্দ-স্পর্শ-রূপের ইথরের কম্পন আর তোমার প্রাণের স্পন্দন, বুঝিবা পরস্পর খুঁজিয়া লয়, পরস্পর মিলিয়া বড় করিয়া স্পন্দিত হইবার জন্য, রাজগুহ্য সত্যটার রহস্য প্রতিষ্ঠার জন্য। ' জগৎ মিথ্যা' কথাটা জোর করিয়া বলতে পারা গেল কই? রূপ-রস-স্পর্শ-সত্তার সংবিত্তি অস্বীকার করা চলে কই? অস্বীকারের চেষ্টাও যে অসার্থক। তাহারা যে তাহাদের প্রাণের অতিমৃদু কম্পনটাই অনুভব করে, তাহাই নয়; তোমার প্রাণ যে নিভৃতে পথে চলিয়া যাইয়া তাহাদের প্রাণের পাণি স্পর্শ করিবে তাহা ও ত

৬৫

তাহাদের খোঁজ খবরের বাহিরে নয়; তাহা না হইলে যে তাহারা তোমার প্রাণের সত্যের হাতে তাহাদের প্রাণের সত্যটা ঠিক তুলিয়া দিতে পারে না। রূপ-রস-গন্ধ-খুঁজিয়া , ডাকিয়া আনিতে হয় না। রসাত্মক বাক্য - কত রমণীয়, কত শোভনীয়,ব্যক্তিত্বের ও মহান প্রভাবে বেদনা ত ছোট কথা তোমার আপন অস্তিত্ব পর্যন্ত তোমাকে ভুলাইয়া ফেলে। দূরত্ব- বিচ্ছেদে যাহাদের করুণ নিশ্বাসের টেলিপ্যাথী, মিলন সামীপ্যে তাহাদেরই নয়নে নন্দনের আনন্দস্ফুরিত জ্যোতি জীবন কে মধুময় করিয়া তোলে।

৬৬

যে বকেয়া সাবাড়ের ডাকে কর্তাপ্রভুর ব্যক্তিত্বকে হাজির হইতে হইয়াছিল সেই কাজ সাবাড় হইয়া গেলে তাহাকে রাখা চলিল না। সেরেস্তার দস্তুরাতেও Extension এর block up ব্যবস্থা নাই। কিন্তু বিরাট সেরেস্তাটির প্রয়োজনেরও অন্ত নাই তরঙ্গের পশ্চাৎ তরঙ্গের ধারাবাহের মত কেবলই আসিয়া পড়ে। তবুও বেসুমার, বে-সেহা নয়; এবং কোনটির বন্দোবস্ত বাদ পড়ে না। যদিও ভিন্ন প্রয়োজনে দুইজন শাসন কর্তার মধ্যে হাতবদল হইয়াছিল তাঁহাদের বৈসাদৃশ্য ছিল বাহিরেরই দৃশ্যে। যবনিকার অন্তরালে উঁকি মারিলে উভয়ের সাদৃশ্যই দেখা যাইত। দুইজনেরই ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব ছিল রাজস উপাদানের আতিশয্য। কারণ কার্যের পরম্পরীন আকষর্ণটা যখন অ-তামস কর্তাঠাকুর সাহেবের দরজার টানা হাতল স্পর্শ করিয়াছিল তখন গৃহস্বামী যে বিনিদ্র প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের স্থল ছিল না। উভয়েরই ছিল অবাধ স্বচ্ছন্দ শাসন অর্থাৎ যাহার জন্য তাদের জবাবদিহি ছিল একমাত্র আপন নীতিবুদ্ধির নিকটেই। বিশেষত সেকালে শাসন

৬৭

বলিতে বোঝা যাইত.'one man rule' — অন্য প্রণালীর শাসনের জন্য কাহারো কল্পনায়ও স্থান ছিল না। আর এখনকার কালে? নূতন শিক্ষার এবং প্রাচীন সংস্কারের ভিন্ন দুই কেন্দ্রের সমবায়ী আকর্ষণে একটা অপূর্ব ভেজাল রঙ্গমঞ্চে আনিয়া উপস্থিত করা যায় সত্য

কিন্তু তার আর কিছু থাকুক বা না জীবশক্তি থাক না। এদেশে এখনও তার সুপ্তির ঘোর কাটিয়া উঠিতে সময় লাগিবে। পরদেশী Flora faunna লইয়া মাঝে মাঝে এমন বিপন্ন হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। তেমন এদেশে এক জন আদর্শ লোকের শাসন মনুর দিন হইতে চলিয়া আসিরায় তাহা সাধারণ্যের একপ্রকার ধাতুগত হইয়া যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে আমার ছোট্ট একটা কৈফিয়ৎ এই —'one man rule' ও Despotic rule এর সামঞ্জস্য আনিয়া ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে দুইজন শাসনকর্তার নাম করা গিয়াছে তাঁহাদের উভয়ের আর একটা মৌলিক সাদৃশ্য ছিল উচ্চাভিলাষ তরুণ বয়সের নয় (যদিও সম্পদটা অর্জিত হয় তরুণ বয়সেই) পরিণত বয়সে যাহা শিক্ষা ও শাসনাদির দ্বারা সংস্কৃত সংযত এবং এমনকি বিনীত হইয়া উঠিয়াছে —তাহা। আরও একটা সাদৃশ্য উভয়ের ছিল —'ধৃতি' অথবা 'আত্মাধিকার' এবং নিরুদ্বেগ—আত্মনির্ভরশীলতা। এইরূপ অনন্য মনোবৃত্তির পুঁজি লইয়াই তাঁহারা বিভিন্ন লক্ষ্যের দিক ধরিয়া পদচালনা

৬৮

করিয়াছেন পথ ধরিয়া নয়। ওদিকে ধরিবার পথ নাই। জীবনের পথ গড়া-পেটা থাকে না—" because life is not like a well-traden country where all the routes are clearly mapped out, and where one has only to choose his road and walk steadily along it to the desired goal. No, life is an ocean which is, and must forever, unchanted; an ocean whose weaves roll over each sunken rocks and hidden shools, where unexpected tempests rise at any moment, and each new mariman must set out on that voyage with perhaps the confidence and courage of Columbus—"

যে সময় ত্রিপুরা রাজ্য শাসন এই কর্তাপ্রভুর হাত ছাড়াইয়া ত্রিপুর সন্তানের (কর্তা ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব) হাতে ফিরিয়া গেল তখন ত্রিপুরা সিংহাসন লইয়া স্বর্গীয় নরপতি কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের তিন কুমারের মধ্যে জেলা ত্রিপুরার দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল। অব্যবহিত পূর্বে ঋণ সমস্যায় কর্তা প্রভুর কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে সাধনার সফলতা ছিল এক সা-আরম্ভ হইতে (শেষ)। কর্তা ঠাকুর সাহেবেরও কার্যারম্ভ হইয়াছিল সুবর্ণসুযোগের পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেই, যেহেতু কর্তাপ্রভুর অধিকারের মতই অনুকূল উপক্রম লইয়া তাহার আরম্ভ। তাহার সংকল্প ছিল ত্রিপুরার সিংহাসনে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। নিরবচ্ছিন্ন অষ্ট বৎসরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তিনি

৬৯

তাহাই করিয়াছিলেন, আসলেও। তারপরে আসিল পূর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তিনি যে সাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে পরে নীরবে অনাড়ম্বরে আসিয়া পড়িল তাঁহার অসত্তাত্ব (state of being nonentity)। প্রকৃতির ঘরকন্নার বিধিতে (economy of nature) বর্জনের (exception) বিধান নাই। সুতরাং ইন্ধন অগ্নির

আপেক্ষিক পরিমাণে বাড়তি ঘাটতিরও ভাবনা নাই। উপরে বলা গিয়াছে যে কর্তাঠাকুর সাহেবের সঙ্কল্প ছিল, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া আপনার কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই ক্ষেত্রে মহারাজ বীরচন্দ্রের বুঝিবার গোলমাল ছিল না। রাজকার্যে অঙ্গুলী বিক্ষেপের চেষ্টা, তাহারই গড়িয়া উঠা কল্যাণের (তখনও কাঁচা) প্রতিমার অঙ্গে খোঁচামারায় দাঁড়াইবে। তাহা হইলে এই হয় যে সেদিকে তাঁহার নিশ্চেষ্ট নির্ভরতা কেবল ক্ষতি এড়াইয়া যাওয়াই নয়, লাভবত্তার ও সুকৌশল। কর্তাঠাকুর সাহেবের হাতে সেদিককার ভার রাখিয়া তিনি, সাহিত্য এবং যাবতীয় সুকুমার কলার অনুশীলন ধরিলেন। বাস্তবিক তাঁহার রুচি, চিত্তবৃত্তি, নৈপুণ্য এবং সাধারণ উপযোগিতা অনুকূল অবস্থার সহযোগিতায় মহারাজের সিদ্ধির পথ সুসংস্কৃত এবং আলোকিত করিয়াছিল। শৈশবে ফারসি এবং ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিক্ষার উদ্দীপনা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। বর্ষশেষে, আমাদের

৭০

পাঠ্য পুস্তকের পড়া শেষ হইয়া গেলে তাঁহার সম্মুখে পরীক্ষা গৃহীত হইত এবং অধ্যাপক মহাশয়ের নির্বাচিত প্রশ্নাবলীর বাহিরে তিনি স্বয়ং কতকগুলি বিশেষ প্রশ্ন মনোনীত করিতেন। উত্তরের বিচার ও marks তিনি আপনার হাতে রাখিতেন। এই শ্রম স্বীকারটি তাহার এক বৎসরের জন্যও বাদ পড়িত না। আমি অনেকগুলি পুরস্কারও পাইয়াছিলাম। এইভাবে তিন চার বৎসর চলিয়া গেলে আমাদের একটি নূতন কাজ বাড়িল— বাংলা কবিতা লেখা। আমার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে একজন ভালই লিখিতেন। তিনি ঠাকুর পরিবারের বালক। আমার সহাধ্যায়ীরা সকলেই আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক। অন্যান্য সহাধ্যায়ীরাও অনুপেক্ষণীয়রূপে লিখিয়া যাইতেন। আমার কবিতা জোগাইত না। সেইটা একটা চেষ্টাত নয়ই, বিষম সমস্যা। শিক্ষক মহাশয় আনন্দ বিহারী সেন পক্ষপাত আরম্ভ করিলেন। আমার লেখা আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দিতেন। পুরস্কার ও পাইতে লাগিলাম একদিন এ ধারা পড়িল। সেদিনকার কবিতার বিষয় ছিল গোধূলি। খুল্লতাত স্বয়ং বিষয় নির্বাচন করিতেন। সেদিন আমার মোটেই লেখা হইয়াছিল না। শিক্ষক মহাশয় আদ্যোপান্ত একটা কবিতা লিখিয়া দিলেন। কবিতা পড়িয়াই আমার ডাক পড়িল। আমার মুখে পিতৃব্যদেব শুনলেন, এত কাল যে পুরস্কার পাইয়াছি, সে সকল কবিতা আগাগোড়া আনন্দ বিহারী সেন মহাশয়ের সংশোধিত, শাব্দিকশুদ্ধির বেশীরভাগ তিনি দেখিয়া দিতেন; আর সেদিনকার কবিতা একেবারে আদ্যো পান্ত তাঁহার নিজের রচনা। বলা বাহুল্য সে দিন হইতে আমাদের কবিতা রচনা বন্ধ হইয়া গেল। উপায় যাহাই হউক ফলটা উপাদেয় হইয়াছিল বলিতে পারি না। কবিতা রচনা বাদ হইলেও সাহিত্য ও কলাচর্চ্চায় সভায় আমাদের উপস্থিত থাকিতে হইত। যাই হউক আমরা আনন্দের সহিত সে আদেশ বহন করিয়াছি। তাহাতে বিস্তর শিক্ষাও করিয়াছি। আমাদের ইংরেজী অধ্যয়নারম্ভের কিছুকাল পূর্বে তিনি একটি অবৈতনিক বঙ্গ বিদ্যালয় (ব্রিটিশ ভারতের স্কুলের বিধি ব্যবস্থায় পরিচালিত সাধারণের প্রবেশগম্য আদি বিদ্যালয় ত্রিপুরায় পাশ্চাত্য শিক্ষার genisis) স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্কুলে স্থানীয় বহু বালক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাজপরিবারেরও একজন বিদ্যার্থী সেখানে অধ্যয়ন করিতেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের আশ্চর্য উৎসাহশীলতায় এবং উদ্দীপনায় সেই যুগের ত্রিপুরার ঘোর রক্ষণশীল পরিবর্তন বিরোধী সমাজেরও রুচি য়ুরোপের নূতন শিক্ষা সভ্যতার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিয়া ছিল। বস্তুত তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এমন একটা কিছু প্রবর্ত্তনাজনকতা ছিল যে তাহা প্রতিরোধ করা শক্তই হইত। নূতন কিছু শিখিবার ঔৎসুক্য অন্য বালক অপেক্ষা আমার অল্প ছিল না। মোটামুটি বালকের মনের গতিপ্রবণতা ও একগুঁয়ে ঘাড়ভাঙ্গা গতিতেই সে দিকে চলে। খুল্লতাতের সভাতে যে সাহিত্য ও কলাচর্চ্চা হইত তাহাতে উপস্থিত থাকিতাম, তাঁহার মৌন সম্মতিতে নয়, স্পষ্ট আদেশেই। টলস্টয় (Tolstoi) তাঁহার 'My Confession' গ্রন্থে বলিয়া ছিলেন, তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বয়সে।

৭১

তাঁহার এক বালক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে ঈশ্বর বলিয়া কেহ বা কিছু নাই এবং এতকাল তাঁহারা এ সম্বন্ধে যতকিছু উপদেশাদি পাইতেছিলেন সেগুলি একেবারে কাল্পনিক। তখন হইতে টলস্টয়ের ভ্রাতাগণ এবং তিনি স্বয়ং এই নূতন তত্ত্বের (Philosophy) দিকে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই কি নূতন সঞ্চয়ের অতিপক্ষপাতী বিশ্ববালকের মঙ্গলার্থে মনস্তত্ত্বদিরা ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন—" না পড়াস পো সভায় থো?" আমাদের সম্মুখেই কোন কোন অপেক্ষাকৃত সাহসিক সভাসদ খুল্লতাতকে বুঝাইতেন যে বালকের সাক্ষাতে অবাধ কলা সাহিত্য চর্চ্চায় শিষ্টাচার স্খলিত হয়। তাঁহারা অবশ্যই বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃত তাহা হইয়া থাকে। তাতেই সভাসদ দিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তাই অনুরূপ দৃঢ়তারই সহিত খুল্লতাতদেব সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিতেন। এ প্রায় নিত্যই হইত তাঁহার মত (তাঁহারই মুখে কতবার শুনিয়াছি) ছিল সুন্দরের সহিত কুৎসিতের সহজ সঙ্গতি নাই। ললিত কলা এবং অশ্লীলতা তেমনই বিরুদ্ধধর্ম্মী। একটা আর একটাকে ঠেলা মারে টানে না। তিনি একদিন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন; তখন তিনি, কৌচে বসিলে তার হাতলে (arm) উঠিয়া বসিতেন। এবং ঢালা ফরাসে তাকিয়ার উপরে আসন করিয়া লইতেন। একদিবস এই তর্কে তিনি বলিতে থাকিলেন— কেবল প্রয়োগের দোষে সঙ্কীর্ণ

৭২

প্রণালীর শিক্ষাদানে, অর্থাৎ অনধিকারী উপদেষ্টার উপদেশে এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁচ ঢালাইয়ের অনিপুণতায় সোজা মুখ আরশিতে টেরা বাঁকা দেখায়। যাহা মানুষের ভোগের জন্য জ্ঞানের জন্য হইয়াছে তাহা মানুষ ভোগ করিবেই এবং জানিবেই। শিক্ষার্থীর পথ প্রশস্ত না রাখ, তারা সঙ্কীর্ণ পথ ধরিবেই। অর্থাৎ শিক্ষাদাতার কর্তব্য হইবে দিনের আলোকে, খোলা পথে আপনার সাহচর্যায় শিক্ষার্থীদের চালাইয়া নেওয়া। তাহা না কর, তাহারা সন্ধ্যার আলো আঁধারে গলিঘুচি ধরিবেই ধরিবে। কোন অবস্থা অধিকতর বাঞ্ছনীয়? লুকাইয়া ছাপাইয়া রাখিবার যুগ আর নেই। শূদ্রেরা এইক্ষণ ছাপার বইয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করে। তোমরা শীর্ষস্থানীয়

কবিদিগের রুচির দোষ দেখ — তাহাদের বর্ণিত দেবদেবীর বিশেষত দেবীর ধ্যানে অশিষ্ট ভাষা আসিয়া পড়িয়াছে এমনই আশঙ্কা করিয়া ফেল। কিন্তু তখন তোমাদের কবির প্রতি মর্য্যাদা লঙ্ঘনের অপরাধ ভুলিয়া গিয়া মানুষ তোমাদের চোখ বোজা ও জিভকাটা মূর্তি দেখিয়া কোন প্রকারে হাস্য সম্বরণ করিতে পারে কি? পিতৃব্যদেব এই কথা বলিতে যাইয়া সেদিন যে অট্টহাস্য করিয়াছিলেন তেমন করিয়া তাঁহাকে হাসিতে কখনও দেখি নাই। সভায় কাব্যচর্চ্চা হইতে যাইয়া কবিদিগের রচনার আপেক্ষিক বিচার চলিত। তখন বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশ নন্দিনী' সবে বাহির

৭৩

হইয়াছিল একদিন কোন কোন সভাসদের মুখে বইখানার লঘুভাষার নিন্দা শুনিয়া খুল্লতাত বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মনে লয়, এই শক্তিমান লেখক বাঙলাভাষাকে তার সংস্কৃতের খাতক রাখিবে না। পণ্ডিতি বাংলা, যাহাকে সাধুভাষা বলে তাহা বোধ হয় আর টিকিল না। আর এই কথায় বরং গৌরবের আনন্দই রহিয়াছ—ইত্যাদি। কবি মধুসূদনের তখন যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল সবগুলি আনাইয়া ছিলেন। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে তিনি এমন অনুরক্ত ছিলেন যে কাহারও পাঠে ভাব পরিব্যক্তির বাধ পড়িলে বিচলিত হইয়া উঠিতেন। 'মেঘনাদ বধ' বাঙলা কাব্যে অতি উচ্চ অধিকার পাইয়াছিল এবং মাইকেল তখন হইতেই কাব্য জগতে Boomstar। বইখানার আলোচনায় পিতৃব্য সভাসদ দের সঙ্গে একমত হইয়া স্বীকার করিতেন উহা কবির অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু অন্যের সহিত তাঁহার মত বিরোধও ছিল, তাই একটু দীর্ঘ করিয়া আপনার মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাই ভুলিও নাই। তিনি বলিতেন— খাদপোরা পাকা সোনার মত এই অপূর্ব কাব্য ও দরমরা হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যে স্থলে কবি প্রবৃত্তির ঝোক সামলাইতে পারেন নাই। মধুসূদনের একটানা পক্ষপাতর শাসনে, নায়ক মেঘনাদের প্রতিযোগী লক্ষ্মণকে তাহার সমস্ত শুরবত্তা বাহিরে রাখিয়া, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। সেখানে তিনি কোষা কুষিরও আঘাতে দীর্ঘ মূর্চ্ছায় পড়িয়াছিলেন। প্রায় মরিয়াই গিয়াছিলেন আর কি! এই নায়েবটির উপহাস্য চরিত্র চিত্র করিয়া তিনি সর্দারকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন কি? রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে তিনি কি বিড়ম্বিতই না করিলেন!

৭৪

রণবেশে মেঘনাদের পত্নীকে দর্শন করিয়া মধুসূদনের রামচন্দ্র যেন মধুসূদনেরই নাম জপ করিলেন। আবার উপস্থিত বিপদ কোন মতে কাটাইয়া লইয়া মিত্র বিভীষণের নিকট কাতরানি গোঙ্গানির সুর ধরিলেন মেঘনাদের স্ত্রীকে সংগ্রাম বেশে দেখিয়াই তিনি (রামচন্দ্র) যুদ্ধের সাধ তখনই ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ কি রমণীর গুণোৎকর্ষে মুগ্ধ বীরের ভাষা, অদম্য অধ্যবসায়ীর উদ্ভাবন দক্ষ সমুদ্রবন্ধনকারীর ভাষা, অনাস্থের পশু প্রকৃতি অরণ্যবাসীর দল হইতে শিক্ষিত সংযত বিপুল বাহিনী নির্ম্মান নিপূণ শুর নায়কের ভাষা? আর দেবতারা? তাঁরা ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের বধের জন্য এই লক্ষ্মনের ন্যায় অপকৃষ্টপাত্র বা অপাত্রটিকেই সাজাইয়া

গুছাইয়া লঙ্কার ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন? কোন কবি, কাব্যের নায়কের প্রতিযোগীকে এমন পদার্থহীন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন? বাস্তবিক মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই দোষটা, তাঁহার গুণেরই মত আর একটা অপূর্ব জিনিস।

সমধর্মী পদার্থ পরস্পরের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ থাকে। দেশাবচ্ছেদ বাধা তাহার মধ্যে আইসে না। ক্রমে মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজদ্বার জুড়িয়া সাহিত্য ও কলাকুশলীর পরিবেষ্টন দাঁড়াইয়া উঠিল। শেষ সময়টাতে আমি আগরতলায় ছিলাম না, শুনিয়া লিখেতেছি। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ মহারাজ বীরচন্দ্রের বন্দনায় গাহিয়াছিলেন—"গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে'— সেই সময়েই

৭৫

মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন, স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষ বি.এ. ভক্তিভূষণ (শেষোক্ত উপাধি মহারাজের প্রদত্ত) বলাবাহুল্য তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু 'আমরা নূতন চাই না" মতটা যে কেহ যতই সাপটাইয়া ধরুক পুরাতনের খোলস ছাড়া নৈসর্গিক ব্যাপারটা তারা ধরিয়া রাখিতে পারে না আর বিশ্বজগতের গতিশীলতার বাহিরে বৈষ্ণব মতটিও অবশ্যই সরিয়া পড়ে নাই। বৈষ্ণব রাধারমণ ঘোষের শিক্ষাদীক্ষার সময় পড়িয়াছিল গীতা যুগের মধ্যে। যখন বৈষ্ণবদিগের দৃষ্টি প্রথমেই সঞ্চালিত হইয়াছিল ভক্তিসর্বস্বতার দিকে — ভক্তির পাদপীঠে বৈষ্ণবের দর্শন সাহিত্য কলার উৎসর্গের দিকে— এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সহিত উপেক্ষিত সকল বৈষ্ণব সম্পদ রক্ষা করিয়া সুক্রমিকতাটি (symmetry) ফিরিয়া পাওয়ার দিকে । আর সকলের উপরে বৈষ্ণবের বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা তখন ভাগবদুক্ত গীতার আদর্শের প্রতি — গৃহ ও গৃহকর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া কর্মাফলের সঙ্গত্যাগ অভ্যাস করিয়া তোলা। কিন্তু সে হইল তখনকার নবীনত্বের তীক্ষ্ম প্রভাবের কথা যাহা এখন ধরপড়া অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমার কয়েকবারই দেখা ছিল। বাস্তবিক তাহারা যে ঢালাইকরের মুচির (metting pot) উপরে ইহারই মধ্যে চড়িয়া বসিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের আচার আচরণের পরদায় ঢাকা পড়িত না। রাধারমণ ঘোষের নির্বন্ধে পিতৃব্য মাণিক্য শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্যোৎকৃষ্ট এবং প্রামাণিক সংস্করণটি প্রকাশিত করাইয়া ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দ্বারা। কোন একজন অতি উচ্চ রাজকর্মচারীর মুখে শুনিয়াছিলাম তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন তাঁহার " Keeper of the consience" পিতৃব্য মাণিক্যের সহিত আমার অবাধ সহজ কথা ব্যবহারে ছিলেন কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট অবশ্যই তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও তাঁহার মধ্যে mentor-Telemalchus সম্বন্ধ গোপন করিতেন না।

৭৬

বলাবাহুল্য রাজকার্য্যের বাহিরে, সাহিত্য চর্চ্চায়, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্য অনুশীলনের ঘোষ মহাশয়ের সহকারিতা মহারাজের সুপ্রাপ্য ছিল।

মহারাজের সভাসদ মদনমোহন মিত্র একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও

তিনি সঙ্গীত রচনাও করিতেন। মিত্র মহাশয়ের এবং মহারাজের স্বরচিত অনেক কবিতা গ্রন্থ একে একে আগরতলা রাজবাটীর মুদ্রাযন্ত্রের বাহিরে আসিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তারপর কেবল রহিয়া গেল পরিতাপ মাত্র যে সেই অনেক গ্রন্থের একখানিও প্রকাশিত হয় নাই; এবং প্রথম সংস্করণের বইগুলি দান বিতরণে বিলীন হইয়া গেলে দ্বিতীয় সংস্করণের ভাবনাও ভাবিবার কেহ রহিল না। এইরূপে স্বয়ং মহারাজের এবং মদনমোহন মিত্র মহাশয়ের রচিত ছোট বড় বহু কাব্য ও সঙ্গীত গ্রন্থগুলির হইয়াছে অরণ্যের অনাদৃত ও উপেক্ষিত পুষ্পের অনাঘ্রাত থাকিয়া ঝরিয়া পড়ার দশা? এই রূপে বীরচন্দ্র যুগের অমূল্য সাহিত্য সম্পদ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য যদি বাহিরের কোন বিজাতীয় শত্রু আসিয়া জয় করিয়া লইত দেশের তেমন দুর্দশার মধ্যেও - এমন একটা নিশ্চিন্তা - নিশ্চেষ্টার অধিকারে এমন সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া দৈবী বিপদের সামিলে, সঞ্চিত সাহিত্যের আদত মালটা অনুদ্ধরণীয় ক্ষতির গ্রাসে পড়িয়া যাইত না।

৭৭

ত্রিপুরার 'রাজমালা' বা যথাক্রমে বর্ণিত ত্রিপুরার রাজাদিগের ইতিহাস প্রকাশিত করা বীরচন্দ্রমাণিক্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সে একটা 'বিরাট ব্যাপার' এবং সম্ভবত সেই জন্যই খুল্লতাত মাণিক্য অনুষ্ঠানটার তত্ত্বাবধান স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। মূল 'রাজমালা' পুঁথি আকারেই, তাহার সৃষ্টি হইতেই, আমাদিগের গৃহেই পরিরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই বহুমাণিক্য পরম্পরা মূল্যবান ইতিহাসের সকলদিক ধরিয়া লওয়া ও চিতা সুরক্ষণের জন্য আমাদিগের পূণ্য পিতৃপুরুষেরা স্বতঃসঞ্জাত নির্বন্ধের মত কেমন একটা প্রবৃত্তি সকলেই অনুভব করিতেন। অনুরাগী পাঠকের ঔৎসুক্য তর্পণের জন্য বলিতে চাই যে ত্রিপুরার একটা স্বীকৃত বিধি (unwritten law) এই ছিল যে ত্রিপুরতের জাতি 'রাজমালা' পাঠ করিবার বা শ্রবণ করার অধিকারী নয়। আমার তরুণ বয়সের কথা তবু বেশ স্মরণ আছে, রাজমালা গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে রাজবাড়ীতে বাঙালী, দেশওয়ালী, মণিপুরি প্রভৃতি যে যেখানে থাকিত তাহাদের সরাইয়া দিয়া দরজায় ত্রিপুরী জাতীয় প্রহরী বসান হইত। এই সংস্কার যে রাজগুহ্য বা সকল গুহ্যের মধ্যে রাজা হিসাবের ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ আইসে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেলে নবযুগের উৎসাহী পুরুষ বীরচন্দ্রমাণিক্য এই রহস্য উদ্ভেদ করিবার প্রয়াস ধরিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কনের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রেস খরিদ হইয়াছিল, এবং

৭৮

এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য, সম্ভবত প্রেসের নাম 'রাজমালা যন্ত্র' রাখা হইয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে মহারাজ বীরচন্দ্র এই অনুষ্ঠানের আরদ্ধি মাত্র দেখিয়া যায়েন।

রাজবাটীতে দুই একজন পুঁথি লেখক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়ত পুঁথি লিখিতেন এবং তাঁহারা যন্ত্রেরই মত লেখার খাটুনি খাটিতেন। প্রাচীন নিয়মে তাঁহারা কর্ম পাইতেন চাকুরির মত না

হইয়া উত্তরাধিকারের মত, অবশ্য লিপিকুশলতা তাহাতে ছাড় পড়িত না। বলা বাহুল্য যে এই অবিরাম যুগান্তবাহী পুঁথি লেখার ফল দাঁড়াইয়াছিল একটা বৃহদাকার গ্রন্থ ভাণ্ডার। পুঁথি লেখা এখ ন উঠিয়া গিয়াছে। লিপি কুশলতার আদর এখন ইতিহাসের সামিল গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই রাজবাটীর পুঁথির গাদা ঘাটাইতে গেলে এমন অনেক দূর প্রসারী সোনার রূপ বাহির হইয়া পড়ে, বোধ করি, যাহাতে একমাত্র ঐতিহাসিক ঔৎসক্যই উদ্দীপন করে না। আর একটা কথা—এই পুঁথিগুলির পনের আনাই ঐতিহাসিক কালের পূর্বেকার তথ্য। লিপিযুগের পূর্বে যাবতীয় সাহিত্যতিহাস মহামেধাবীর কণ্ঠে কণ্ঠে সজীব থাকিত এবং তাহাই কণ্ঠচ্যুত হইয়া আসিয়া পুঁথির পত্রের পত্রে রহিয়া গিয়াছিল। সেই পুরাতন কালের পুরু অন্ধকারের কানাত ভেদ করিয়া চুপি মারিবার ছিদ্র পাওয়া যায়, এই প্রাচীন পুঁথির মধ্য দিয়াই। তবে এই অন্ধকারে চুপি মারিবার একটা করার এই যে চুপিমারা চক্ষু স্বভাবতঃ ভাস্বর হওয়া চাই। বর্ত্তমান .. ..'

[তারপরে আর পৃষ্ঠাঙ্ক নাই। সতর্কতা সহকারে বিষয়বস্তু মিলিয়ে সংকলন করা হল শ্রী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী।]

সঙ্গীত কলায় তাঁহার বিশিষ্টতার কথা বলিতে গিয়া বিলাসিতার ভেজাল না মিশাইয়া ফেলি - বড়লোকের সভায় গায়ক বাদকের জমকাল সমাবেশের দৃশ্য অনেক দেখা যায়, এখনকার হিসাব হইল আউদপতি ওয়াজিদ আলি শাহর সভাকে হার মানাইয়া কিনা। নিতান্ত পক্ষে সমান হইয়াছে কিনা। আমরা আত্মীয় তাই এই বিড়ম্বিত দৃশ্য হইতে দূরে থাকাই আমার লক্ষ্য। বীরচন্দ্র মাণিক্য আপনি সুগায়ক এবং সুবাদক ছিলেন এবং artistic এর অনুরাগ লইয়া সঙ্গীতের অনুশীলন করিতেন। সুহৃদশ্রেষ্ঠ রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কে.টি. মুজিক ডক্টর তাঁহার ' Uuniversal History of Music গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য সম্বন্ধে —" The present Maharaja of Hill Tippera is well known for the encouragement he gives to the art. He himself a practical Musician of no mean merit."

তেমনিই চিত্রকলায় তাঁহার প্রকৃতিনিষ্ঠ শক্তির প্রকাশ — দেখা যাইত। বাল্যকাল হইতে সুপদ্ধতিতে শিক্ষা না পাইলেও প্রকৃতির জোগানে তাঁহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইত। তিনি realistic পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন।— ইং সালে তাঁহার সহিত দেখায় তিনি আমার সঙ্গে আর্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। Art যে imitation নয় illusion ই সে কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেকবার বলিতেছিলেন। আমি তাহার চিত্রের কথা বলিতে গেলে ব্যবহার ক্ষুব্ধ খুল্লতাত বাধা দিয়া বলিতেন, বাস্তবিক তাঁহার চিত্র artistic নয়। তিনি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেন, বড় ঠাকুরের (তাঁহার পুত্র) চিত্র আর্ট হিসাবে বাস্তবিক দোষ শূন্য। একাধিক চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি উচ্চ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিতে পিতৃব্যদেবের অনুরাগ অল্প পরিমাণে ছিল না। তাঁহার studio তে তাঁহার আসন থাকিত, উৎকৃষ্ট নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির পরিবেষ্টনের মধ্যে। সহাধ্যায়ী দীনবন্ধুর কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। তাঁহার পৈতৃক উপাধি 'নাজীর' পদ শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা দরবারে যাবতীয় উপাধি

সম্বন্ধীয় 'সেরেস্তার' কার্যভার এই নাজীরের হস্তে থাকিত। দীনবন্ধু নাজীর সাহেব বিজ্ঞান ও শিল্পের অনুশীলনে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ লাভ করিতেন। পূর্বোল্লেখিত ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেবের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী দীনবন্ধু নাজীর সাহেব।

আপেক্ষিক আধুনিক যুগের রুচিতে আস্থা রাখিয়া পিতৃ্যবদেব পুঁথিগুলির বাছনী করিয়া কয়েকটির মুদ্রাঙ্কন স্থির করিয়াছিলেন। রাজদ্বারে পিতামহ ও পিতৃদেবের সময় জুড়িয়া একজন চিত্রকর ছিল। লোকটা মুসলমান। বলাবাহুল্য যে তখনকার কালে একমাত্র নির্দিষ্ট মৌল পদ্ধতির চিত্রই ভারতের নানা প্রদেশে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। এবং ' আলম কারিকরের' ও (লোকটা সেই নামেই পরিচিত ছিল) চিত্র ছিল সেই পদ্ধতির । আলম কারিকরের চিত্রের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক কল্পিত দৃশ্যই ছিল আটখানির বেশি, হিন্দু দেবমণ্ডলী ও Pantheon ও বাদ পড়েই নাই, গন্ধর্ব কিন্নরাদি রাগরাগিণীর পশুপক্ষীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত যুক্ত নৃমুণ্ডমূর্তির ও অভাব ছিল না। বলাবাহুল্য যে কলা বিজ্ঞানের মিলন এক্ষেত্রে আশা না করা গেলেও টেকনিক (technique) বস্তুটার অপ্রাচুর্য ছিল না। মোট কথা আলম কারিকরের চিত্রে spirit বলিতে যাহা বুঝায় তাহার একেবারে অভাব ছিল না। 'পদকল্পতরু', 'রামায়ণ' এবং অন্য কোন কোন গ্রন্থে আলমের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁহার উক্ত নির্বাচিত পুঁথিগুলির জন্য বহু চিত্রের আদরা খসরা সম্ভবত রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পুঁথিগুলি যে বাধায়ই হউক মুদ্রাঙ্কিত হন নাই।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তখন (Defecto Raja) প্রধানমন্ত্রী ব্রজমোহন ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজনে কুমিল্লা গিয়াছিলেন। শাসনভার রহিয়াছিল দীনবন্ধু নাজীর সাহেবের হস্তে। ক্বচিৎ কোন দিন বিশিষ্ট কাজের বন্দোবস্ত করিয়া কর্মচারীদের সঙ্গে লইয়া দস্তুর মত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়া যাইতেন, কি বন্দোবস্ত করা গেল। আমি তখন বালক মাত্র। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই সকল কাজের কথা আমার নিকটে আনিবার ফল কি। আমার কৌতূহল নিবারণ করিতে যাইয়া সেইটা আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়া তিনি বলিতেন তাহা শুদ্ধ অলিখিত পুরাতন খান্দানের বশবর্তিতা। প্রসঙ্গটার মধ্যে পুরাতন রীতির কৌতূহলোদ্দীপক অসাধারণত্ব ছিল তাই ভুলি নাই।

রাজ্যাধিকার লইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এবং তাহার ভ্রাতাদিগের মধ্যে দেওয়ানী (ব্রিটিশ) আদালতে মোকদ্দমা চলিয়াছিল পূর্বেই বলিয়াছি। জেলা আদালতের নিষ্পত্তিতে (১২জুন ১৮৬৪খৃঃ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ নীলকৃষ্ণ দেববর্মা বাহাদুর পিতৃদেবের উত্তরাধিকারী স্থির হইয়াছিল। এই সংবাদ ঘোড়ার ডাকে সেই অপরাহ্নেই আগরতলা পৌছিয়া ছিল। প্রধানমন্ত্রী মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে কুমিল্লায় ছিলেন। শাসনভার ছিল দীনবন্ধু নাজীর সাহেবের হস্তে একথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । তিনি সেই দিবস সন্ধ্যায় সময় বিশিষ্ট কর্মচারীদের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসিয়াছেন। আমাকেও সেই মন্ত্রণা সভায় আনিলেন? আমার বয়স তখন ১০-১১ বৎসর। খানদানের দস্তুর!

আনন্দ বিহারী সেন মহাশয়ের অধ্যাপনা কিঞ্চিদধিক পাঁচবৎসর চলিয়াছিল। শেষ বর্ষ তিনি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকুমার রাধাকিশোর দেববর্মার (পরে রাধাকিশোর মাণিক্য) ও ইংরেজী অধ্যাপনার ভার পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার (সেনমহাশয়ের) নব্যতন্ত্রোচিত

ব্যবহারাদি প্রধানমন্ত্রীর রুচি বিরুদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল। আনন্দ বিহারী সেন মহাশয় পূজার ছুটির সময় বিদায় লইয়া গেলে তার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না।

ইহার প্রায় একবৎসর পরে ১২৭৯ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে ফাল্গুন ব্রিটিশ ভারতের রাজপ্রতিনিধির প্রতিনিধি স্বরূপ লর্ড **ইউলিক ব্রাউন,** চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেব মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে ত্রৈপুর রাজাসনে (সিংহাসনে) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রধানমন্ত্রী ব্রজমোহন ঠাকুরের ইহাই শেষ কাম্য। তিনি এই রাজ্যাভিষেক ব্যাপারের জন্য অকৃচ্ছ পরিশ্রমে বিরাট ঘটা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গেই একটা নিবিড় অন্তরাল পিতৃব্যদেব এবং আমার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং এমনি ঝোঁকে বাড়িয়া গেল যে কয়েকমাস পরেই অর্থাৎ ১২৮০ ত্রিপুরাব্দে আষাঢ়ে আমি জননী দেবীর সহিত ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম । তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর। একটা অনুভূতি ক্রমে আমার মধ্যে সন্দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল যে আমাকে জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ইহার মূল ধরা যাইত না বলিয়াই কিঞ্চিৎ কৌতূহলও জন্মিত। বাস্তবিক একদিন হঠাৎ নাট্যোচিত সত্বরতার সহিত আমার আগরতলা হইতে যাওয়া একেবারে স্থির হইয়া গেল। এ যেন যাদুকরের আমের চারা ঢাকনার অন্তরালে দুইচার মিনিটে পাতায় ঢলে বাড়িয়া উঠিয়া ছিল। নদীর ঘাটে যাইয়া দেখিলাম, রাজসরকারি বড় নৌকাখানি আছে,কিন্তু মাঝি মাল্লা নাই। রাজানুচরেরা বলিল মাঝি মাল্লা সংগ্রহ অতি অল্পসময়ে হইয়া উঠিবে না। নৌকা সর্বদা চলে না, সেইজন্য রাজসরকারের প্রয়োজন হইলেই মাঝিমাল্লা সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু সেই ঘাটেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রূপে দুইখানি ছোট নৌকা বান্ধা রহিয়াছে দেখা গেল। জনৈক রাজকর্মচারী সেই দুইখানি নৌকায় আগরতলায় গিয়াছিলেন। তাহাতেই আমার কাজ হইয়া গেল। সেই সময়ে নদীপথেই যাতায়াত হইত। মধ্যাহ্নের পরেই রাজধানীর ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়া বেলা ৫টার সময় ব্রিটিশ রাজ্যে 'মোগরার' ঘাটে নৌকা বান্ধিলাম।

সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বলরাম দেওয়ান সাহেব আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে পূর্বে দেখি নাই। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার কথা প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম। এখানে তাঁহার পুর্বেকার দুই একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি পিতামহ মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সমসাময়িক, ঠাকুর বংশীয় রাজানুগ্রহ লব্ধ প্রতিভাবান ব্যক্তি। পিতামহ মহারাজের রাজত্ব সময়ে তিনি 'দেওয়ান' উপাধি লাভ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীত্বের কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের রাজত্বের প্রথমভাগেও তিনিই প্রধান মন্ত্রীত্বে ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীরামঠাকুরের ও রাজদরবারে, বিশেষত পিতৃব্যদেব উপেন্দ্রচন্দ্র যুবরাজ গোস্বামীর (এইখানে 'গোস্বামী' শব্দ বিশেষার্থে রাজ্যের উত্তরাধিকারীর সম্মানাত্মক বিশেষণ বা Courtesy title) দরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

সেই ঘাটে নৌকা বাস করিতে হইল আরও দুইদিন। মাঝিরা দাঁড়ের ঠেলায় নৌকাগুলি ঠিক সোজা রাখিল। রন্ধন ভোজনের বেলা রহিল না। তখন আবার বিপরীত দিকে টানিয়া নিয়া সকাল বেলার স্থানে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া তালুকদার মহাশয়েরা বিদায়লইলেন। এই শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ অবশ্য দুই চারি পুরুষে গড়িয়া উঠে নাই। যুগযুগান্তরকাল ব্যাপিয়া আমাদিগের নমস্য মহাবংশের সঞ্চিত মাহাত্ম্যের সম্মুখে প্রাচীন তালুকদার পরিবার মস্তক অবনত

করিয়াছিলেন। আমাকে ও তাঁহাদিগের শিক্ষায়, পিতৃপুরুষের চরণোদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া,তালুকদার মহাশয়দিগের নিকট বিদায়লইতে হইল। আমি সে দিনকার শিক্ষা ভুলিতে পারি নাই. দিনে দিনে খসিয়া ঝরিয়া পড়িয়া সমাজ জীবনের নূতন আদর্শের সাঁচে গড়িয়া জুড়িয়া উঠিতেছে। তাহার মধ্যে এমন দুর্লভ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কৈ?

আগরতলা হইতে নৌকারোহণ করিয়া দশদিন পরে কুমিল্লার উপকণ্ঠে কালিয়াজুরীর গ্রাসের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। মাঝিরা যখন পাঁচপীর ও বদর নাম উচ্চারণ করিয়া নৌকাগুলি কাছি করিতেছিল তখন আনন্দবিহারী সেন মহাশয় গগন চক্রবর্ত্তী আর একজন সুহৃদকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। কুমিল্লায় আমার খুল্লতাতেরা এবং জ্যেষ্ঠ এবং খুল্ল প্রপিতামহীরা বাস করিতেন । কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র মন্ত্রনা সভায় স্থির হইল, আত্মীয়তা বা স্বার্থপরতার প্রেরণায় ঝোঁকে পড়িয়া তাহাকেই বড় আর তাহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্যকে ছোট করিয়া ভাবিব না। জননী দেবীও তাহাতে সম্মতি দিলেন। পাঁজি খুলিয়া দেখাইলেন যে সে দিনটা ছিল মাসদগ্ধা।

আমার বাসস্থান লইয়া তাঁহার কল্পনায় আর একটা বৈকল্পিক নির্ব্বাচন খেলিতেছিল। কুমিল্লায় তখন একজন মহামনা মুসলমান জমিদার বাস করিতেন, তিনি চৌধুরী মহম্মদ গাজী। আনন্দবিহারী সেন মহাশয় এই ধর্মপরায়ণ এবং মূর্তপরার্থজীবন মহাত্মার একটি বাড়ীতে আমার বাসস্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জননীদেবী সে দিন নারায়ণের অর্চ্চনা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদিগের সন্ধানে অসঙ্গতি কেবল শীলাচক্র এবং পূজক ব্রাহ্মণের । গগন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অশ্রুমোচন করিয়া হাসিতে হাসিতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' দুয়ারে মোর নাগর" পদের সার্থকতা প্রমাণিত করিয়া এই কথা বলিতে যে সময় লাগিল তাহারই মধ্যে নারায়ণ শীলা হস্তে পূজক ব্রাহ্মণ সঙ্গে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণ আমাদিগের বংশেরই ভিন্ন শাখার পুরোহিত। সেই ঘাটের উপরেই তাহার বাড়ী এবং সেই গ্রামেই তাঁহার সম্পর্কিত আরও কয়েকঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। জননী দেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন কাঙাল ঠাকুর অর্চ্চনা ভিক্ষা করিতে কাঙালের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই ঘাটে নদীর চড়ায় তখনই গোময়ের ছড়া পড়িয়া গেল। কানাত ঘেরা হইল, পুজোপকরন আসিল এবং পূজক ব্রাহ্মণ মহাশয় আসন জুড়িয়া পুরক রেচকে নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। জননী দেবী যেমন যেমন আদেশ করিলেন, পরদিন চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতেও নারায়ণ পূজা।

যিনি বলরাম দেওয়ান সাহেবের সহিত দুই দণ্ড আলাপ করিয়াছেন তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেন যে ইঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে অপর্যাপ্ত শক্তি রহিয়াছে। ইহার মেধাও বিস্ময়জনক। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে একটা ইংরেজী প্রবাদ আছে—"Wax to receive and marble to **retain.**" দেওয়ান সাহেবে ইহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। নাম তারিখ উপাদ্যস্থান, প্রবাদ যাহাই বল তাঁহার স্মৃতি বিচ্যুত হইত না। জীবন গ্রন্থে মেধা বিষয়ে কশ্চিৎ এই প্রকার monstiocities এর উদাহরণ পাওয়া যায়। সম্যক কার্য পারদর্শিতার জন্য এই শক্তি

বিশেষরূপে চাই। একজন আদর্শ দার্শনিক ব্যক্তি হাতের কাজটা বই খুঁজিয়া তর্ক করিয়া সুন্দররূপে সাবাড় করিয়া দিতে পারেন কিন্তু এই খোঁজ তালাসের প্রণালীটা বড় সহজ handicap নয়। আমাদের এই desultory memory -র ready type এর উপর লোকটার economic advantage এখানে অস্বীকার করিবার যো নাই। আমার মনে হয় ত্রিপুরার রাজ সরকারের একজন মহাফেজের মস্তিষ্কের বিকার জন্মিবার পরেও সেই প্রায়োন্মাদ ব্যক্তির নিকট যাইয়া অন্যান্য কর্মচারীরা পুরাতন কাগজের অনুসন্ধান করাইয়া নিত। লোকটার অনুসন্ধিৎসু কর্মচারীদিগকে কাগজের খোঁজের সঙ্গে বলিয়া দিতে কখনই ভুলিত না "ওয়াকিবকারে সর্ব্বজ্ঞে বরাবর"। দেওয়ান সাহেবের কথা হইতেছিল। পরিতাপের বিষয় যে তিনি ও তাহার ভ্রাতা শ্রীরামঠাকুর দেশীয় লোকের অতি অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন। জনসাধারণের সহিত এই বিদ্বেষ যেমন হইতে লাগিল সেই সঙ্গে মন্ত্রণাও চলিতে থাকিল। বলা বাহুল্য দেওয়ান সাহেবের অবজ্ঞায় তাহার সুযোগ বাড়িয়া গিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট মতের বুকনি বা দানা বাধিয়া উঠিতে লাগিল। একদিকে যেমন এই atmosphere টা প্রকৃতির খেয়াল (Nature Break) হইতে উৎপন্ন নয় বাস্তবিক ৯মণ তেলই পোড়া হইয়াছিল তা নৈলে রাধা নাচিতনা। তেমন সেই রাত্রের ঘটনাটাও কাকের উপরে কামান দাগা (break a butterfly upon the wheel) বলিয়া ধরা যায় না। তার ভিত্তিকে যেমন রাজদ্রোহিতার মাল মশলা ছিল না, Superstructure এ উৎশৃঙ্খলতা ছিল না প্রকাশ হইয়াছিল কেবল প্রজা শক্তির জীবন্ত শয্যা। অবশেষে মন্ত্রনা করিয়া স্থির করিলেন যে দেওয়ান সাহেব কে গুপ্ত হত্যা করিতে হইবে। আগরতলা রাজবাড়ীতেই এই সকল গুপ্ত মন্ত্রণার সভা বসিত এবং ভদ্রাভদ্র সকলেই মন্ত্রণার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিল। বিশিষ্টের মধ্যে কেবল রাজা, যুবরাজ এবং বধার্হ ব্যক্তি জানিতেন না। সেই দিবস রাত্রিতে দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে মজলিস ছিল। নাচ শেষ হইতে অনেক রাত্রিও হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে আগরতলা নগরবাসীরা হত্যাকারীদের হুংকার নাদে জাগ্রত হইয়া দেখিল, দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে একেবারে বহ্নোৎসব দাঁড়াইয়াছে। ঘাতকেরা বাড়ীর সমস্ত গৃহে যুগপৎ অগ্নিপ্রদান করিয়াছে এবং গৃহচূড়া হইতে অগ্নির শিখা বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছে। দূর হইতে সদ্য নিদ্রোত্থিত বিস্মিত দর্শকেরা দেখিল যে বৃদ্ধ বালিকা সকলে গৃহ হইতে অসম্বৃত বস্ত্রে ইতস্তত দৌড়াইতেছে কিন্তু বাটী বেষ্টন করিয়া দূরে যে মনুষ্যের দুর্ভেদ্য কৃষ্ণপ্রাচীর দাঁড়াইয়া গিয়াছিল তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। তবু যাহার সম্মানে এই অসাধারণ বহ্নোৎসবের ঘটা হইল তাঁহার কোন খোঁজ নাই। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীরাম ঠাকুর বাড়ীর বাহির হইতে যাইতেই ঘাতকের বর্শাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। বাটীর শিশু, বৃদ্ধ যুবা সকলের খোঁজ পাওয়া গেল কিন্তু দেওয়ান সাহেবের কোন সংবাদ নাই। ঘাতকেরা শ্রীরাম ঠাকুরকে বধ করিয়া দেখিল প্রভাতের বিলম্ব নাই তখনই উষার আলোকের সঙ্গে দগ্ধায়মান গৃহবহ্নির পাণ্ডুর প্রভাব বিনিময় চলিয়াছিল। ব্যর্থকাম ঘাতকেরা চারিদিকের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। ত্রিপুরা প্রজাশক্তির এই শেষ চণ্ডাভিনয় ও বেশ দেখা যায় রাষ্ট্রনীতিতে তখনও প্রজাশক্তির প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। তখনও তারা রাজ্যশাসনকে দূর হইতে সেলাম করিতে শিখে নাই। প্রভাতে চতুর্দিকের ধূমায়মান দগ্ধাবশেষ গৃহের এক পার্শ্ব হইতে দেওয়ান সাহেব বাহির হইয়া বিস্মিত দর্শকমণ্ডলীর সহিত আসিয়া উঠিলেন।

তাঁহারা কয়দিন নিত্যই সেই ঘাট ছাড়াইয়া আরও দূরে আমার নৌকার সন্ধানে যাইতেন। বাস্তবিক মোগরা গ্রাম হইতে কুমিল্লার পথে কেহ সচরাচর দশদিন কাটাইয়া এমন sentimental রসোপভোগ করে না। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা হইয়া গেল রাজা রাজড়ার খেয়াল, আমি লজ্জারই সহিত শুনিলাম। পুরাতন সময়কে নূতন করিয়া ফিরাইয়া উপভোগের আনন্দে চক্ষুকে একেবারে শুষ্ক রাখিবার চেষ্টা সফল হয় না। আমাদেরই কি চেষ্টা বিফল হয় নাই. তাঁহারা বয়সে আমার অনেক বড় ছিলেন তবু আন্তরিকতা এবং সাহচর্য ছিল সমান বয়সের মত। তাঁহারা পরলোকে, কিন্তু তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের সৌহার্দ্যের মধ্যে ভাবসাহচর্য্য আমার জীবনব্যাপী ঐহিক জিনিসটাই যাইয়া যাইবে। এবং চণ্ডীপাঠ হইয়া গেল। নদীতীরে যে ব্রাহ্মণ পূজা করিলেন, সেইদিন হইতে তিনিই কাশী চক্রবর্ত্তী আমার পুরোহিত। আজিও তাঁহার বংশধরেরাই আমাদের পৌরোহিত্যে রহিয়া গিয়াছন। এইরূপ দুর্দিনে নৌকায় বাস করিয়া বিপন্নের পরমাশ্রয় চৌধুরী মহম্মদ গাজী সাহেবের বাড়ীতে উঠিলাম। আজিও সেই বাড়ীতে বাস করিতেছি বাড়ীর মাটি জলে, বৃক্ষে বৃক্ষে পুরাতন কালের সুখদুঃখের করুণ মধুর স্মৃতি আণবিক মণ্ডলের মত আমাকে ছাইয়া রহিয়াছে। পরদিন চৌধুরী সাহেব আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন, অত্যন্ত সাদাসিধা পরিচ্ছদ ঢিলা ইজার ও কোর্তা এবং পায়ে দেশীয় চটি। তখনই তাহার কেশ একেবারে শুভ্র হইয়া গিয়াছে কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রচুর মাংস ও রক্তের সংস্থান তাহার দেহে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার হাতে একছড়া জপমালাা সর্বদাই থাকিত, অন্যের কর্তা শুনিতে শুনিতে নিত্যস্মরনীয় নাম করিয়া যাইতেন এবং মালার গুটিকার সংখ্যা একবার শেষ হইলে তাহা চুম্বন করিতেন। তাঁহার সময়েও সর্বস্তরে ছড়ান যৌথ পারিবারিক আদর্শের প্রভাবটা তেমন ভাল করিয়া গুটান হয় নাই বোধ করি। ঘনিষ্ঠতার অনুশীলনে যাইয়া তাঁহারা কুটুম্বিতা পাতাইয়া তাঁহাকে কায়েম করিয়া নিতেন। তাই আমার কুমিল্লায় আসিবার বহুদিন পূর্বে চৌধুরী সাহেব আমার একজন খুল্লতাত নীলকৃষ্ণ দেববর্মার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন আপনার যুগধর্মে, সেই পাতান সম্বন্ধের ধর্মে, নিষ্ঠাবান ছিলেন বলিয়াই। সে সময়কার সামাজিক নূতন আদর্শের বৈশিষ্ট্য প্রাচীনদের চক্ষে প্রথম বড়লাগিত। নব্য সমাজের friends বা বন্ধুর বাহুল্য কেবল তাহাদের বিস্ময় নয়,সকল আতিশয্যের অবাঞ্ছনীয় পরিণাম যেমন হইয়া থাকে বিদ্রূপের প্রবৃত্তি ও জাগাইয়া তুলিত। ইহা যে কালের একতরফা বিচার তাহা ব্যক্ত করিতে তাহারা অত্যন্ত পরিমিত ভাষা ব্যবহার করিতেন না। চৌধুরী সাহেব আপনার জীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা অকাতরেই বিলাইতেন। তাঁহার শিক্ষা দেওয়ার বিশিষ্ট প্রণালীটি কেবলমাত্র আশ্রয় দান করিয়া তিনি নিরুদ্বেগ হইতেন না। আশ্রিতের ভালমন্দের বোঝাটা স্কন্ধে তুলিয়া লইতেন। তাঁহার চরিত্রে অনেক শিক্ষার সামগ্রী, অনেক চরিত্র গঠনের উপাদান ছিল। অত্যন্ত সাদাসিধা নিরলঙ্কার থাকার প্রণালী ছিল তাঁহার। লোক দেখাইবার উদ্যত তাহার ছিল না, কিন্তু কেহ যদি তাহা হইতে কিছু শিক্ষা করে তাহা হইলে তাহার যথেষ্ট সার্থকতা ছিল। তিনি গুনানুরাগী এবং গুণানুসন্ধিৎসু ছিলেন। এত বিভিন্ন সামাজিক ও জাতিয় লোক কাহারও

বাড়ীতে যাতায়াত করিতে আমি দেখি নাই। আমার পরমাত্মীয় প্রাচীন ব্যারিষ্টার মন্ট্রো সাহেব যখন আমার মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য আসিয়াছিলেন তখন চৌধুরী মহম্মদ গাজী সাহেবের সঙ্গে তাহার দুই চারিবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বহুকাল পরেও তিনি গাজী সাহেবের খোঁজ নিতে ভুলিতেন না। কালিয়াজুরীর ঘাটে দুইদিন নৌকা হইতে উঠি নাই। ইতিমধ্যে আনন্দ বিহারী সেন মহাশয় চৌধুরী সাহেবের বাড়ীটি ঠিকঠাক করিতে থাকিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে নৌকা ত্যাগের পূর্বে জননীদেবী ঠাকুরপূজা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর আর পূজক কোথায়? আরও যে বাড়ীতে উঠিতেন সেখানে যজ্ঞ আর চণ্ডীপাঠ চাই। আমরা জানি না যে নৌকা ঘাটেরই নিকটে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদেরই একজন। তিনি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নৌকায় আসিয়া পৌরোহিত্য প্রার্থনা করিলেন। কুমিল্লায় ত্রিপুরা রাজপরিবারের যাহারা বাস করিতেন কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের পুরোহিত। তিনি বাড়ী ফিরিয়া শীলাচক্র আনিয়া পূজায় বসিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে তিনি আমার পুরোহিত। পরদিন চৌধুরীর সাহেবের বাড়ীটিতে ওঠা গেল। চৌধুরী মহম্মদগাজীর সহিত পরিচয় হইলে পরে কুমিল্লার আরও অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। এখানে, তাঁহাদের নাম শুনিবার যে পাঠকের কতখানি আগ্রহ তাহাতে আমার অত্যন্ত সন্দেহ থাকলেও একটির নাম উল্লেখ করিব, হরিমোহন গুহ তিনি কুমিল্লার উচ্চ আদালতের উকিল। মানুষের জীবনের দেয় ও প্রাপ্যের হিসাবটা জীবন হইতে জীবনান্তরে জের নিয়া চলে, কে না একদিন তার নিকাশ হইয়া যাওয়া চাই। আর একটা কারণ বিধাতাপুরুষের সময় economise এব দিকে অতি মাত্রায় ঝোঁকে মানুষের আয়ুটা কিঞ্চিৎ কাঁচা হিসেবে কষা। শত্রুমিত্র দুইয়ের মধ্যে আসিয়া বহুবার সংসার করিয়া যাইতে হয় সেই বন্দোবস্তই। আমার উপকৃতির খাতক হরিমোহন গুহ বহুজনের সুহৃৎ। অপ্রসস্থ জীবনের পরিসরের মধ্যে দায় চাপিবার জন্য সময়ের কুলন হয় না বলে অন্য বারের ন্যায় এবারেও আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল যা হৌক তাঁর কথা পরেও বলিবার সময় পাইব। যেমন দেশীয় তেমনি বিদেশীয় স্থানীয় রাজকর্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা হইতে ধরিয়া অনেকের পরিচয় লাভ করিলাম। খুল্লতাত এবং প্রপিতামহী মহারানী দিগের দর্শন পাইলাম। এই প্রকারে তিনমাস কাটিয়া গেল। আত্মীয়দিগের মত ছিল আপনার ভবিষ্যতের উপায় করিয়া নিতে আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। কিন্তু টাকা কই। বিক্রেতার নির্বন্ধে যে দর পাওয়া যায় জননী দেবীর কয়খানি অলংকার সেই দরে বিক্রয় করা গেল। তিনি টাকাগুলি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন তাঁহার ভাবনা আমাকে ভাবিতে হইবে না। তিনি অবস্থা বুঝিয়া বাড়ী চালাইয়া নিবেন। পিতৃদেবের নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিবার আদেশ দিলেন। খুল্লতাত নীল কৃষ্ণদেববর্ম্মা বাহাদুর পিতৃদেবের স্বর্গারোহনের পরে রাজ্যের দায়াদ দাঁড়াইয়াছিলেন। জিলা আদালতে তাঁহার অনুকূলে নিষ্পত্তি ও হইয়াছিল। পরিশেষে, মহামান্য আদালতের (হাইকোর্ট এবং প্রিভিকৌন্সিলের) বিচারকেরা জিলার নিষ্পত্তি রহিত করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যকে ডিক্রি দিয়াছিলেন। তদবধি নীলকৃষ্ণদেববর্মা বাহাদুর কুমিল্লায় বাস করিতে ছিলেন। আমার কলিকাতা যাইবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কলিকাতার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আর যাই হৌক কলিকাতায় আমার একটা ভ্রমাপনোদন

অবশ্যম্ভাবী যে ত্রিপুরার রাজারও বড় আছে। তাঁহার কলিকাতার স্বকীয় অভিজ্ঞতা ছিল। আমার তেমন গর্বানুভূতি ছিল না, কিন্তু কথাটার মধ্যে কৌতুক ছিল। জননীর পদ বন্দনা করিয়া নৌকায় উঠিলাম। স্থির হইয়াছিল পথে বিক্রমপুর সোনাবন্ধ আনন্দবিহারী সেন বাড়ীতে ছিলেন। তাহার নিকটাতিশয়, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গ্রামের পথে সাক্ষাৎ হইবে এবং তিনি সেখানে আমার সঙ্গে একত্র হইয়া চাকলা পর্যন্ত আমার সঙ্গী হইবেন। কুমিল্লার ঘাটে নৌকায় উঠিতে যাইয়া শুনিলাম, **লুসাই অভিযান** রসদ জোগাইবার জন্য কাহারও কাহারও নৌকা লইয়া গিয়াছেন। জিলার ম্যাজিস্ট্রেট কার্টলে সাহেবের নিকট গেলাম। তিনি দয়া করিয়া ছাড়পত্র দিয়া কৌতুকের সহিত বলিলেন বেদরকারী কাগজের ঝুড়ি সঙ্গে করিও। কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া নৌকায় গেলাম। কিন্তু যেমন শোনা গেছিল, অপরিহার্য্য সরকারি প্রয়োজনে পথের মধ্যে বেসরকারি নৌকাখানা যদি সরকারী লোকের পাদস্পর্শে রামায়ণের কাঠের নৌকা সোনার নৌকায় রূপান্তরিত হইয়া যাওয়ার মত অবস্থা হইত তাহা হইলে সেই খেয়ানৌকার দিশাহারা মাঝির অবস্থা হইতে আমার অবস্থা নিশ্চয়ই অধিকতর সান্ত্বনাপ্রদ দাঁড়াইত না। তবুও তো পরিহার পত্রটি হাতে ছিল, তাই কম্পিত অবস্থায় ভাবনাটা অত্যন্ত আমোদপ্রদ দাঁড়াইয়াছিল। প্রায় নির্দিষ্ট সময়ে আনন্দ বিহারী সেন মহাশয়ের গ্রামের খালের মুখে (মিরকাদিম) পৌছা গেল। সময় নিষ্ঠায় তাঁহার সঙ্গে হারিতে হইয়াছিল, তিনি ঠিক সময়ে সেখানে পৌছাইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অসজ্জিত রিক্ত প্রতীক্ষা নয়। তিনি একখানে 'ছান্দি' নৌকায় ছিলেন। ছান্দির বুৎপত্তি আমার জানা নাই। ইহার লক্ষ্মণ দেখা গেল কেবল তোলাপাড়া করা। খালের স্থির জলের উপরেও ইহার গড়াগড়ির বিরাম নাই। কিন্তু ইহাই উত্তাল তরঙ্গ ময়ী 'কীর্ত্তিনাশা' পদ্মার খেয়াল পরিপাক করিয়া ছান্দি আপনার নৌকা জীবনের মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত অকৃত্রিম সহজ এমন মনের আনন্দে কোন নৌকাই দোল খেলে না।

আর একটা তত্ত্ব বোধ হয় পাকস্থলীর সংস্কার কয়েকদিন ছান্দি নৌকায় চড়া অভ্যাস হইয়া গেলে বোধ হয় সমুদ্র যাত্রায় sea sailing খ্যাতিটা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে। মোট কথা ছান্দি নৌকার নিন্দা বলে আনন্দ বিহারী সেন মহাশয়ের ছান্দি নৌকার অগ্রে ও পশ্চাতে কতগুলি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল। তাহা মধ্যে কোড়াল নামক স্বনাম ধন্য মৎস আর ক্ষীরময় ছানা চিপিটক নারিকেলাদি উপাদানে পরিবিষ্ট বিবিধ মিষ্টান্নের সম্ভার, মিয়ানো কোনটাই নয়, হাড়ির উপরে ময়দায় সরা আঁটিয়া airtight করা দন্ত রুচিকর খাদ্য আমার জন্য উপহার তাই বলিতেছিলাম " অসজ্জিত রিক্তপ্রতীক্ষা নয়"— আসিয়াছিল। নৌকার মাঝিরা গণনার মধ্যে পড়িয়াও আমরা সাকুল্যে ১০ জন। খাদ্য উপস্থিত হইল প্রায় শত লোকের । অবশ্য এই প্রকৃতির ভাগের বোঝা বহিবার উপরি লোকসংগ্রহে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল না। আমরা মীরকাদিমের খালের মুখে একদিন এবং একরাত্রি বাস করিয়া সেন মহাশয়ের আতিথ্যে কৃতার্থ হইয়া — তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া ঢাকা নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঢাকা পৌছাইতে বেলা শেষ হইয়াছিল। পরদিন রাজ্যভ্রষ্ট মণিপুর রাজের (রাজ্যছাড়িয়া পরে তিনি অবশিষ্ট জীবন ঢাকা নগরীতেই বাস করিয়া গিয়াছেন) আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া গেল। নবাব আবদুল গণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তাঁহার পুত্র নবাব আসানউল্লার (তখনও তাঁহারা

নবাব উপাধি লাভ করেন নাই কিন্তু ঢাকা নগরীর শীর্ষস্থানীয় তখনও তাঁহারাই) অকুণ্ঠিত সৌজন্য তাঁহাদের । নবাব আবদুল গণি কৃতিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি সৌভাগ্যের সাধনার যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার কৃতিমান পুত্র নবাব সাহেব আসানউল্লা সম্পূর্ণ সেই উপাদানে আত্মগঠন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মনস্বী নবাব আবদুল গণি বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনদিকেই অপব্যয় ছিল না মনস্বীতার দিক হইতে ভাগ্যের দিক পর্যন্ত। আনন্দবিহারী সেন মহাশয় আমায় বলিতেন এইখানে 'অভিজ্ঞতার হাতে শিক্ষার জীবিত আদর্শ''। মা লক্ষ্মীর 'বঞ্চনা' খ্যাতি আছে দেশ বিদেশ জুড়িয়া। এই রূপক বাক্য হইতে বেগানা লোকেরা কোন শিক্ষা পাউক বা না পাউক, মায়ের আপনার লোকেরাও বেরোয়াই থাকিয়া যায়। ইহার আর একটা চিত্র পাওয়া যায় লক্ষ্মীর সত্য সেবিকাদের নিকট। সে অতীত মৌন কথা সকল সন্তাপহারী অমৃতময় অঙ্কের আশ্রয় বিশ্বাসী হৃদয়ের বার্তা দেবীর যথার্থ অর্চ্চয়িতার মুখে শোনা গিয়াছে। উপাসক সন্তানের অনাদর, অবজ্ঞা, নির্যাতনে অতীষ্ঠ হইয়া দেবী যখন চলিয়া যান তখন তিনি গর্বান্ধ সন্তানের নিষ্ঠুরতায় নির্বাসিতা মাতার ন্যায় অশ্রুজলে বিদায় নেন।

ঢাকায় আনন্দবিহারী সেন মহাশয়ের বন্ধু ঢাকার স্কুল ইনসপেক্টার বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয় আমার জন্য কুণ্ঠাশূন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ঢাকায় তখন দেশীয় কর্মচারীর মধ্যে তিনি এবং কমিশনারের পারসনেল এসিসটেন্ট অভয়চরণ দাস মহাশয় অতিশয় কৌলিক ব্যক্তি। বৈকুণ্ঠবাবুর দ্বারাই আমি ঢাকা সমাজের পরিচয় লাভ করি। ত্রিপুরার রাজসরকারি কর্মচ্যুত বিশ্বনাথ গুপ্ত পেশকার মহাশয় তাঁহার নিবাসও ত্রিপুরা জেলায়, ঢাকায় যাইয়া আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত রাজনীতিক চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী ১৮৭১ সালের ঢাকা। বৈকুণ্ঠবাবু আমার জন্য বাংলা বাজারে বড় রাস্তার ধারে একটি মাঝারী দোতলা বাড়ী দুই সপ্তহের জন্য পাঁচটাকায় ভাড়ায় ঠিক করিয়াদিলেন। সুলভের দিন ছিল তখন। কিন্তু ঢাকা যে পূর্ব বাংলার প্রধান নগর ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্তে তাহা বুঝিতে দিত না। রাজপথের আবর্জনার স্তূপ, পয়ঃনালী অসংস্কৃত, রাস্তার বাতির অস্তিত্ব বোঝা যায় দোকানের প্রদীপ নিভিয়া গেলে— এই সকল নগরবাসীরা অবশ্যই সহ্য করিয়া ফেলিয়াছিল; কর্তৃপুরুষদিগের সহনশীলতাও সীমার বহিরে যায় নাই। 'টাট্টি' বা ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল। আমরা তখন যে বাড়ীতে ছিলাম সে বাড়ীতে ছিল লোপাপন্ন ২টি পুরাতন কুয়া, তাহাই রূপান্তরিত বাড়ীর অন্দর বাহির বাড়ীর ২টি ল্যাট্রিনে। তখনও বাড়ীর পুরাতন কূপ টাট্টিতে রূপান্তরিত হওয়াটি বে-রেওয়াজ দাঁড়ায় নাই। সন্ধ্যা সময় ছাদে উঠিলে দেখা যাইত চতুষ্পার্শ্বের বাড়ী হইতেই একটা ক্ষীণ বাষ্পরেখা উর্দ্ধে উঠিতেছে। নগরের কেবল একটি অংশে এই অনুপাদেয়তা অস্বাচ্ছন্দ্য অস্বাস্থোচিতরতা ক্ষতিপূরণ হইত। সে ছিল নদীর তীর। তখনকার নগরের শোভাসম্পদ এই স্থানটির অনন্যসাধারণ সম্পত্তি ছিল। কমিশনার বকল্যাণ্ড সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে নদীতীরের প্রকৃত নগরের সীমা ব্যাপিয়া পোস্তা বান্ধাই হইয়া তাহার নামকরন হইয়াছিল বকল্যাণ্ড বাঁধ। এই স্থানে মিলিটারী ব্যাণ্ড বাদন হইত। আমরা দেখিতাম প্রতিদিন নদীসমীরণ সেবনার্থী সান্ধ্যভ্রমণ কারীর দল ঐ স্থানটিকে উৎসবের

সজ্জায় সাজাইয়া তুলিত। বহু হর্ম্ম্যবিম্ব মালিনী সোপান স্তর শোভিতা গোধূলির অম্লান লোহিত তরঙ্গ মণ্ডিতা সকল সধবার জননী স্বরূপা নদীর দৃশ্যে কতখানি মহিমা! এইক্ষণ এই নদীতীরটার শোভাসৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, রমনায় নব ঢাকা নগরীর জন্য। নূতন নগরী প্রকৃতই দর্শনীয়তা উপাদেয়তায় উচ্চস্থান পাইয়াছে। এইক্ষণ গভর্নমেন্টের এবং ঢাকার নবাব সাহেবের বহুল অর্থব্যয়ে ঢাকা নগরী, পূর্ববাংলা রাজধানী কেবল পুরাতন ক্ষীণায়মান স্মৃতি নয়, বর্তমানে জাজ্জ্বল্যমান বিহ্বলকারী বাস্তবিকতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনাদর উপেক্ষা নির্মমতার ও দৃশ্য তেমনি পরিস্ফুট সেই পুরাতন নদী তীরটিতে।

বাংলাবাজার বাসায় এক সপ্তাহ বাস করিয়া, বাসা ছাড়িয়া একটা গ্রীনবোটে কিছুদিন ছিলাম। নৌকায় গোয়ালন্দ যাইয়া কলিকাতার ট্রেন ধরিলাম। আনন্দবিহারী সেন মহাশয় পূজার অবকাশ আমার সঙ্গে অতিবাহিত করিয়া গোওয়ালন্দ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কলকাতায় আমার পূর্ব পরিচিত একটি ভদ্রলোক বাসা ঠিক করিলেন ভবানীপুরে। ভবানীপুরে পূর্ববাংলার অনেক বিষয়ীলোকের বাস ছিল। আমি কলিকাতা টাউনের দিকে অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম। ভবানীপুর তখন ম্যালেরিয়ার বিষ বর্জিত স্থান ছিল না। হাতে হাতে তার ফলও ভুগিয়াছি। আড়াই বৎসর ভবানীপুরে বাস করিয়া প্রচুর পরিমাণ ম্যালেরিয়ার বিষ দেহস্থ করিয়াছিলাম। ভবানীপুরে বাস করিবার সময়ে বহুলোকের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। বাসায় প্রবেশ করিয়াই কামিনী কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁর বাড়ী ঢাকা জেলায়। তিনি আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, ভবানীপুর সুবার্বন স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন এবং কুমিল্লা স্কুলে কৈলাসচন্দ্র সিংহের সহাধ্যায়ী ছিলেন। নবকিশোর বসুকে অভিভাবকের ন্যায় ভক্তি করিতেন। প্রতিদিন দুই বেলা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতাম এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়েরও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই হৃদয়ের প্রশস্ততার গভীরতা কমায় না অথবা গভীরতায় প্রশস্ততা হ্রাস পায় না। মানুষটার একটা বিশেষত্ব আছে, তাহা তাহার ভিতরকার মানুষ। এ সম্পদ ভিতরের মানুষটিরই। বাহির হইতে inhibition পায় না বলিয়া ভিতরের শাসনটিও অব্যাহত রূপে বাহিরের কাজগুলি চালাইয়া নেয়। Inhibition আর impulsion এর দ্বন্দ্ব বর্তমানে resultant আইসে। কিন্তু এইস্থলে সমবায় জনিত ফল নয়। সোজা ফল। এটাই বিশেষত্ব। তবু এই ভিতরের সম্পদের উপরে বাহিরের সমাজের প্রজাটির কোন অংশ নাই। সুতরাং সমাজে তাহার অভ্যাগতির আদরও বাড়িবার নয়। ক্রমে আমার পরিচিতের পরিধি বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। কলিকাতার বড়লোকদের সংখ্যার একটি আভাস পাইলাম, বড়লাটের লেডির দিনে (রাত্রি)। হাইকোর্টের উকিল জন রবকোর্ট সাহেবের দ্বারা কলিকাতার গণ্যমান্য বিশেষত গভর্নমেন্ট সেক্রেটারী দিগের সহিত পরিচিত হইলাম। রবকোর্ট দম্পতি ইউরোপীয় সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। আমি যখনই তাঁহাদের ইলিসিয়াম রোর বাড়ীতে গিয়াছি তখনই দেখিতে পাইতাম তাঁহাদের Hall-tabel এ Cards এর গদ্দা পড়িয়া আছে। দুঃস্থ বিপন্ন পরিবারের সহায়তাও তাঁহাদের অল্প ছিল না। আজ লাহোড়ের হৃতসর্ব্বস্ব জায়গরীদার উজির, কাল মিসেস মাইকেল এম দত্ত আমাদের কবি পত্নী, পরও ইহুদি সম্প্রদায়ের কেহ, নিজসম্প্রদায়ের কথা অনেকটা অপ্রকাশ্য থাকিত বোধ

করি। এই রূপে রবকোর্ট দম্পতি ছিলেন নানা সমাজের আশ্রয়, অভাব-পীড়িতের স্বস্তি শান্তি দাতা। রবকোর্টের লাইব্রেরীতে আমার একটা আকর্ষণী ছিল। আমি অনুভব করিতেছিলাম, কর্মসূত্রের আকর্ষণে যে ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি সেখানকার উপযোগিতা ধরিতে উদাসীন থাকিলে অস্তিত্বই রক্ষা করিতে পারিব না। রবকোর্টের সঙ্গে বৈষয়িক পরামর্শ শেষ হইলেও তাঁহার নিকটে অনেক সময় বসিতে হইত। কোন দিন বই খুলিতেন, অন্য দিন বা প্রসঙ্গের পরে প্রসঙ্গ তুলিতেন। যাহাতে দুর্ভাবনা নিয়ে বাসায় না ফিরিয়া আসি, যাহা হইলে বুঝিতে পারেন, তাঁহার কথার পথ ঘাট আমার মধ্যে সুগম হইয়া হর্ষামর্ষ দুইই শোধিত বিনীত অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা হইলে Consultation শেষ করিতেন। আমার জন্য তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরী উন্মুক্ত রহিল। তিনি বলিতেন কেবল মোকদ্দমার কাগজ পড়িয়া আমি অবসন্ন হইয়া গিয়াছি। এই অবস্থায় তাঁহার prescription হইল, অবাধ সাহিত্য চর্চ্চা। শ্রান্তি নিবারক পুনরোত্তেজক পুস্তক ভিন্ন আর কিছুই হইতেই পারে না। আমি তাঁহার কথা ধরিলাম। বলা বাহুল্য তাহাতে আমার যথেষ্ট লাভ হইয়া ছিল। কিছুর উপরে অনাবশ্যক বোঝার চাপ দেওয়া হবে তা নয়। কিছুকাল এভাবে কাটিলে দেখিলাম বই পড়াটা আমাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। বই ছাড়া আমি থাকিতে পারিতাম না । পড়িলাম তাহার বিচার চাই না, পড়াই চাই। রুচি গড়িতে এইরূপে মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। কিন্তু যদিও এই বই পড়ার মধ্যে থাকায় আমার মনের প্রসারতা বাড়িয়াছিল, আমার বিষণ্ণতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি ছাড়া কমতির দিকে ছিল না। তিনি একদিন দীর্ঘ সময় ধরিয়া আপনার ইতিহাস শুনাইলেন। তাঁহারপিতারা দুই সহোদর ছিলেন। পৃথক বাস করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত সম্পদশালী। পিতা নিঃস্ব নিরুপায় ব্যক্তি। অবস্থার বৈষম্যে নাকি ভাই ভাই এর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বাড়িয়া যাওয়া অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। পিতা যেমন নিস্বঃতার দৌর্বল্যে সম্বন্ধের উপর ভর রাখিয়া নাইবার ভ্রম করেন। জ্যেষ্ঠতাত তেমনি সম্পদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরিয়া যাওয়ার আছিলায় ভ্রমাপনোদনের চেষ্টা করেন। একদিন পরস্পরে পরিষ্কার পরিচয় হইয়া গেল। সেদিন একজন বড় কারবারী লোক জ্যেষ্ঠতাতের বাড়ীতে আসিবেন। ডিমেডিবারী পিতা জ্যেষ্ঠ তাতকে ধরিয়া পড়িলেন, অভ্যাগত বড় লোকের নিকটে সুপারিশ করিলে তাঁহার একটা উপায় হইয়া যায়। জ্যেষ্ঠতাত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বড়লোক আসিলেন, খাওয়া দাওয়া খেলাধূলা কথাবার্তায় বিস্তর সময় কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। সামাজিক মর্যাদায় তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবার অবস্থা পিতার ছিল না। কিন্তু পাছে জ্যেষ্ঠতাত ভুলিয়া ফেলেন সেইজন্য পরিমিত দূর হইতে পিতা মাঝে মাঝে জ্যেষ্ঠতাতের দর্শনীয় হইতে থাকিলেন। বড়লোক চলিয়া গেলে উদ্বিগ্ন পিতা জ্যেষ্ঠতাতের নিকট জানিতে গিয়া শুনিলেন যে বান্ধব সমাগমের মুখে তিনি এমনই তলাইয়া গিয়াছিলেন যে অন্য কথা ভাবিবার অবসর তাঁহার ছিল না। পিতা ধর্মপ্রচার কার্য কোনরূপে জুটাইয়া ইংলণ্ড হইতে বহির্গত হইলেন। কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার পাইলেন, অবস্থার উন্নতি হইল, বিবাহ করিলেন এবং সেই পরিণয়ে জন ও মার্ক রবকোর্ট জন্মিলেন। জন যখন কলিকাতায় আইন অধ্যয়ন করেন এবং মার্ক ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতে গেলেন তখন ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, জ্যেষ্ঠতাত ইহলোক ত্যাগ

করিয়াছেন। কোন Lawyer এর firm হইতে পিতা পত্র পাইলেন যে জ্যেষ্ঠতাত তাঁহার ইচ্ছাপত্রে অন্যান্য legacy বিলি করিয়া জন রব কোর্ট তাঁহার সম্পত্তির residuary legatee এবং executer করিয়া গিয়াছেন। Jointure নাই, জ্যেষ্ঠতাত অকৃতদার ছিলেন। পিতার সহিত জনের সাক্ষাৎ হইল। Lawyer firm এ উত্তর গেল যে জন জ্যেষ্ঠতাতের দান গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা তখন Strand Road এর Peels statute ছাড়াইয়া পানি ঘাটের বরাবর আসিয়া পড়িয়াছি। ***সেদিন আমাকে ভবানীপুরে বাসার সম্মুখে নামাইয়া দেওয়া পর্যন্ত আর কোন কথা হইল না। অবস্থাও বাক্যের অতীতই। এমন ব্যাপার আসিয়া পড়ে যখন অনুভূতি অভিগ্রস্ত মানুষ অনন্যবর্ত্তী রহিয়া যায়— একজন মানুষের দীর্ঘজীবনের মধ্যে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে একটা অচল প্রতিভার জাগরণ বিষয়ে থাকিয়া বিষয়ের আন্তরিক উপেক্ষা—সফলতার সম্মান সার্থকতা সেখানে ছাড়া আর কোথায়?

জন রবকোর্ট আমার জন্য একখানি আবেদন প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা ইং ১৮৭২ সালের ২৫ শে জানুয়ারি বেঙ্গল গভর্নমেন্টে দাখিল হইল। সে সময়ের অনেক পরে বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং প্রস্তুত হইয়াছে। তখন সেক্রেটারী দিগের অফিস ছিল এখানে সেখানে ভাড়া করা residential বাড়ীতে। আমার সঙ্গে একজন Levery পরিচ্ছদ পরা চাকর নিয়াছিলাম। জন রবকোর্ট ও আমি অতি নিবিষ্ট মনে আলাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছি। Levery man পদচারণাকারীদের জন্য সাধারণ উপদেশটি ভুলিয়া গিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। হঠাৎ একটা গুরু বস্তুর পতন শব্দ শুনিয়া আমরা চাহিয়া দেখিলাম Levery man চৌকাঠে ঠোক্কর লাগিয়া একেবারে 'শয়নে পদ্মনাভ'। লোকটি প্রথমত যথাসাধ্য সত্বরতা প্রয়োগ করিয়া চক্রবালের যদিও সমান্তরাল অঙ্গন্যাস হইতে ঊর্দ্ধোধোভাবে লম্বমান হইয়া, দ্বিতীয়তঃ অপ্রয়োজনে উচ্চীকৃত চৌকাঠের ব্যবস্থার মধ্যে ন্যূনাদিক উনিশ গণ্ডা দায়িত্ব নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে আমাদিগের অস্বস্তি ব্যাপদেশে দন্ত বিকাশ পূর্বক শরীরের আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ঘন ঘন হস্তাসঞ্চালন করিয়া বলিল ' কিছু না'। তাহার আশ্বাস বাণীর জন্য আমাদের নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল না আর কি। আমি রবকোর্টের কর্ণসংলগ্ন হইয়া বলিলাম" অনুষ্ঠিত কার্যের পরিণতির পূর্বাভাস নাকি?" তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন —" বেজায় কুসংস্কার"। ২ সপ্তাহের মধ্যে (১৮৭২, ৭ই ফেব্রুয়ারী) আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া গভর্নমেন্টের Resolution বাহির হইল।

রবকোর্ট সিভিল কোর্টে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেন। বিস্তর টাকার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের অন্যত্র যে দুঃসাধ্য কার্য হাতে লইতে উৎসাহ পাওয়া যায় না। কলিকাতায় তাহা যায়। রবকোর্ট কৃতসংকল্প হইলেন।

সেবার ফাল্গুনের শেষভাগে সূর্যগ্রহণ। পূর্ববাংলার তীর্থযাত্রীগণ কালিঘাটে এবং ভবানীপুরের বাসা লইয়াছে। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই উল্লুধ্বনি আরম্ভ হইল। আমার শয়নঘর রাস্তার উপরে, আমার নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, moralising চলিল। সে রাত্রি কলিকাতা অসময়ে জাগিয়া উঠিতে ছিল প্রথমে বোঁচকা ক্রমে দুই দিক হইতে দশ বিশ শত শত লোকের পদশব্দ। আশ্বস্ত ভিক্ষুক গাহিয়া গেল "এবার বড় যুগ আইল।" স্নানার্থীনি কুলবধূদিগের

পদাভরণের শব্দের সহিত মিলিত অনবকাশ সহস্র এক বিষয়ক ঘর সংসারের সংবাদ, মধ্যে মধ্যে বাউলের একতারায় ঝঙ্কার, কচিৎ শঙ্খে ফুৎকার ঊষার শান্ত আকাশ মুখরিত করিয়া বৈচিত্র্যময় শব্দ প্রবাহ গঙ্গাতীরের দিকে সরিয়া যাইতেও সরিয়া গেল না কেবল — সোনাদান, চাঁদিদান, তাঁরাকে পয়সা দান, আর " ছত্তিশ পয়সা দেনা দে রাম।" তাঁহারা গঙ্গাকে রেহাই দিয়া, রাস্তার দুইটা মোড়ের মধ্যে যে কয়ঘর নিরীহ গৃহস্থ নিদ্রার আলিঙ্গন উপভোগ করিতে ছিল তাহাদেরই উপরে এই টানাপোড়েন প্রতিযোগিতার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। প্রভাতের পূর্বেই! সকাল বেলা, আমরা বাসার দরজায় তালা দিয়া সকলে মিলিয়া কালিঘাট চলিলাম। স্থানীয় অভিজ্ঞতা আমাদের কাহারও ছিল না। আমি পালকি চড়িয়া গিয়াছিলাম। গঙ্গা স্নানার্থী ধনবান না হইলে পালকি চড়িতে যাইবে কেন? বরের সঙ্গে শোভাযাত্রীর মত আমার পালকির দক্ষিণে বামে ভিক্ষুকের শ্রেণী চলিল। পথের উভয় পার্শ্বে শরোপবিষ্ট, ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধপদ সাধুর দল বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের সঙ্গে অর্জন প্রতিযোগিতায় মাতিয়া গেছে। গমনশীলেরা তাহাদের সম্মুখে ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইলেই প্রত্যেকে মনে করে যে তাহাদের শারীরিক ব্যায়াম হইতে বাচনিক ব্যায়াম আরও চমৎকার। জীবিকা অর্জনটা এমনই জিনিস আর ঠাকুরদেবতা ও কূল কিনারা নাই। সারা রাস্তা জুড়িয়া মক্ষিকা প্রত্যাশী লতাতন্তুর জাল। তাহাতে আটকায় শহরে কেবল মফস্বলের মাছি। রুগ্‌ন সমাজের সান্নিপাত বিকার। বৈদ্য কোথায়, কার কাছে যাব, মকরধ্বজ আনিতে। জনতা বাড়ীতে থাকিল। পালকি চড়া আর খাটে না। পদব্রজে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলাম, সঙ্গে কামিণী মুখুয্যে এবং কৈলাস সিংহ। গ্রহরাজ ক্রমে ঢাকা পড়িতে থাকিলেন। শুভ্রজ্যোতি পীতাভ লোহিতে পরিণত হইয়া গেল। কীর্ত্তনের গীতবাদ্যরোল, হরিধ্বনি, উলুধ্বনি দিগদিগন্তে প্রসারিতা প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। সমবেত বহুশত হিন্দু নরনারী বিশ্বাসী বন্ধক অভেদে ক্ষণকালের জন্য যেন বিদ্যুন্ময়কৃত। আমার দর্শনে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ অভিনব। স্তম্ভিত রোমাঞ্চিত হইলাম। আমরাই অধীর হইয়া পরের কথা কাড়িয়া বলিয়া বেড়াইতেছি— হিন্দুর একতা নাই, গৌরব বর্দ্ধন প্রাণত্তা নাই। কিন্তু এ যে না থাকিয়াও আছে. এই থাকা যে 'রাজগুহ্যতত্ত্ব' অমানব রাজ্যে অনধিগম্য, লোকের সকল অধিকার খাটাইবার বাহিরে। মানুষ এতদিন কাটিয়া ছাঁটিয়া নষ্ট করিল। এখনও ধ্বংসের কার্যে টিটকারী আর পাগলামী হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, কান্ড দেখিয়া হতাশ ধিকৃত হইতেছি, তাতে যে মাটির উপর করা ফেঁকড়িই মুড়িয়া যাইতেছে। মাটির নীচেকার মূল ত স্বভাব বিধিতে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। এই দৈন্য নৈরাশ্যের দুর্দিনে কে এই কান জুড়ান আশ্বাস সান্ত্বনার সম্পদ প্রেরণ করিল!

গঙ্গা স্নান সারিয়া কালিমাতার মন্দিরে গেলাম। মাতার শ্রীপদ ভরা সিন্দুর, তাহাই পাণ্ডারা বিল্বদলের সহিত আঙ্গুলে টানিয়া যাত্রীদের দেয়। আঙ্গুল টানায় দেবীর ললাটে *** পড়িয়া গিয়াছে। বাসারদিকে ফিরিয়া আসিতে পথে মুক্তি হইয়াছে। সাগরে শিশির প্রক্ষেপের ন্যায় এখানে কয়েন ** পায়াস বিতরণের প্রয়াসটা করুণারই চিত্রকলা দিক, তাহার উপরে পালকি আরোহী কৃপণ কঞ্জুস ধনবানের প্রাপ্য টিটকারীরও জন্য যথেষ্ট অবকাশ ত আছেই।

ইহার দিন কয়েক পরে Siam নরপতিকলিকাতায় আগমন করিলেন। লর্ড মেয়ো অভ্যাগত রাজ অতিথির কি প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিবেন তাহা দেখিবার কৌতূহল ছিল। রবকোর্টকে ধরিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে গভর্নমেন্ট হৌসে গেলাম। magnificiant Mayo তাঁহার স্বকীয়তায় কলিকাতাকে ব্যাঙ্ককের উর্দ্ধেস্থান দান করিবার প্রয়াসে অত্যাকর্শিত প্রয়াসের তন্ত্রীবায়ুপর্যেও ঝঙ্কার ছাড়ে। আয়োজনটা সেই প্রকারেরই ছিল। এই প্রকার দুই চারিটি ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে আমার কুমিল্লা হইতে কলিকাতা যাত্রার দিনে খুল্লতাত নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িত।

রবকোর্ট বলিয়াছিলেন আমার বিষয়ে তাঁহার যত্নের শিথিলতা হইবে না, কিন্তু আমার আরও নানা দিকে চোখ চালনা চাই। মহানগরীতে তাহার উপায়ের অভাব হইবে না কেবল অবলম্বন করিতে বিচার চাই এই মাত্র। এই ব্যাপারে আমার সহিত কলিকাতা এবং নগরের উপকণ্ঠ বাসী বহুলোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। জিজ্ঞাসু কুতুহলির ভাগ তার মধ্যে বড়। আবার এক শ্রেণীর সূক্ষ্ম রুচিবত্তা আমারই কৌতূহল জন্মাইত। ' নেশা যেমন "পাইয়া বসে", সমৃদ্ধি প্রদর্শনের অতিপ্রয়াস তাহাদের অভিমন্ত্রিত রাখিত। কিন্তু এই ব্যাপারে বেশি সময় খাটান যায় না। সুতরাং পরিচয় ভুলিতেও সময়ের খাটুনি নাই। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে কোন একটা বেয়াদপির দায় এড়াইবার উপায় হইল পরিচয় নিয়া যাওয়া। কথিত ব্যাপারেও আদরের ভিত হইল পরিচয়ের অতি অস্থায়িত্ব। তবে সুখের বিষয় এই তাহার জন্য পয়সার প্রয়োজন হয় না। এক কথা এই, কারু নোট রাখার বাতিক অসাধারণ ধরনের থাকে। তা যেন রহিলই তবুও পাঠক আছেন সাধারণ লোক আছেন— সে দিন ক্ষৌর কার্যের জন্য গরমজলের ডায়েরীতে ভরতি করিবার দুর্বুদ্ধিতে ভরতি কারক, রাগাওয়ালাসে কতই না— রামচন্দ্র! তদ্ভিন্ন আর একটা বিবেচনা রহিয়াছে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যয়— তদ্ভিন্ন তৎসদৃশ সারবান। খিদিরপুরের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার আত্মীয় চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথমে পরিচয় পরে যথেষ্ট বন্ধুত্ব হইয়া ছিল। পুর্ব্বে বলিয়া গিয়াছি কৈলাসচন্দ্র সিংহ আমার সাহচর্য্য পাইবার জন্য পৈত্রিক বিষয় প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। তিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন। তাদের সঙ্গে যে সময় আমি কলিকাতায় (সেখান কামিনী কুমার মুখোপাধ্যায় আমার সহায় হইয়াছিলেন) অনুষ্ঠেয় কার্যে ব্যাপৃত রহিলাম, কৈলাস চন্দ্র সিংহ সেই সময় স্থানান্তরে তাহা করিতে থাকিলেন। এক দিবস রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সচরাচরের বহির্ভূত ঘটা। বাহিরেই চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম একজন বড় জমিদার আমার Case টা গ্রহণ করিবার পূর্বে আলোচনা করিতে চাহেন। তিনি মফস্বলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে কলিকাতা বেড়াইতে আইসেন। যুবক সুন্দর কান্তি, জড়ির পরিচ্ছদে শরীরে একেবারে গৌরবের দৃশ্য, আলাপের রীতি " গৌড়ীয়া"। রাজকৃষ্ণ আমার কানে পড়িয়া বলিলেন only mufassil edition"। যাই হউক তিনি হাইকোর্টের অধিকাংশ কৌসুলীদের পরিচিত। প্রথম case টার বুনিয়াদ আমার নিকটে শুনিলেন। তাহাতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। তারপের কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেলে বিদায় নিলেন, কাগজের গড়া সঙ্গে নিতে চাইলেন, চন্দ্র চাট্যুজ্যের পরিচিত লোক, তাই তাহা দেওয়া গেল। দ্বিতীয় সাক্ষাতে তিনি একবারে Case টার ফুরানের কথা তুলিলেন। রাজকৃষ্ণ

আমার গা টিপিতে থাকিলেন। কামিনীকুমার বৃথাই Champenty প্রভৃতি বিধি বিগর্হিত আলোচনা করিলেন। জমিদার পাদপীঠ হইতে টলিবেন না, কৌসুলীর হস্তে যাহারা দিবারাত্রি বদল করে, মতই আর কি, সূর্যকে হুকুম করা " তুমি স্থির হয়ে থাক ডুবিয়া পড়। আর পরিমিত কথায় বলিতে গেলেও মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছেন অর্দ্ধডজন তেমন তেমন অনেক ধনবান স্মের মুখে আসন চাপিয়া বসিলেন। জমিদার বলিলেন, কাগজপত্র তাঁহার এটর্নি অফিসে প্রেরিত হইয়াছে, case লেখা হইতেছে, তাহা হইয়া গেলে কৌন্সিলের মতের জন্য যাইবে। তিনি কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ করিয়া পরিতোষ লাভ করেন না ইত্যাদি। স্মের মুখই থাকিলেন। আমি মূর্চ্ছা যাই আর কি। তিনি আমার কাগজপত্র একরূপে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী হইতে চলিলেন। সপ্রতিভ রাজকৃষ্ণ যেই হাতে নিলেন। আমরা অতিরিক্ত সামাজিক জাতি। পরের ঘরের খবরাখবর ***

ব্যাক্তি পরিচিতি

(১) **বৃন্দাবন চন্দ্র বিদ্যারত্ন ঃ** ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ও বীরচন্দ্রের আমলের প্রধান রাজ জ্যোতিষী। তিনি নবদ্বীপ চন্দ্রের কোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন।

(২) **মাতৃদেবী ঃ** মহারানী জাতিশ্বরী দেবী। ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের তৃতীয়া পত্নী। তিনি মণিপুরী কৈসাম কন্যা। তাঁর পিতার নাম মদনমোহন। মদনমোহন শ্রীহট্টে বাস করতেন। শ্রীহট্ট থেকে তাঁকে আগরতলায় আনা হয়। জাতিশ্বরীর তিন পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র ও রোহিনীচন্দ্র। নবদ্বীপচন্দ্র ১২৬৩ ত্রিপুরাব্দে মাঘ মাসে (১৮৫৪ খৃঃ) আগরতলায় জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) **রামদুলাল শর্ম্মা বিদাভূষণ ঃ** নবদ্বীপচন্দ্রের প্রথম শিক্ষক। তিনিই নবদ্বীপচন্দ্রকে হাতে খড়ি দিয়ে বিদ্যারম্ভের সূচনা করান. পণ্ডিত মহাশয় দীর্ঘজীবী ছিলেন। সুস্থ শরীরে ৯০ বৎসরের অধিক বয়সে কাশীবাস করতে করতে দেহত্যাগ করেন। নবদ্বীপচন্দ্রকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। নবদ্বীপচন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পরে তিনি নবদ্বীপচন্দ্রকে কোলে শুইয়ে সদা সান্তনা দিতেন এবং নানা পুরাণের কাহিনী শুনিয়ে বেদনা ভুলাতে সহায়তা করতেন। বিদ্যাভূষণ রাজদ্বারে পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী ছিলেন। তিনি সাহিত্যর্চা ও করতেন। 'রাজধর্ম সংগ্রহ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল।

(৪) **রাজলক্ষ্মী মহাদেবী ঃ** ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের প্রধানা মহিষী 'ঈশ্বরী' রাজলক্ষ্মী মহাদেবী বঙ্গদেশের বর্ধমান নিবাসী তাঁরাচাঁদ বর্মার কন্যা। তাঁরাচাদ বর্মার পূর্বপুরুষ পাঞ্জাব থেকে বঙ্গ দেশে আগমন করে বর্ধমানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরাচাঁদ বর্মা কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের সভাসদ ছিলেন। তিনি আগরতলাতেই বাস করতেন। রাজলক্ষ্মী মহাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন।

(৫) **জ্যেষ্ঠ ঃ** মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। ঈশানচন্দ্রের অন্যতমা মহিষী মুক্তাবলীর পুত্র। ১২৬১ ত্রিপুরাব্দের পৌষ মাসে তাঁর জন্ম হয়। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র কর্তৃক মৃত্যুর পূর্বে স্বাক্ষরিত রোবকারীতে তাঁকে বড়ঠাকুর ও বীরচন্দ্রকে যুবরাজ পদে নিয়োগ করেছিলেন। ১২৭১ ত্রিপুরাব্দে ঈশানচন্দ্রের সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধের পূর্বরাত্রে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বড়ঠাকুর ব্রজেন্দ্র দেহত্যাগ করেন। পিতার শ্রাদ্ধ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পরে নির্দিষ্ট দিনে পিতাপুত্রের শ্রাদ্ধ সমাপন করা হয়।

(৬) **বলরাম দেওয়ান সাহেব ঃ** ঠাকুর বংশীয় বলরাম কৃষ্ণকিশোর মাণ্যিক্যের রাজত্বকালে দেওয়ান উপাধি লাভ করেন এবং রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বের প্রথম ভাগেও তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। নবদ্বীপচন্দ্রই লিখেছেন এই ষড়যন্ত্রের কথা যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র এবং স্বয়ং বলরাম দেওয়ানও জানতেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে রাত্রিতে আয়োজিত এক মজলিসে ষড়যন্ত্রকারীর আততায়ীরা দেওয়ান বাড়ী ঘিরে ফেলে মধ্যরাত্রিতে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। বলরাম দেওয়ান যদিও প্রাণে বেঁচে যান কিন্তু তাঁর ভাইকে আততায়ীরা হত্যা করে। বলরাম রাজ্য ত্যাগ করে স্বগ্রাম ফিরে যান। নবদ্বীপচন্দ্র রাজ্যত্যাগ করে নৌকাযোগে মোগরা পৌছলে

নদীর ঘাটে বলরাম দেওয়ান অন্যান্য তালুকদারগণ সহ নবদ্বীপচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে নৌকা জোগাড় করে নবদ্বীপচন্দ্রকে কুমিল্লা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। নবদ্বীপচন্দ্রকে তিনি স্নেহ করতেন এবং নবদ্বীপচন্দ্রও এই জ্ঞানবৃদ্ধ দেওয়ানকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

(৭) **ব্রজমোহন ঠাকুর ঃ** ত্রিপুরার অভিজাত ঠাকুর বংশীয় ব্রজমোহন ঈশানচন্দ্রের সমবয়স্ক ও কৈশোরের সহচর। সংস্কার, শিক্ষায়, দর্শনে তিনি ঈশানচন্দ্রের অনন্যবৃত্তি। তিনি ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বের মধ্যভাগে বলরাম ঠাকুরের পদত্যাগের পরে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনিও রাজ্যের দেনা শোধের ও রাজ্যের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। গুরু বিপিন বিহারী রাজ্যকে বাধ্য করেন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বা শাসন বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত করতে। ফলে ঠাকুর ব্রজমোহন পদচ্যুত হন। গুরু বিপিনবিহারী ও রাজকার্যে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিপিনবিহারীর হঠাৎ উত্থানের ফলে ত্রিপুরা সমাজে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই ক্ষোভের নীরব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রজমোহন। ব্রজমোহন, সজ্জন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি সেজন্য তিনি অনাচার থেকে বিরত থাকতেন। বিপিনবিহারীর পতনের পরে বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর হাতে শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প কলা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ব্রজমোহনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল বীরচন্দ্র মাণিক্যকে স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনিও দেওয়ান নীলমণি দাস প্রবল আন্তরিকতার সঙ্গে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। বীরচন্দ্র জয়লাভের পরে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েই তাঁকে বর্জন করেন।

(৮) **বিপিনবিহারী গোস্বামী ঃ** নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশাবতংশ বিপিনবিহারী গোস্বামী মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের গুরু। রাজার মত এমন গুরুভক্তি পরায়ণ শিষ্য জগতে দুর্লভ। সেই সুযোগ বিপিনবিহারী পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন। তিনি রাজাকে স্নেহ করতেন পুত্রসম এবং তাঁর প্রকৃত কল্যাণকামী ছিলেন। কিন্তু তাঁর গোঁড়া ও একগুঁয়ে মনোভাব, ত্রিপুরা রাজদের সংস্কৃতিতে অজ্ঞতা, যুগের অনুপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তিনি রাজ্যের উপকার করেও শেষপর্যন্ত অপমানিত হন। বিপিনবিহারীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করা, রাজাকে দেনার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া, রাজসংসারের উঞ্ছবৃত্তির নিরসন করা। সেজন্যই তিনি রাজাকে বাধ্য করেন তাঁকে শাসন বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত করতে। ত্রিপুরার রাজাদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রভৃতি নিষ্কর দান সমূহ তিনি খাস দখলে এনে কর আদায় করতে রাজাকে বাধ্য করেন। রাজা পূর্বপুরুষদের এরূপ অপমানে রোবকারীতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে, রাজগুরু নিজে রাজার সব পাপের ভার গ্রহণ করে ঐ কাজ করেন। রাজসংসারের পাওনাদার হিন্দুস্থানী দেশওয়ালীদের এর রাজবাড়ীর দাসদাসীদের চড়া সুদের পাওনা তিনি ছলে বলে কৌশলে ফাঁকি দিয়ে রাজসংসারের চলার পথ সুগম করেন। তাঁর এই অনাচার মূলক শাসনে তিনি রাজ্যের আয় ঠিকই বাড়িয়েছিলেন যার ফলে তিনি শিষ্যকে নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর এই বাড়াবাড়ি মূলক আচরণ রাজা সহ্য করতে পারেন নি। প্রাসাদে প্রবেশের পরদিনই গুরুভক্ত রাজা দেহত্যাগ করেন। বীরচন্দ্রের

শাসন ভার গ্রহণের অব্যবহিতের পরেই তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং ব্রজমোহন ঠাকুরকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হয়। রাজগুরুকে কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়।

ডিজরেলী ঃ ডিজরেলী বেঞ্জামিন (১৮০৪-১৮৮১ খৃঃ) তিনি বেকনফিল্ডের লর্ড ছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ, ইহুদি জাতীয়। লর্ড বেকনফিল্ড নামেও সুপরিচিত। এক সময়ে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীরূপে রাজনীতিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস 'Vivian Grey' একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঃ (১৮১৪-১৮৭৮ খৃঃ) বাংলার বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্য সাধক। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও (Derozio) সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাকস কালেকটার ,বাংলার নবাব নাজিমের দেওয়ান ও বর্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর পদে কাজ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ রায়বেরিলীর অন্তর্গত শঙ্করপুর নামক একটি তালুক পান। সে সময়ে বৃটিশ সরকার তাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করে। তাঁর উদ্যোগে আউধ তালুকদার এসোসিয়েশান নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। তাঁর প্রযত্নে 'লক্ষ্মৌ টাইম্‌স' নামক সংবাদপত্র জমিদারদের মুখপত্র রূপে পরিচিতি লাভ করে। 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত' পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামীর শাসন কালের সূচনাতে কর্ম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে আগরতলায় আসেন এবং মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। মহারাজ সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু রাজগুরুর চক্রান্তে মহারাজ সাক্ষাৎকারে আসতে পারেন নি। পরদিন মহারাজের পত্র পেয়ে দক্ষিণারঞ্জন গ্রীনবোটের গলুই ঘুরিয়ে আগরতলা ত্যাগ করেন।

রামজী বিদ্যাসাগর ঃ ত্রিপুরা দরবারের বৃদ্ধ রাজজ্যোতিষী ।'শ্রী পাটের' নিকটেই বাস করতেন। রাজগুরু তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতেন।

বিদ্যাসাগর ঃ বাংলার সর্বজনপূজ্য মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬.৯.১৮২০-২৯.৭.১৮৯১ খৃঃ) জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম। মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত (সেকালে হুগলী জেলাতে ছিল) পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। লেখাপড়াও কলকাতাতে। ১৮২৯-১৮৪১ খৃঃ পর্যন্ত অনেক কষ্ট ও অধ্যাবসায় দ্বারা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, ন্যায় , বেদান্ত, স্মৃতি অধ্যয়ন করেন। হিন্দু ল কমিটি ১৬.৫.১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি যত্ন করে ইংরেজী ও হিন্দিভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮৪১ খৃঃ ২৯ শে মে ফোর্টউইলিয়ামের প্রধান পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৪খৃঃ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদের জন্য পদত্যাগ করেন। ১৮৪৭ খৃঃ তাঁর রচনা প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯খৃঃ ফোর্ট উইলিয়ামের প্রধান কেরানী পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫১ খৃঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। বেতন ৩০০ টাকা এবং বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে আরও ২০০ টাকা মাসিক। ১৮৫৩ খৃঃ বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করান। ১৮৫৫-৫৮ খৃঃ মধ্যে বিভিন্ন মডেল স্কুল স্থাপন করেন। ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের সঙ্গে মতভেদে

চাকুরি ত্যাগ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ তাঁর স্থাপিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশান কলেজে পরিণত হয়। ১৮৯০ খৃঃ বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ''সীতার বনবাস', 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী', উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'ঋজুপাঠ', 'শকুন্তলা', 'উত্তর রামচরিত', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি বাংলা গদ্যের জনক। জনগনের প্রতি প্রেম ও দয়াতে, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে, পাণ্ডিত্যে, পৌরুষে, মনুষ্যত্বে ঈশ্বরচন্দ্রের মত মানুষ সর্ব যুগেই বিরল।

আনন্দ বিহারী সেন ঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার সোনাবন্ধ গ্রামের বাসিন্দা, ডিজরেলীর শিষ্য, নব ভাবধারার বঙ্গীয় যুবক নবদ্বীপচন্দ্রের ইংরেজী ভাষার শিক্ষক রূপে বীরচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক নিয়োজিত। তিনি পাঁচ বৎসর কাল নবদ্বীপচন্দ্রের শিক্ষকতা করেন। শেষ বৎসরে রাধাকিশোর যুবরাজকেও ইংরেজী শেখান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সাবেকী মনোভাবসম্পন্ন ব্রজমোহন ঠাকুরের মনোনীত না হবার ফলে কর্মত্যাগ করেন। পরবর্তী জীবনে সবসময়ে নবদ্বীপচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আনন্দবিহারী। কুমিল্লাতে গাজী সাহেবের বাড়ী সংস্কার করে নবদ্বীপচন্দ্রের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। জলপথে ঢাকা নগরী অভিমুখে যাত্রাকালে নিজ গ্রামের সীমায় নবদ্বীপচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর সঙ্গে ঢাকা যান। সেখানে কলকাতা যাত্রা কালেও তাঁর সঙ্গী হন এবং গোয়ালন্দ পৌঁছে বিদায় জানিয়ে নিজগ্রামে ফিরে আসেন। (১৮৭১খৃঃ)

কেশবচন্দ্র সেন ঃ ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা (১৮৩৩-১৮৮৪খৃঃ) । ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটী শহরের অন্তর্গত গরিফা নিবাসী প্যারীমোহন সেনের পুত্র কেশবচন্দ্র কলকাতার কলুটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন। ১৮৫৭ খৃঃ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খৃঃ 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন এবং উহার মুখপত্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭০ খৃঃ 'সূলভ সমাচার' নামে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭০ খৃঃ ইংলন্ডে যান। দেশে ফিরে এসে Indian Reform Association গঠন করেন। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে মজুরদের লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেন। 'মাদক নিবারণী সভা' গঠন করেন। ১৮৭৫ খৃঃ তাঁর কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ হয়। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজে কলহ উপস্থিত হয়। তিনি 'ভারতবর্ষীয়' ব্রাহ্মসমাজ' ত্যাগ করে 'নববিধান' ব্রাহ্ম সমাজ ' গঠন করেন এবং 'নববিধান পত্রিকা ' প্রকাশ করে নূতন উদ্যমে নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর ধর্মবিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। 'জীবনবেদ' নামক আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫ খৃঃ) প্রসিদ্ধ ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। কলকাতার চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃঃ হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক রূপে কাজ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী ভাষার তিনিই প্রথম বাঙালী অধ্যাপক। সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। 'ওয়েল উইশার' নামক ইংরেজী ও 'হিতসাধক' নামে বাংলা মাসিক পত্র পরিচালনা করেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য অন্নসত্র খোলেন। এডুকেশান গেটে নাম সরকারি সংবাদপত্র

সম্পাদনা করেন। সরকারের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় পদত্যাগ করেন। শিশুপাঠ্য ইংরেজী পুস্তক First Book এবং Second Book রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গোপীমোহন মুন্‌শী ঃ ত্রিপুরার রাজকীয় লৌহ কর্মশালার অধ্যক্ষ।

কুমার রোহিন চন্দ্র ঃ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র এবং নবদ্বীপচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। তিনি বাল্যকালেই দেহত্যাগ করেন।

টলস্টয় ঃ টলস্টয় কাউন্ট লিউ (১৮২৮-১৯১০ খৃঃ) রাশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক দার্শনিক। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষা লাভ করার পর ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যোগদান করেন। যুদ্ধের বীভৎসতায় অহিংসা মত অবলম্বন করেন। তাঁর বিশাল জমিদারী ছিল। জমিদারীতে মানবতামূলক সংস্কারের কাজ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ভগবৎ বিশ্বাস, মানবপ্রেম তাঁর রচনায় মূল সূত্র। War and peace, Anne Karenina , The Cossasks, Resurrection, The end of the Age, The power of Darkness প্রভৃতি তাঁর কালজয়ী রচনা। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কর্মের প্রেরণালাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সাহিত্য সম্রাট সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮-৮.৪.১৮৯৪) পৈতৃক বাড়ী নৈহাটির কাঁঠালপাড়া, পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কালেকটার ছিলেন। কিছুকাল গ্রামে, মেদিনীপুরে এবং পরে হুগলী কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খৃঃ জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রথম রচিত কবিতা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খৃঃ। ১৮৫৩ খৃঃ কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা' ও 'মানস' রচনা করেন। ১৮৫৬ খৃঃ সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ২০ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৭ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৮ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি.এ. পাশ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করে। কর্মজীবনে ১৮৬৯ খৃঃ বি.এল. পাশ করেন। 'দুর্গেশ নন্দিনী' প্রথম উপন্যাস তার পরে 'কপাল কুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'দেবীচৌধুরানী', 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের রচয়িতা। 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। 'Rajmohan's wife' তাঁর ইংরাজী উপন্যাস। 'প্রচার' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫.১.১৮২৪-২৯.৬.১৮৭৩ খৃঃ) অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক। যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতা জাহ্নবী দেবী। ১৮৩৭খৃঃ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৮৪৩-১৮৪৮খৃঃ পর্যন্ত মাদ্রাজে Madras Circulator. Anthaenemum, Hindu Madras Spectator প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রেবেকা ম্যাকটাভিচকে বিবাহ করেন। সাত বৎসর পরে পত্নী ত্যাগ করেন। তারপর এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়াকে বিবাহ করেন. পাইক পাড়ার রাজাদের অনুরোধে ১৮৫৮ খৃঃ রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন

এবং বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় অভিনয় করান। শর্মিষ্ঠারও ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৬১ খৃঃ নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৬২ খৃঃ ইংলন্ডে গমন করেন। সেখানে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। ১৮৬৩ খৃঃ ভার্সেই নগরী ভ্রমণ এবং প্রথম চতুর্দশ পদী কবিতা রচনা করেন। বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন। ফ্রান্সে প্রচণ্ড অর্থকষ্টে দিন কাটান। সে সময়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেন। ১৮৬৭ খৃঃ কলিকাতায় ব্যারিস্টারী করতে শুরু করেন কিন্তু আইন ব্যবসাতে বিফলকাম হন। কিছুদিন Examiner of the Privy Council Recors এর পদে কাজ করেন। ১৮৭২ খৃঃ পঞ্চকোটের মহারাজের Legal Adviser পদে নিযুক্ত হন। প্রচণ্ড আর্থিক কষ্টে, দুরবস্থায় , লোকান্তরিত হন। শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা? বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, মেঘনাদ বধ, কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, চতুর্দশ পদী কবিতাবলী, হেকটর বধ, মায়া কানন, The Captive Lady, The Anglo Saxon and the Hindus, Rat navali, Sarmistha , Nil Darpan or the Indigo planting Mirror প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭.৫.১৮৬১-৭.৮.১৯৪১ খৃঃ) ঃ আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, পৃথিবীর সর্বযুগের কবি সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর এই উজ্জ্বল রবি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতকার। ১৮৮২ খৃঃ সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম কর্তৃক আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ মনিষীরূপে মাল্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। ১৯১৩ খৃঃ 'গীতাঞ্জলী' র জন্য নোবেল পুরস্কার পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর, বৃটিশ সরকারের নাইট উপাধি প্রাপ্ত কবি দেশভক্তির চরম নিদর্শনকারী। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ৬৮ বৎসর বয়সে চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। চিত্রাঙ্কনেও তাঁর প্রতিভা বিস্ময়কর। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পথে নেমে গান করেন। আর্ন্তজাতিকতা বাদে বিশ্ববাসী, পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণকারী মৃত্যুর চারমাস পূর্বেও 'সভ্যতার সঙ্কট' লিখে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সত্যপথে চলার নির্দেশ দেন। আদর্শ শিক্ষক রূপে বোলপুর আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিজস্ব শিক্ষাদর্শন প্রয়োগ করেন। অর্থের অভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির দান নিয়ে, দেশ বিদেশে নৃত্যানুষ্ঠান সঙ্গীতানুষ্ঠান করে, ক্রমে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়টিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী রূপে গড়ে তোলেন। ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। অখ্যাত তরুণ কবিকে বীরচন্দ্রমাণিক্য প্রথম সম্বর্দ্ধনা দিয়েছিলেন। রাধাকিশোর ছিলেন কবির বিশেষ বন্ধু, বীরেন্দ্র কিশোর কবিকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন এবং বীরবিক্রম কিশোর কবিকে ত্রিপুরার শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের দানে পরিপুষ্ট হয়েছিল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী। ত্রিপুরার টান এতো প্রবল ছিল যে ব্যস্ত কবি মোট সাতবার আগরতলা ভ্রমণ করেন। একস্থানে এতবার ভ্রমণ করেছেন এমন সাক্ষ্য কবির দীর্ঘজীবনে দুর্লভ।

রাধারমণ ঘোষ ঃ বীরচন্দ্রমাণিক্যের সভাসদ, রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক, মাণিক্য বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী, মন্ত্রী, ঘোষ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, বৈষ্ণবীয় দর্শনের উচ্চতর পণ্ডিত ও ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিকট বৈষ্ণব দর্শন শ্রবণ করতেন। তিনিই বীরচন্দ্রের দূত রূপে কলিকাতায় গিয়ে ঠাকুর বাড়ীতে তরুণ কবিকে প্রথম সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

মদনমোহন মিত্র ঃ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভাসদ। সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত সংগীতবিষয়ক পুস্তকের কথা নবদ্বীপচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।

সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪ খৃঃ) ঃ কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র সৌরীন্দ্র মোহন বঙ্গীয় সঙ্গীত জগতে নবজাগরণের জনক। তিনি ছিলেন একাধারে ধ্রুপদী, সেতার বাদক, গবেষক, সঙ্গীতজ্ঞ, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বাংলা ভাষায় আদি গ্রন্থকার, সঙ্গীত বিদ্যালয়ের স্থাপকর্তা, গুণগ্রাহী রসজ্ঞ, গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক এবং স্বরলিপি রচনার অন্যতম আদি উদ্ভাবক। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন ক্ষেত্রযোনে গোস্বামী, বড়ুক খাঁ এবং লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র। তিনি ছিলেন ওয়াজেদ আলী শাহর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দরবারের উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন মোয়াদ আলী, জোয়ালা প্রসাদ, কামতা প্রসাদ, শিবনারায়ণ মিশ্র, আলীবক্স, কাঁলে খাঁ, কুবুভ খাঁ, নিয়ামত উল্লা, ইমদাদ খাঁ প্রভৃতি। তাঁর রচনার মধ্যে জাতীয় সংগীত বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা, মৃদঙ্গ মঞ্জরী, হারমোনিয়াম সূত্র, যন্ত্রকোষ, গীতপ্রবেশ, সংগীতশাস্ত্র প্রবেশিকা হিন্দুসঙ্গীত, বাহুলীন তত্ত্ব, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১খৃঃ বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং ১৮৮৯ খৃঃ বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক প্রতিষ্ঠা করেন। লণ্ডনের Royal College of Music এ অর্থদান করেন। ১৮৭৫ খৃঃ ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব মিউজিক উপাধিতে ভূষিত করে। ১৮৮০ খৃঃ ভারত সরকার তাকে রাজা উপাধি দান করেন।

দীনবন্ধু নাজীর ঃ অভিজাত ঠাকুর পরিবারের সন্তান দীনবন্ধু বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগের পরেই বংশানুক্রমিক নাজীর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন কুমার নবদ্বীপচন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু। সেকালের অন্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁর কর্মজীবনে তিনি প্রথমে রাজ্যের উপাধি সংক্রান্ত দপ্তরের সর্বাধিকারী ছিলেন। পরে বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রী ব্রজমোহন ঠাকুরের কর্মত্যাগের পরে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রূপে কার্যভার পালন করেন।

নীলকৃষ্ণ দেববর্মা ঃ মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের পুত্র। নবদ্বীপ বাহাদুরের পিতৃব্য। বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজ্যলাভের হেতুতে তিনি আদালতে নিজের বৈধতা প্রমাণ করতে মোকদ্দমা করেন। নিম্ন আদালতের রায়ে জয়লাভ করেও পরে হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলের আপিল শুনানীতে পরাজিত হন। বাকী জীবন তিনি কুমিল্লা নগরে বসবাস করেছিলেন।

রাধাকিশোর ঃ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর (১৮৯৬-১৯০৯খৃঃ) বীরচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং পরবর্তী ত্রিপুরার রাজা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রজারঞ্জক রাধাকিশোর রাজধানীর অধিকাংশ সুরম্য ভবনের নির্মাতা। দানবীর রাধাকিশোরের দান বহু ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে। বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ ভক্ত রাধাকিশোর ত্রিপুরার রাজকার্য্যে বাংলাভাষার ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেন। সেকালের বহু বিশিষ্ট, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র

বসু ব্যতিরেকেও তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। মধ্যযুগীয় ত্রিপুরার আধুনিক কালের ত্রিপুরার উত্তরণে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামঠাকুর ঃ পূর্বোক্ত বলরাম দেওয়ানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রাজদরবারে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে তিনি একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন। যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের দরবারে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ চক্রান্ত গড়ে উঠে। এই চক্রান্তের সংবাদ সম্ভবতঃ উপেন্দ্রচন্দ্র বা বলরাম দেওয়ান জানতেন না। বলরাম দেওয়ানের সঙ্গে একই বাড়ীতে তিনি বাস করতেন। একদিন দেওয়ান বাড়ীতে মজলিস উপলক্ষে অধিক রাত্রি অবধি অনুষ্ঠান চলে। শেষ রাতে ষড়যন্ত্রকারীগণ বাড়ী ফিরে খালে এবং গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। রামঠাকুর অগ্নিদগ্ধ গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হবার চেষ্টা করলে আততায়ীদের বর্শাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র ঃ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের পুত্র। কৃষ্ণ কিশোরের বলে রোবকারী ঈশানচন্দ্র পরবর্তী রাজা ও উপেন্দ্রচন্দ্র যুবরাজ পদে নিযুক্ত হন। ঐতিহাসিকদের মতে উপেন্দ্রচন্দ্র উগ্রমেজাজী ও পানাসক্ত ছিলেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আলম কারিকর ঃ সেকালে ত্রিপুরার রাজাদের নিযুক্ত চিত্রশিল্পী। মোগল চিত্রশিল্প রীতির বিশিষ্ট শিল্পীর চিত্রাবলী 'পদকল্পতরু ' ও 'রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। শিল্পীর technique এবং হিন্দুপুরাণের জ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গগন চক্রবর্তী ঃ কুমিল্লা কালিয়াজুরী নিবাসী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। আনন্দবিহারী সেনের পরিচিত এবং নবদ্বীপচন্দ্রের অন্যতম গুণগ্রাহী ব্যক্তি। তিনি কালিয়া জুরী ঘাটে আনন্দবিহারীর সহিত আগরতলা থেকে নৌকা যোগে আনত নবদ্বীপচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা করেন।

চৌধুরী মহম্মদ গাজী ঃ কুমিল্লা অঞ্চলের বিশিষ্ট জমিদার এবং কুমার নীলকৃষ্ণ দেববর্মার বন্ধু। গাজী সাহেব ধর্মপরায়ণ মুসলমান কিন্তু উদার দৃষ্টি সম্পন্ন মানবতাবাদী, জনহিতকারী ব্যক্তি। তিনি সেকালে ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নবদ্বীপচন্দ্রকে নিজের একটি গৃহে বাস করতে দেন এবং সর্বপ্রকারে সহায়তা করেন। তাঁর বাড়ীতেই নবদ্বীপচন্দ্রের জননীদেবী নারায়ণ পূজা করেন। পরবর্তী কালেও নবদ্বীপচন্দ্র সেই বাড়ীতেই বাস করতেন।

কাশীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ কুমিল্লাতে বসবাসকারী রাজ্যত্যাগী রাজপুত্রদের পারিবারিক পুরোহিত। কালিয়াজুরির ঘাটে নেমেই নবদ্বীপচন্দ্রের জননী দেবী নারায়ন পূজা করবার বাসনা প্রকাশ করলে পুরোহিতদের অভাবই প্রদান অন্তরায় হয়ে দাঁলায়। সেই সময়ে গগন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাশীচন্দ্রকে শালগ্রাম শিলাসহ ঘাটে উপস্থিত করান। নদী চরেই ব্যবস্থাদি করে শাস্ত্রানুসারে উদ্দিষ্ট নারায়ণ পূজা কাশীচন্দ্র সম্পাদন করেন। তারপর থেকে তিনিই নবদ্বীপচন্দ্রের পারিবারিক পুরোহিত রূপে পরিবারের সেবা করেন।

মন্ট্রো ঃ নবদ্বীপচন্দ্রের পক্ষ সমর্থনকারী সেকালের প্রখ্যাত আইনজীবী।

হরিমোহন গুহ ঃ সে কালের কুমিল্লা আদালতের উকিল। শহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও নবদ্বীপচন্দ্রের সাহায্যকারী।

মিঃ কার্টলে ঃ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট । লুসাই অভিযানের কালে তিনি সমস্ত নৌকা সরকারী হেফাজতে আনেন। নবদ্বীপচন্দ্রের নৌকা ও আটক করা হয়। নবদ্বীপ নিজে দেখা করে প্রয়োজন বুঝিয়ে বলার পর তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।

মণিপুর ঃ মহারাজ দেবেন্দ্র সিংহ। আভ্যন্তরীন গোলযোগে তিনি রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে ঢাকাতে বসবাস করতেন। ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে পরে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক সংঘটিত হয়।

নবাব আবদুল গনি (১৮৩০-১৮৯৬ খৃঃ) খাজা আবদুল গনি ছিলেন বিখ্যাত দানবীর। তাঁর পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতা খাজা আলিমুল্লা ব্যবসা করে প্রচুর অর্থলাভ করেন। দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর নাম বিখ্যাত। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে নবাব উপাধিতে ভুষিত করেন।

নবাব আসাদুল্লা (১৮৪৬-১৯০১খৃঃ) নবাব বাহাদুর খাজা আবদুল গনির পুত্র। তিনিও দানের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ১১ লক্ষ টাকার অধিক দান করে গিয়েছেন।

বৈকুণ্ঠ নাথ সেন ঃ ঢাকার বিদ্যালয় পরিদর্শক। পরোপকারী, তিনিই সেকালের ঢাকার বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে নবদ্বীপচন্দ্রকে পরিচিত করান।

বিশ্বনাথ গুপ্ত ঃ রাজগী ত্রিপুরার কর্মচ্যুত পেশকার। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। তিনিই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঢাকতে নবদ্বীপচন্দ্রের বাসস্থান ঠিক করে দেন।

কামিনী কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ঢাকা জেলার অধিবাসী, ভবানীপুরে তাঁর সঙ্গে এখই বাড়ীতে নবদ্বীপ চন্দ্র বাস করতেন। কামিনীকুমার আইন পাশ করা বিশিষ্টব্যক্তি, ভবানীপুরের সুবারবান স্কুলের শিক্ষক ছিলেন. কৈলাসচন্দ্র সিংহ কুমিল্লা স্কুলে তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন।

কৈলাস চন্দ্র সিংহ ঃ ত্রিপুরার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের লেখক। কৈলাসচন্দ্রের পিতামহ ও পিতা গোলকচন্দ্র রায় ত্রিপুরা রাজসরকারে কাজ করতেন। পিতার মৃত্যুর পরে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনিও রাজকার্যে যোগদান করেন। সে সময়েই তিনি রাজখান্দান ও ত্রিপুরার বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত হন। বীরচন্দ্র নবদ্বীপ বাহাদুরের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমায় তিনি নবদ্বীপচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। সেই সময়েই তিনি প্রাচীন দুর্লভ দলিল দস্তাবেজ দেখার সুযোগ পান এবং সংগ্রহ করে রাখেন। পরবর্ত্তী কালে ঐ সব আকর ব্যবহার করে ত্রিপুরার প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেন। ত্রিপুরার কাজ ছাড়ার পরে তিনি কলকাতায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন।

লর্ডমেয়ো (১৮২২-১৮৭২ খৃঃ) তিনি বৃটিশ ভারতের বড়লাট ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেন। আজমীড়ে অবস্থিত রাজ কলেজের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৬৯ খৃঃ আফগানীস্থানের আমীর শের আলী তাঁর নিমন্ত্রনে আম্বালা দরবারে যোগদান করেন। ১৮৭২ খৃঃ আন্দামান পরিদর্শন কালে শের আলী নামক জনৈক মুসলমান অন্তরীন কর্তৃক ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ খিদিরপুরনিবাসী, নবদ্বীপচন্দ্রের বন্ধু ব্যক্তি, এবং মোকদ্দ ব্যাপারে উদ্যোগকারী।

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আত্মীয়। নবদ্বীপচন্দ্রের বন্ধু ব্যক্তি মামলার কাজে অন্যতম সাহায্যকারী।

জন রবকোর্ট ঃ কলকাতাতে নবদ্বীপচন্দ্রের আইনজীবি। বিশেষ সহৃদয় ব্যক্তি, কলকতায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে নবদ্বীপচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। রবকোর্ট ছিলেন বন্ধু। মাইকেল মধুসূদনের বিধবা পত্নীও তাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি নবদ্বীপচন্দ্রকে লাইব্রেরী ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলতেন বই এর চাইতে উত্তম বন্ধু দুঃ আর কেউ নয়। নবদ্বীপচন্দ্র একনিষ্ঠ পাঠক। পড়াকে তিনি নেশায় পরিণত করেন. রব ইংলণ্ডের সম্পন্ন ঘরের সন্তান। পিতা নিঃস্ব হলেও তাঁর জ্যেষ্ঠতাত অবিবাহিত ও ধনবান ছিলেন। ভাইকে জ্যেষ্ঠ সাহায্য করতেন না। জ্যেষ্ঠর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ কনিষ্ঠ ধর্মযাজ বৃত্তিগ্রহণ করে ভারতে আসেন। সার্ক ও জন তার দুই পুত্র। জন কলকাতায় আসিয়া অ করে ব্যাবহারজীবির বৃত্তি গ্রহণ করেন। সার্ক ইংলণ্ডে পড়াশোনা করতেন। নবদ্বীপচ বিবৃতিতে জানা যায় যে জন রবকোর্টের অকৃতদার জ্যেষ্ঠতাত মৃত্যুকালে জনকে তাঁর সম্ উত্তরাধিকারী করেন। কিন্তু নির্লোভ জন ঐ দান গ্রহণ করেন নি।

আবর্জ্জনার ঝুড়ি

এই আত্মজীবনীটী সম্বন্ধে ২/১ টি মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্ম্মা বাহাদুর স্বয়ং এই আত্মজীবনীর লেখক, এবং ইহা তাঁহারই ঘটনা-বহুল অদ্ভুত জীবনের ইতিহাস। ইহাতে উপন্যাস বা অতিরঞ্জন নাই। কিন্তু তাহার জীবন যেরূপ বিচিত্র-ঘটনা-পূর্ণ, তাহাতে উপন্যাসাপেক্ষাও ইহা সুখপাঠ্য হইবে বলিয়াই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস লইয়াই কোনও ব্যক্তি বিশেষের জীবনী হইলেও, সাদরে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীতও এই প্রবন্ধের আর একটা বিশেষত্ব আছে। উচ্চ পরিবারের দৈনিক ব্যবহারাদির ও চলাফেরার রীতিনীতির কথা জানিতে অনেকেরই ঔৎসুক্য হয়, কিন্তু সে সুবিধা খুব বেশী হয় না। ত্রিপুরার মহামান্য রাজপরিবার এক হিসাবে অত্যন্তই Conservative : প্রাচীন যুগের রীতি-নীতি এবং রাজমর্যাদা এখনও ত্রিপুরার রাজপরিবারে অনেকাংশে সযত্নে রক্ষিত; তাই সকলের পক্ষে এই পরিবারের কথা জানা বড় সহজ ব্যপার নহে। এতদ্ব্যতীত, যিনি এই জীবনেতিহাস লিখিতেছেন, তিনিও এই যুগের মানুষ নহেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৬৪ বৎসর। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে খাঁটী হিন্দুরাজপরিবারের আচার-ব্যবহার যে কি প্রকার ছিল, তাহা জানিতে বিশেষ কৌতুহল হওয়াই স্বাভাবিক।

শেষটা একটা অসুবিধার কথারও উল্লেখ করিতেছি। মহারাজ কুমারের কপিটা অপর কাহারও দ্বারা নকল করিয়া পাঠানো। মহারাজকুমার স্থানান্তরে দূরে থাকেন। এ অবস্থায় নকলকর্তার ত্রুটীতে কোন ভুল-প্রমাদ ঢুকিলে বা কোন কথা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল, তাহা সংশোধন করাইয়া আনা সময়সাপেক্ষ। এবার আমরা সে সুবিধা পাই নাই; এজন্য কাপিতে যাহা আছে, অবিকল মুদ্রিত করিলাম। এজন্য কেহ প্রবন্ধলেখককে দায়ী না করেন। প্রবন্ধ-লেখক রাজকুমার হইলেও ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সুপণ্ডিত। তাহার লেখনি হইতে বিশেষ একটা কিছু ভুলভ্রান্তি বাহির হওয়া সম্ভবপর নহে। মহারাজকুমার প্রবন্ধটীর নাম দিয়েছেন 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি'। কিন্তু রাজবাড়ীর আবর্জ্জনার ঝুড়ি অনেক সময়েই জনসাধারনের কোষাগার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাস্তার সাধারণ আবর্জ্জনার ঝুড়িতে অনেক সময় সিকিটা দুয়ানিটা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু রাজবাড়ীর এ আবর্জ্জনার ঝুড়ি অনেক সময়েই জনসাধারনের কোষাগার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! রাস্তার সাধারণ আবর্জ্জনার ঝুড়িতে অনেক সময় সিকিটা দুয়ানিটা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু রাজবাড়ীর এ আবর্জ্জনার ঝুড়িতে মণিমাণিক্যের সন্ধানই পাঠাকজন পাইবেন, এই ধারণা। ছবিটা কুমারের ৩৫/৬৬ বৎসরের প্রতিকৃতি। —সম্পাদক।

দুঃখ - সন্তাপহারী শ্রীভগবান পূজনীয়া জননীকে অকৃতী লেখকের গর্ভবহন-দুঃখ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন —১৭৭৫ (১২৬০ সাল) শকাব্দর মাঘ মাসের ১৪ই। পনেরো বৎসর পরে

প্রবীণ রাজ-জ্যোতিষী বৃন্দাবন চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় Extra strong Blue Laid Foolscap কাগজে , খয়েরের জুলুসে কালিতে, "সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি—" লেখার মধ্যে মধ্যে জ্যামিতিক ঘন ক্ষেত্রের আকার, এবং গূঢ়ার্থগর্ভ নর-শরীর-চিত্রের অবকাশে অসহনীয় সমরূপত্ব বিমোহিত, প্রায় নিরেট একটা মোটা নলের মত কোষ্ঠীপত্র আমাকে আনিয়া দিলেন; আমিও জননী-দেবীর হাতে দিলাম; এবং তিনি তখনই শুভাশুভ ফল শুনিতে চাহিলেন। আমি শুরু করিলাম— সৌর মাঘস্য চতুর্দ্দশ দিবসে— জীববাসরে —কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ— দিবাকাস্মিক ষড়্দণ্ডাভ্যন্তরে—কুম্ভলগ্নে—শনেঃক্ষেত্রে—চন্দ্রস্য হোরায়াং —কূজস্য দ্রেক্কাণে —কুজস্য নবাংশে —শুক্রস্য দ্বাদশাংশে —বুধস্য ত্রিংশাংশে — বুধস্য সপ্তাংশে —কুজস্য যামার্দ্ধে— রর্বেদ্দণ্ডে —বুধস্য সপ্তাংশে—কুজস্য যামার্দ্ধে— রবের্দ্দণ্ডে— মাহেন্দ্রস্য ক্ষণে— বুধাদিত্যযোগে —গুরুচন্দ্রমাযোগে —রাহুতুঙ্গী যোগে— আদিসিংহাসন শনি-রাহুনাং— কেন্দ্রীযোগে— আদিসিংহাসন যোগে — হেমচ্ছত্র যোগে— শনিরাহু যোগে— ষট্শূন্যযোগে— গুরুর্মূলত্রিকোণযোগে —উভয়চারী যোগেষু শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ভূপতেঃ শুভ দ্বিতীয় কুমার শ্রীল শ্রীমন্নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্ম নাম তস্য মূলাক্ষত্রাশ্রিত ধনুরাশৌ চন্দ্রে - কৌণপগণোয়ং ক্ষত্রিয় জাতিরাশিঃ —" তারপরে ক্রমে যোগফল— বর্গফল— কোষ্ঠীফল প্রভৃতি একে একে পড়িয়া গেলাম। —মাতৃদেবী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। আয়ুর নির্দ্দেশ শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ তাহাই বলিতেন।" জননী অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত মাথায় তুলিলেন। আমি এমন বেসুর ধরিলাম যে music- এর স্কেলটা একবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। পুরাতন শাস্ত্রের দৈব-মাত্র সংস্কারটা বাড়ন্তর দিকে চলিয়া চলিয়া শেষে তাহাতে প্রতিক্রিয়ার বিক্ষেপ আসিয়া লাগিয়াছিল। পৌরুষ-বাদটা তখন আবার তেমনই অসংযত অশ্বের মত দৌড়িয়া চলিয়াছিল। আমি তখনকারই কথা বলিতেছি। বলা বাহুল্য যে তরুণ মস্তিস্কে এই অসংযত বিদ্রোহটা অত্যন্ত সচেতনই থাকিত। আমি প্রশ্ন তুলিলাম—" এই যে বিদ্যারত্ন মহাশয় যোগের ফল লিখিলেন, কোথাও 'হয়-গজ-নর-নৌকা-মেদিনীর মণ্ডলানাং ভবতি বিপুল লক্ষ্মীরাজ রাজ্যো ধনাঢ্যঃ'— কোন স্থলে 'ভূপালোগম সেবিত—' আবার 'ধনাঢ্যো মাননীয়োনৃপানাং'—অন্যত্র 'নৃপশ্চিরগোমহি-যাশ্ব কুঞ্জরৈর্যুক্তা ভবেন্নরপ্তি ধনিনো গুণাঢ্যঃ'— আবার 'নৃপএর যোগঃ স্বরাজভূঙতে'— পুনর্ব্বার 'নভূত ন ভবিষ্যতি'— ইত্যাদি— ইহাতে যদি সেই সময়ে ভূমিষ্ঠ বহু জাতকের সকলেরই সাম্রাজ্য-লাভের অঙ্গীকার মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের সকলের জন্য ঠাঁই হওয়া অত বড় সহজ ব্যাপার নহে!" বলা বাহুল্য যে, জননীদেবী বিমর্ষ হইলেন। অসন্তোষ নিয়াই আমাকে তাঁহার দৈব-পুরুষ-কারের সঞ্চিত বিশ্বাসটি নানা কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সে সব বহু কথা। তার সকলগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবল কর্দ্দম-যষ্টি ন্যায়টা রাখিলাম। কাদায় চলিতে গেলে যষ্টির প্রয়োজন হয়। সকলের যষ্টি জোটে না। যে কয়জন যষ্টি পায়, তাহাদের যষ্টিলাভ ভাগ্যবত্তায় প্রভেদ না থাকিলেও , যষ্টিব্যবহারের অসমান যত্নে কেহ পদস্খলন এড়ায়, অনেকেই পারে না। এই বহু জাতকের মধ্যে দুইটি কি একটি মানুষের মত মানুষ থাকিতে পারে, যাহার যষ্টি আদ্যন্ত পথ তৃতীয় পদেরই মত কাজ করিয়া যায়। সাম্রাজ্যলাভ তাঁহারই পক্ষে সম্ভবপর। তাহা হইলে ত ঠাঁই হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপারও নয়! আমি অনুভব করিলাম, তর্কবুদ্ধির ধার অনেকটা মোটা হইয়া গেছে।

পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ি। শুভদিন নির্দ্ধারিত হইল। স্নান করিয়া, ফোঁটা কাটিয়া, কৌষের পরিধেয়-উত্তরীয় পরিধান করিয়া, অর্থাৎ অত্যন্ত ভাল মানুষটি সাজিয়া, দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ভগবতী বাগ্দেবীর অর্চ্চনা শেষ হইয়াছে। পুষ্পবিল্বদলে বৃহৎ ঘটকুম্ভ এক-বারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। পুষ্পচন্দন ধূনা অগুরুর গন্ধ ত নয়, বিহ্বলকারী বাস্তবতার গুরুচাপ যেন গৃহবায়ু বহিতেই পারিতেছিল না। শঙ্কা মিশ্রিত কৌতূহলে দেখিলাম, পিতৃদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, ভবিষ্য শিক্ষকমহাশয় রামদুলাল বিদ্যাভূষন। ব্রাহ্মণের সদ্যমুণ্ডিত বৃহৎ মস্তক, চন্দন-চর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট, প্রভাময় আয়ত চক্ষু, প্রতিশব্দসেবিত কণ্ঠস্বর! মোটের পরে এমন এককটা বিশিষ্টাতাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে, প্রণত সাক্ষাতের অনুভূতি ভূলিতেই পারা যায় না। তাঁহার ডোঙ্গার মত আঁজলের একরাশ পুষ্পবিল্বদলের বোঝা আমার ক্ষুদ্র করপুটে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় অঞ্জলির মন্ত্র পড়াইলেন। এদিকে কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের অনুকরণে পুষ্প-বিল্বপত্র সবেগে নিক্ষেপ করিতে গিয়া কৌষেয় পরিধেয় কটিচ্যুত হইবার মত হইয়া গেল। তারপর একখানা কৃষ্ণ প্রস্তরের থালায় (স্নৌটিক যুগের পূর্ব্বকার কথা) খইড় মাটিতে লেখা বর্ণমালায় হাত চালাইয়া নিতে দিলেন। এই হইয়া গেল বিদ্যারম্ভ। সে জন্য পঞ্জিকা বিচারের ত্রুটি অবশ্যই হয় নাই। অর্থাৎ তিথি, বার, রাশি, নক্ষত্রাদির এবং যুগকরণাদির সম্মিলনে এমন একটা ব্যূহ নির্ম্মাণ করা গিয়াছিল যে, বিহির্দ্দিক হইতে জড়তা জিনিসটা কোন পাকে-প্রকারেও প্রবেশের পথ না পায়। কিন্তু একটা কেহ ভাবে নাই; জিনিসয়া যদি আদৌ ভিতরেই থাকিয়া থাকে! যাহা হৌক , তার পর হইতেই বাগ্দেবীর নিত্য অর্চ্চনার পালা আরম্ভ হইল। দেখিতাম, অধ্যাপক মহাশয়ের বদনে মধুর হাস্য, এবং দক্ষিণপাণির মধ্যে কম্পিতাগ্র যুগলীকৃত অস্থূল বেত্রের মুষ্টি সদাই লাগা। আরও দেখিতাম, শেষোক্ত পদার্থে আদবে কোন পোষিকি লক্ষণ নাই। ঘাত-প্রতিঘাতে- পিষ্ট-বিপিষ্ট অগ্রভাগ বরং আটপৌরে ব্যবহারেরই সাক্ষ্য দান করিত। বলাবাহুল্য যে, নূতন ছাত্রের লিখন-পাঠনের গতি প্রথম কয়েকদিন দম দেওয়া ঘড়ির মতই চলিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে বড় বিহ্বলই হইতে হইয়াছিল। একেত এই মধুর - হুদ্ররসের সম্মিলিত বিষম দৃশ্য, তাহার উপরে শিরো পড়োর (?) শান্ত উদাসীন ভাব! ইহার অত্যাকর্ষিত ব্যাক্যা এই হয় যে, ত্রুটি এবং তাহার শাসন কর্ম্মীর সম্বন্ধে অবাঞ্ছনীয় হইলেও সহজপর। আলোক-বিজ্ঞানানুমোদিত দৃষ্টিপাত থাকিত প্রায় ৯০ ডিগ্রি স্বহস্তের কার্য্যে, আর বিজ্ঞানন্তর মতের, ৪৫ ডিগ্রি দৃষ্টি চলিত পরহস্তের কার্য্যের দিকে; কেননা বেত্র-যুগ্মের আস্ফালনের পূর্ব্বাবাস সকল সময়ে ঠিক পাওয়া যাইত না। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, অধ্যাপক মহাশয়ের দ্বিজিহ্ব শাসন-সায়ক, ছাত্র-পৃষ্ঠ বর্জ্জন করিয়া ভূপৃষ্ঠ বা কাষ্ঠনির্ম্মভ ডেস্ক-পৃষ্ঠের সহিত দান-প্রদানের নিত্য-সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন। ছাত্রপৃষ্ঠের এই বিশেষ অধিকার বা অনধিকার, যেমন দিনের পর দিন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে চলিল, অন্যদিকে পূর্ব্বোক্ত ঘটিকা যন্ত্রের কার্য্যেও কিঞ্চিৎ ব্যভিচার দেখা যাইতে লাগিল। যাহা হৌক, এতদিনে শিরোপড়োর উদাসীনতার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কালো মাটির গোলাকার মস্যাদার; তার স্থূলভাগটি হইতে সমান্তরালে তিনটি সচ্ছিদ্র কর্ণ বা উদ্গতাংশ; বহুনসৌকার্য্যর্থে ছিদ্র তিনটিতে রজ্জুবিদ্ধ করিয়া শিকা-গড়া। খোলামুখ; তবুও simplicity এবং economy-র চূড়ান্ত বন্দোবস্ত! তরল মসী বিগলিত হওয়ার পথ রোধ কবিবার জন্য তাহাতে ন্যাক্ড়া

পুরিয়া দেওয়ায় কেবল লেখনীর অগ্রভাগ আর্দ্র করিবার পরিমাণ মসীমাত্র বাহির হইত। তাহারই অনুকরণে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শতবর্ষ ব্যবহারের মসীপূণ৪ বিলাতি দোয়াত বাহির হইয়াছিল। হায়রে প্রাচ্য সভ্যতা! বিশ্বশিল্পীর নির্ম্মিত নরে লেখনী; এবং মাথার চুল ছিল Penbrush! কনের Pen-rest, কিনিবারত দরকারই নাই; অধিকন্তু "চৌরেণাপি ন নীয়তে!" গৃহ-প্রদীপের শিখায় কালি, বৃক্ষপত্রে কাগজ, সে কি দিনই গিয়াছে! এইসকল ষ্টেশনারী সংগ্রহ করিয়া শারদা দেবীর উপাসনায় ভর্ত্তি হওয়া গেছিল। আমাদিগের তখনকার যুগে লেখাই ছিল, শিক্ষার প্রদান বা ব্যাপক অঙ্গ; —অর্থাৎ যাহাতে "Exactman" হওয়া যায় আর কি! নিজের লেখাই পাঠ্য ছিল, তাহা ব্যতীত ছিল চাণক্য পণ্ডিতের সেই External "নীতি-সমুচ্চয়" কণ্ঠস্থ-করা! বিদ্যাভূষন মহাশয়কে ছন্দঃপাত ত্রুটিটা অত্যন্ত লাগিত। তখন তাহার বেতসস্ত্রের আগাত ভীষম প্রতধ্বনিতে গৃহ ব্যোমনাদময় করিয়া তুলিত। তিনি পড়াইতে বসিলেই, তাঁহার জন্য রেকাবভরা পান-সুপারি আসিত। সেই অভ্যাস তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেও তেমনই রহিয়া গিয়াছিল। তিন আমাকে বলিতেন, "তোমরা যে অভ্যাসটা ধরাইয়াছ, তাহার বন্ধন মুক্তি হইতে পারি নাই।'ত্ম তিনি সুস্থ এবং আয়ুস্মান্ পুরুষ; বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস করিতেন, এবং নব্বই বৎসরেরও অধিক বয়সে বিশেবশ্বযেরর পদতলে দেহমুক্ত হইয়াছিলেন। অধস্ম-অন্যায়ের বৃদ্ধিতে তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিকাল - বিবশ হইয়া পড়িতেন। সেই নির্ধন তেজস্ব ব্রাহ্মণের পৌরুষময় ত্যাগের এবং বিশুদ্ধ পরীতির কত পরিচয়ই পাইয়াছি! একদিন অশ্রুভরা চক্ষে আমাকে তিনি বলিলেন " আর সন্ধ্যা-পূজা করিব না; 'আমি'ই আছে! এই 'আমির কাহারও নিকট দায়িত্ব নাই!" কি সে মস্ম-বিদারী অভিযান! প্রত্যাখানের বিষয়টা কতখানি হৃদয়-জোড়া! কিন্তু এই তেজোবত্তা, এই উত্তপত্ত ফলগু-সিকতার নাতিনিম্নেই ছিল—শীতল প্রীতির প্রবাহ। পিতৃবিয়োগের পরে তাঁহার সান্ত্বনা - শীতল অঙ্কে কত শান্তি - শ্রুতি পুরাণকাহিনী শুনিয়াছি। কোন দিন শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছি। কচ্চিৎ কোন দিন জাগ্রত হইলে দেখিয়াছি, তাঁহার বৃহদায়তন চক্ষু স্রুপ্লাবিত, ঘনশ্বাসে বক্ষস্ফীত, তবু ছাপাইবার যত্ন-পরতার ত্রুটি নাই. বয়স্ক হইয়া যখন যে বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, কোন কথায় দ্বিধা মুক্ত হইতে অক্ষম হইলেই, তাঁহার নিকটে যাইতাম। Academic উত্তর তাহার নিকট কখনও পাই নাই। সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম। আমাদের মধ্যে কেহ বলিয়াছিল," মহাশয়ের ভাবনা যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের স্বাভাবিক প্রণালী ছাড়াইয়া গিয়াছে!" তিনি হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, " সে তোমাদেরই রুচির খ্যাতিরে, ব্রাহ্মণ- পণ্ডিতের ভাবনা বা ভাবদ্যোতনার ধারা হারাইয়া অব্রাহ্মণ হই নাই. মস্তক পরিবেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শ করিবার অভ্যাস একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি, তা নয়।" রাজসভায় রাজপুরীতে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রকৃতি যাহাই হৌক, সকলকেই রাজনৈতিক বিক্ষানটার ন্যূনাধিক অনুশীলন করিতে হয়। আবক্যকতার সহিত সফলতার সমাবস্তান, এখটা বিধাতারই ব্যবস্থার মধ্যে। এমন কথা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর নিকটে শোনা যায় যে, যে-বনে সবিষ সর্প প্রচুর পরিমাণে বাস করে, যেখানে অনুকূল মৃত্তিকা-বায়ুর সহায়ে বিষ-চিকিৎসার গুল্ম-লতাদিও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জন্মায়। যখন ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার অনুকূলে বায়বীয় অবস্থা আসিয়া দাঁড়ায়, তখন উচ্ছলিত পরিমাণেই ফসলও পাওয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য!

নিম্নস্তরের রাজভৃত্যের ও জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন-আলোচনায় রুচি এবং দক্ষতা একটা রহস্যেরই মধ্যে। বিদ্যাভূষন মহাশয় রাজদ্বারে পণ্ডিত-সমাজেরই অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু স্মৃতির ব্যবস্থার ভার হইতে রাজনৈতিক রহস্যের মীমাংসার চাপ যে তাঁহাকে অল্প পরিমাণে বহন করিতে হইত। তাহা বোঝা যাইত না। তাঁহাকে তদানীন্তন রাজমন্ত্রীর মন্ত্রনাগারে অনেক সময় উপস্থিত থাকিতে হইত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমস্ত-সংহিতা-হতি-সঙ্কলিত "রাজধর্ম্ম-সংগ্রহ" নামক পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার আর একখানি স্মৃতির ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল মাত্র, মুদ্রিত হয় নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুদ্রিত পুস্তকখানিও এখন পাওয়া যায় না।

আমার বিমাতাদিগের মধ্যে প্রথমা রাজমহিষী বা ঈশ্বরী রাজলক্ষ্মী মহাদেবী প্রসূতিকা ছিলেন না। পাঞ্জাব হইতে যে সকল ক্ষত্রিয়েরা পশ্চিম বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, জেলার ভাগে তাঁহাদের অধিকতর সংখ্যাই বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী। বর্দ্ধমান জেলারই তারাচাঁদ বর্ম্মন রাজলক্ষ্মী মহাদেবীর পিতা। তিনি কন্যাদান করিয়া ত্রিপুরার রাজধানীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের একজন প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। জাত-সন্তানা আমার গর্ভধারিনী, এবং অপর দুই জন রাজমহিষী। তাঁহারা তিন জনেই মণিপুর ক্ষত্রিয় বংশীয়া। ইহাদিগের মধ্যে এক জন্য বিমাতা প্রথমে কন্যা এবং পরে পুত্র সন্তান প্রসব করেন। লেখক তৃতীয় সন্তান। চতুর্থ, কন্যা সন্তান — অন্য বিমাতার গর্ভজাত; এবং পঞ্চম সন্তান, লেখকের সহোদর ভ্রাতা। লেখক ছাড়া সকলেরই ন্যূনাধিক অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ হইয়াছে।

এখানে অল্পায়ু জ্যেষ্ঠর কয়টি কথা বলিব। তিনি আমার কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরের বড় ছিলেন, এবং ১২৬১ ত্রিপুরাব্দের (বাংলা ১৩৫৮) সন) পৌষ মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অগ্রবর্ত্তিতার সাধারণ ক্রমিক গতি ছাড়াও তাঁহার চিত্তবৃত্তির উন্মেষের আর একটি সহায় ছিল— প্রতিভা। সুতরাং দুই কেন্দ্র হইতে এই দ্বিগুণিত বেগবল তাঁহাকে আমার অনেক পুরোভাগে চালিত করিত। প্রতিভাশালী ব্যক্তি নিত্যায়াসশীলতার দাসত্ব স্বীকার করেন না. এই বিশেষত্ব দাদার স্বভাবেও সুব্যক্ত ছিল। কণ্ঠস্থের কথায় কোন কালেও কর্ণপাত করিতেন না। সকল প্রকার সাধনার জন্যই আগামীকল্যের জন্য প্রতীক্ষায় থাকিত। আর শেষ মুহূর্ত্তে প্রবল আবেগের দুর্দ্ধর্ষ শাসনের নিষ্পত্তি— প্রতি কার্য্যেই দেখা যাইত। স্বীকৃত জড়তার সহিত অবিচ্ছেদ যত্নপরতার পোষাণি থাক্ বা না থাক্, আবেগটা দেখা যায়, প্রতিভার সুপরিচিত গতিশক্তি। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে দাদা সর্ব্বদাই কঞ্চির কলমে কলার পাতে চিত্রকলার অনুশীলন করিতেন. অনেক দিনের কথা, প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, একদিনের কথা মনে হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে দাদা সর্ব্বদাই কঞ্চির কলমে কলার পাতে চিত্রকলার অনুশীলন করিতেন। অনেক দিনের কথা, প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, একদিনের কথা মনে হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন "ঙ'র ফলাটা তোমার ছোট ভাইকে খুব সহজে বুঝাইয়া দেও ত। ভুল করিতে পারিবে না, দেখিও"। দাদা প্রথমে পাঁচটা বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলিতে ক্রমে এক দুই সংখ্যা বসাইয়া গেলেন। তারপরে আমায় বুঝাইতে থাকিলেন, "ক" হইতে সুরু করিয়া প্রতি

পাঁচটি বর্ণ এক দুই সংখ্যা-দেওয়া বর্ণের নীচে পর পর বসাইয়া যাও। এটা হইয়া গেলে 'য" হইতে ক্ষ, কেবল "র" ছাড়া সবগুলি "ঙ"র নীচে বসাও। আমি সহজে বুঝিয়া পাইলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কতক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, " আজ তোমাদের ছুটি।" এ অপূর্ণ একাদশ বর্ষ বয়স্ক শিশুর কথা! এ সকল কথা পিতৃদেবের কর্ণগোচর হইত। তখন বুঝিতাম না, কিন্তু দেখিতাম , তিনি প্রফুল্ল না হইয়া বরং করুণ নিশ্বাসই ত্যাগ করিতেন। অগ্রজ এবং কনিষ্ঠ সহোদর স্বপ্নায়ু হইবেন, তাহা গোপন করিতেন না। তাঁদের কথা উঠিলে পিতৃদেবের বিবর্ণ অধরোষ্ঠে নৈরাশ্যক্লিষ্ট আকুঞ্চন আসিয়া পড়িত। আমি প্রহেলিকার মত শুনিতাম, পিতৃদেবের সেই নৈরাশ্যক্লিষ্ট স্বর আমাকে নির্দ্দেশ করিয়াই রাতদিন বলিতেছে, " কে জানে, ওকি আমার দায় শুধিবে? "

বস্তুর অস্বচ্ছ পৃষ্ঠে সূর্য্যের প্রতিকৃতি পড়ে না, মুকুরেই পড়ে। সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত ভিন্নপ্রকৃতির যাবতীয় বস্তুতে আলোক মাত্র প্রতিফলিত হয়? মুকুরে সূর্য্যের বিম্ব সুস্পষ্ট পতিত হয়। তাই সেই সুস্পষ্ট বিম্ব হইতে কেবল আলোক নহে, উত্তাপও প্রতিক্ষিপ্ত হয়? হায় অকৃতী স্তান! তোমারএ মার্জ্জনাবিহীন মলিন মুকুরে পিতৃঋণের মাহাত্ম্য কেমনে বিম্বিত হইবে? অপসিদ্ধান্ত-চর্চ্চার আর অবহেলার অভ্যাসে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে! কেবল স্থূল আদান-প্রদানের মোটা সূতা কাটিয়া যুগযুগান্তর কাটাইয়া দিলে; এখন যে দিগ্বলয়ের অন্ধকার মাথার উপরকার আকাশ ছুঁইতে চলিল!— বৈতরণীর ফির্‌তি খেয়া নৌকার প্রতীক্ষা কালটা মাত্র হাতে!

আবর্জ্জনার ঝুড়ি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক— প্রিন্স, নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর।

পিতৃদেবের রাজত্বকাল ১৩ বৎসর মাত্র। তাঁহার রাজ্যভিষেক হইল ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দর মাঘ মাসে, এবং স্বর্গারোহণ হইল ১২৭২ সালের শ্রাবণে। সেই কালের মিলিত রাজ্য-জমিদারীর বার্ষিক আয়ের প্রায় আড়াইগুণ পরিমিত ঋণভার স্কন্ধে বহন করিয়া তিনি রাজাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভারই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজ্য-ভোগ তাঁহার হয় নাই। তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে শাসনভার ছিল বলরাম দেওয়ান সাহেবের হস্তে। মধ্যে ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব রাজ্যশাসন করেন, এবং পরিশেষে রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী এই কর্তত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাংসারিক প্রচলিত ব্যয়কে কম্‌তির দিকে নেওয়া সহজসাধ্য হয় না— তাই আয়ের পরিমাণ কমিয়া গেলে যে সঙ্কটের একমাত্র সমাধান থাকে কুসীদজীবীর হাতে। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বড় বড় ব্যাপার দূরে থাকুক, নিত্য ছোট ছোট ব্যয়ের জন্যও ত্রিপুরার রাজসংসারে উত্তমর্ণের শরণ লওয়া এক নিত্য ব্যপারের সামিল হইয়া গেল। ত্রিপুরার নৈতিক বায়ুমণ্ডল হীনতার এত নিম্নস্তরে নামিয়াছিল যে, রাজার আত্মীয় , স্বজন, এমন কি দাস-দাসীরা পর্য্যন্ত, রাজ-সংসারের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য শতকরা মাসিক ২৫ টাকা সুদ লইয়া ধার দিতে থাকিলেন। কেহ শুনিতে না চাহিলেও রাজার সম্মান বজায় যুক্তিটা তাহারা আওড়াইয়া নিতেন। এই প্রকার যুক্তি, উদ্বেগানুভূতি, এবং অতি তৎপরতার প্রবাহ বেশ কিছুকাল বহিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতে এই রাজ-জমিদারির রাজস্ব বাকি পড়ে, আর ত্রিপুরার আকাশ জুড়িয়া " গেল গেল" হাহাকার উঠে। পূর্বে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রেণী, বৃত্তি বা ব্যবসায় অভেদে রাজ-সংসারের উত্তমর্ণের গন্ডি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বড় বড় ঋণের টাকাগুলি প্রায়ই আসিত যুক্ত প্রদেশবাসী ধনী ব্রাহ্মণদিগের ঝুলি হইতে। এক এ সময় এই শ্রেণীর উত্তমর্ণেরা কেহ রাজদ্বারে, কেহ দেবমন্দিরে "ধর্ণায়" বসিয়া যাইতেন। তাঁহাদের টাকা পরিশোধ না করিলে জল পর্যন্ত তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। উপবাসী ব্রাহ্মণ দুয়ারে, ক্ষত্রিয় রাজারও আহার বন্ধ। অথচ রাজকোষ একবারে শূন্য;— কি বিষম সঙ্কট;

রাজসংসার ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ঋণ-সমুদ্রে নিমজ্জিত; দুর্নীতির স্রোতও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। ভঙ্গ-বিন্দুর (Breaking point) কাছাকাছি বিক্ষেপের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হইতেও ছিল তাই। কিন্তু কর্ম্মীরা তাহা জানিলেন না। তবুও তাহা তাঁদেরই কর্ম্মের পরিণতি এবং ইহা বিভিন্ন কর্ম্মীর দ্বারা একই দিকে চালিত হইতেছিল, অবশ্য সমচেষ্টিত ভাবে নয়। জমা দেওয়ার ভাণ্ডার দুইটি নয়। একটা ঐন্দ্রজালিকের অঙ্গুলি স্পর্শে যে এক অপ্রত্যাশিত

রূপান্তর ঘটিতেছিল, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।সেই দিন দৈনিক পূজার অব্যবহিত পরে পিতৃদেব একজন রাজকর্ম্মচারীকে দুই চারিটি অতি ক্ষুদ্র ব্যয়ের ভার দিতেছিল। সে ব্যয় কয় গণ্ডা পয়সা মাত্র। কর্ম্মচারী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া জানাইলেন, সেই সামান্য পয়সাও সেদিনকার তহবিলে নাই. পিতৃদেবের সম্মুখে তাঁহার গুরুদেব বিপিনবিহারী গোস্বামী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উপহাসের উচ্চ হাস্য তুলিলেন। রাজকোষের সম্পন্নতার শ্রী কয়গণ্ডা পয়সারও নিম্নে অবতরণ করিয়াছে! গোস্বামী মহাশয় একবারে অসম্ভব,অপ্রত্যাশিত এক কথা বলিয়া ফেলিলেন। সংক্ষেপে,—তিনি শিষ্যের রাজ্য পরিমিতকালের জন্য ধারে লইবেন, এবং অনাদৃতা লাঞ্ছিতা দেবী লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার শূণ্য পাদপীঠে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার জন্য উৎসর্গ আছে। সে হইল— কয় বৎসরের জন্য তাঁহার সন্ধ্যা-পূজা পরিত্যাগ। তিনি তাহা করিবেন। শ্রোতারা, বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়াও, উপন্যাসের মত এই বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন। প্রভুপাদ বঙ্গের গোস্বামীসন্তান; ভক্তি স্রোতস্বতীর খাত ছাড়াইয়া তাঁহার ভাবনার প্রবাহ অপর কোনদিকে চলিবার সুযোগ পায় নাই. সেই, অর্দ্ধশতাব্দীকাল আগে দৈবাৎ যাবনিক শব্দ জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িলে দশ বার হরিনাম। জপদ্বারা প্রাণাধার কোষের , অথবা ডাকের চিঠি হাতে ঠেকিলে পরিধেয় ত্যাগ করিয়া স্নান দ্বারা অন্নময় কোষের শৌচ সাধন করিতে হইত। সেই যুগে "শুচিব্রত," "শ্রবণকীর্ত্তনাদি," "সাধনা," " ভাব", এবং "প্রেম'ত্ব প্রভৃতি বহুলক্ষণা ভক্তির অনুশীলনকারী গোস্বামী ব্রাহ্মণের মুখে এই পাকা বয়সীর অঙ্গীকার অবশ্যই শোভা পায় নাই। পিতৃদেব যেন তাঁহার গুরুদেবের কথায় নূতন কিছুই পাইলেন না। কোন উচ্চবাচ্য হইল না। সেদিন রাত্রিতে গুরুশিষ্যে যে আলোচনা হইল, রাজবাটীর উৎকর্ণ প্রকৃতির দেওয়াল গুলি পর্য্যন্ত কর্ণে আঙুল দিয়া শোনা বন্ধ করিল। যাহা হৌক, আলোচনার পলের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রকার সুযোগ কাহারও জীবনে দুইবার আসে না। এবং বিধাতার লীলায়, ঠিক সময়টি না আসিলে ঠিক মানুষটি হাজির হয় না. পিতৃদেবের ও সেই প্রকার বিশ্বাস ছিল। পরের দিন আষাঢ় মাসের ১৬ তারিখ (১২৬৫ ত্রিপুরাব্দ) যথানিয়মে আদেশ প্রচার হইল, রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহন করায় রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী "কর্ত্তাপ্রভু" উপাধিতে পরিচিতি হইলেন। রাজগুরু'প্রভু,' এবং শাসনকর্ত্তা—"কর্ত্তা"! তখন পর্য্যন্ত শাসনকার্য্যের ভার ছিল ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেবের হস্তে। তিনি পিতৃদেবের সমবয়স্ক এবং কৈশোর সহচর। কেবল তাহাই নহে, সংস্কার, শিক্ষা, দর্শন এবং নিষ্ঠায় পিতৃদেবের অনন্যবৃত্তি ছিলেন। বলবান, উৎসাহশীল, উদ্ভাবন-দক্ষ হওয়াতে বাস্তবিক উচ্চদায়িত্ব বহন করিবার মত বহুগুণ তিনি ধারণ করিতেন। এইখানে পূর্ব্বকালের কথা আসিতে চায়। এই "ঠাকুরেরা' ত্রিপুরা রাজ্যের অভিজাত বংশ। ঠাকুর বংশীয়েরা শিষ্ট্যোক্তিতে সকলেই 'ঠাকুর'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠাকুর পদ আজিও কুলপরিচায়ক পদ্ধতিতে দাঁড়ায় নাই। ত্রিপুরারাজ্যে ইহা উচ্চ সম্মানের উপাধি। উৎসবপর্ব্বাদি বিশেষে, অতি প্রাচীন রীতিতে গন্ধ মাল্যাদি সহযোগে, রাজাদেশে যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যেমন Bay-tree বা Laurel- tree র পত্রদ্বারা বিজয়ীর শিরোভূষন প্রস্তুত হইত, এবং পরবর্ত্তীকালেও সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়া বিদ্যাবত্তার সম্মাদ্যোতনার্থ তাহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, ত্রিপুরা রাজ্যেও যুগযুগান্তর

অবচ্ছেদে সেই নিয়ম ঠিক ঠিক চলিয়া আসিয়াছে। সেই পত্র, সেই সূত্র এবং সেই প্রণালীর গ্রন্থি সবই বিদ্যমান— কোন পরিবর্তন চিরন্নত প্রথাটিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

বহুপূর্বে ত্রিপুর যুগের প্রভাতে, যখন ত্রিপুরার নরপতিরা দেশ ও সমাজ গড়িতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তারের সহায় ছিলেন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজারা, এবং ততোধিক ক্ষুদ্র সনাথ পল্লীবাসীরা। বলাবাহুল্য ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে একমাত্র প্রতিযোগিতা ছিল বাহুবলের। পশু মানব শক্তির মধ্যে বিশ্লেষণের রেখাপাত তখন সেখানে সুব্যক্ত নয় আর এই বাহুবলের প্রতিযোগিতাকে Survival of the fittest বা উদ্ভর্ত্তন বাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিলে তাহাকে স্থূলের দিককার একবারে নীচের ধাপে স্থান দিতে হয়। ত্রিপুরার নরপতিরা যেমন একদিকে রাজ্য রক্ষার জন্য এই শক্তির পরিচালনা করিতেছিলেন, তেমনি রাজ্যশাসন এবং ব্যবস্থাপনাদির জন্য একটি নায়ক শ্রেণীর ও প্রয়োজন অনুভব করিয়াচিলেন। ক্ষাত্র-ব্রাহ্মণ শক্তির মিলন ছাড়া দেশশাসন চলে না। এই পুরাতন সত্য, সমাজের আদি উষার যেমন, আজিকার এই বৈজ্ঞানিক মধ্যাহ্নে ও তেমনই রহিয়া গেছে। যাহাহৌক; এই শেষোক্ত শ্রেণী ত্রিপুরা নৃপতিদের অধিকতর-সমীপবর্ত্তী-পরিবেষ্টনীরূপে দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বাদশটি ঠাকুর পরিবারের মধ্যেই ছিলেন , যাবতীয় রাজ্য-শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষরা; এবং সেই সকল অধ্যক্ষতা ছিল, সাধারণ নিয়মে, বংশগত। নিয়মটি এত প্রাচীন ছিল যে, বাস্তব প্রয়োজন ছাড়া তাহার ব্যতিক্রম হইত না। ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব উক্ত দ্বাদশ বংশের অন্যতম বংশধর। তিনি প্রকৃতই রাজনীতিকুশল জননায়ক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁহার গুণবত্তা সুপ্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে, তখনকার প্রয়োজনের স্পন্দনের সঙ্গে তাঁহার উপযোগিতা বাস্তবিক প্রতিস্পন্দিত হইতেছিল না। বক্ষ্যমান বিষয়টা যোগ্যতার আবির্ভাব ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন মূলক নয়। যোগ্যতার ডাক পড়িয়াছিল, ক্ষেত্রের প্রয়োজনে। তদানীন্তন অবস্থাকে যদি সদ্যধৃতক ক্রুদ্ধ বন্য ভল্লুক কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার নাকের দড়ি টানিবার যে ক্রীড়ক চাই, সেই ক্রীড়কই ছিলেন রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী। রাজা হইতে শুরু করিয়া রাজ্যের যাবতীয় লোকের গেঁজিয়ার রশি যেন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীর মধ্যে স্থান পাইয়া গেল। প্রবৃত্তিনিবৃত্তি— যেখানে যেটার প্রয়োজন, সেইটাই সেই খানে তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া উঠিল; স্বতঃ সঞ্জাত নাই হইল। ফলের পরিচয়ে কোন গোলমাল থাকিল না। অশ্রুজলের তাড়নায় অভিসম্পাতের হনে, ভয়ের বিকারে, কদাচিৎ প্রেমের প্রেরণায় রৌপ্য মুদ্রাগুলি অভেদে চিত্তহারী নিক্কণ তুলিয়া কোষাগারের শূণ্যগর্ভ লৌহময় আধার অধিকার করিতে থাকিল। কর্ত্তা প্রভু গুরু-লঘু অভেদে যাবতীয় রাজকার্যের আলোচনায় ব্রযমোহন ঠাকুর সহেব এবং গুরুদাস মুন্সীর সাহায্য ত্যাগ করিতেন না। ঋণ-শোধের পালার আরম্ভে বড় বড় উত্তমর্ণেরা কর্ত্তা প্রভুর মুখে সুস্পষ্ট কথা শুনিলেন—ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে একতাল যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহার ব্যয়ের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঋণরাখা চলিতেছে না, যে হেতু এখানে বিকার আসিয়া পড়িয়াছে। বিকার কাটিয়া গেলে, যাঁহারা সুদের মোহ এড়াইতে পারিবেন না, কর্ত্তাপ্রভুর মুষ্টির ভিতরে তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট স্থান থাকিবে। কেননা ঋণের প্রতিষ্ঠান নিয়া কোন বিবাদ নাই। তাহা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। বিবাদ বাধিয়াছে

কেবল ঋণদাতারা সংযম হারাইয়াছেন বলিয়া! প্রস্তাবটা শ্রোতার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' পশিয়াছিল অবশ্যই; এবং 'প্রাণ' যে "আকুল" করিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ ছিল না। প্রভেদ কেবল "আকুল"-কারী রসের। এমন অনুপাদেয় রূপান্তরটা একবারে বাস্তবতার ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু "ভবিতব্য ভবেত্যেব"। অবশ্যম্বাবীর সঙ্গে বিবাদ চালান যায় না। ঋণ-শোধের সত্বরতার বিদ্যমানে উত্তমর্ণের 'প্রাণ-বর্জ্জনের' অতিতৎপরতা পূর্ব্বে কখন প্রদর্শিত হয় নাই; অর্থাৎ নজিরের দ্বারা বিষয়টা একেবারেই গড়বন্দি করা নয়! সমস্যার কিনারা ধরিবার পথে সমাসীন উত্তমর্ণদিগের পশ্চাৎ পঙ্‌ক্তি হইতে নিশ্চয়াত্মক স্বগত ভাষণ শোনা গেল যে, ব্রিটিশরাজ্যের স্বল্পবৃদ্ধি-বাহিনী " পরমেশ্বরী" পত্রিকা ত্রিপুরায় চালাইলেও কাল পাত্রের হিসেবে উত্তমর্ণেরা প্রয়োগপবেশনের পথ ধরিবেন না। যদিও সত্য কথাটা সনাতন-ধর্ম্ম-সম্মত হয় নাই, তাহার ফল পাওয়া গেল সদ্যই। ভেদবিলোপী কলি-মাহাত্ম্যে তাহার আস্থা না থাকিলে, লোকটা পুরোবর্তী আসনাসীন দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ও তিওয়ারী ব্রাহ্মণগণের জ্বালাময় দৃষ্টির শরব্য হইবার লোভ সম্বরণ করিত। কর্ত্তাপ্রভু "মধুরে শেষ" করিতে যাইয়া পুরাতন কবিতা আওড়াইলেন— " যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্"। উত্তমর্ণেরা কেহ টাকা পাইয়া, কেহ প্রভুর মুষ্টির মধ্যে স্থান পাইয়া কথার মীমাংসা করিলেন।

দুশ্চিন্তাকাতর ক্ষুদ্রবুদ্ধিজীবীরা জানিলেন যে, কর্ত্তা প্রভুর খেয়ালের বিষম বিপ্রকর্ষের পড়িয়া তাঁহাদিগের বার্ষিক শতকরা তিনশত তঙ্কা নিরিখের সুদ একেবারে দ্বাদশ মুদ্রায় অধোগমন করিয়াছে, যদিও সপরিষৎ কর্ত্তা প্রভু সেই সংবাদ পান নাই। যাহাহৌক, সেই শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণপত্রগুলির হাত বদলে অত্যন্ত সত্বরতা পড়িয়া গেল। তাহারা ঘাতসহ স্থূলচর্ম্মীর আশ্রয়ে চলিয়া গেল, তাহা বলাই বাহুল্য। কর্ত্তা-প্রভুর অন্তত একটা কৃতিত্বের কাহারও দ্বিধা ছিল না; সে হইল তাঁহার মধুরামধুর ভাষণে তুল্যরূপ ক্ষমতা। যাঁহারা নিতান্ত অদৃষ্টের দায়ে পড়িয়া নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইয়া তাহার স্বাদ প্রাপ্ত হইতেন, এমন একটা তন্ময়তা তাহাদিগকে পাইয়া বসিত যে, এক সময়ের ওঝাগিরি ছাড়া, তাহাকে ছুটান শক্ত হইত।

বাস্তব-জীবনে এই প্রকার কাব্যসুলভ বিচার সচরাচর ঘটিতে দেখা যায় না। সেই জন্যই প্রস্তুত হওয়ার অবকাশও থাকে না। যাহা হউক, সৌভাগ্যবশত ঃ যদিও এই প্রকার ঘটনা সর্বদা পাওয়া যায় না, তবুও এইমাত্র আরম্ভ! শেষ কোথায়, কে জানে! কেবল উত্তমর্ণদিগের সম্বন্ধে এই । যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সাবকাশ ছিলেন, তাঁহাদের চক্ষে একটা সুব্যক্ত ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। ব্যয়ের গলায় ফাঁদ আঁটিয়া কলসীর উদরে আয়ের স্থান করিলে দড়ি, কলসীরই বীভৎস ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিপুরারাজ্যে কর্ত্তা-প্রভুর রূপবর্ণনা এবং অঙ্গচালনার বিদূষেকোচিত অনুকরণ ছাড়া কাহারো জাগরণকাল অন্যথায় কাটিত না। ইহার সহিত Disrael বর্ণিত Silhouette র " Silohouette was Minister of State in France in 1759. That peirod was a critical one. The treasury was in an exhausted condition, and Silhouette, a very honest man, who would hold no intercourse with finaciers or loan mongers, could contrive no other expedient to prevent a national bankruptcy than excessive economy and interminable reform. Paris was

not that metropolis wher a Plato or a Zeno could long be Minister of state, without incurring all the ridicule of the wretched wits. Al first they pretended to take his advice merely to laugh at him. They cut their coats shorter, and wore them without sleeves; they turned their gold snuff boxes into rough, wooden one; and new fashioned protraits were now only profiles of a face traced by a black pencil on the shadow cast by a candle on a white paper. All the fashions assumed an air of niggardly economy, till poor Silhouette was driven into retirement, with all the projects of savings and reforms, but has left his name to describe the most economical portrait,and melancholy s his own life". Disrieli জীবনচিত্রের কতক সাদৃশ্যআছে। কিন্তু যে কাল হইতে ত্রিপুরারাজ্য শাসন স্থায়ীপদ্ধতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, তখন হইতে শাসন বিভাগের সর্বত্র ত্রিপুর-সন্তানেরই স্থান ছিল। দফ্‌তরি হইতে প্রধানমন্ত্রীর কার্য্য তাঁহাদেরই হাতে পড়িত। এই নীতির ব্যতিক্রম একদিনে আইসে নাই, আর সে অনেক দিনের কথাও নয়। ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড হইতে স্থাবর-জঙ্গ-মাত্মক সমস্ত সৌর জগতের গোটাভাবটা একটা সৎ-পদার্থের মহাবন্ধনী শক্তিতে বজায় থাকে। স্থূল-সূক্ষ্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে জড়াইয়া এই Coherence শক্তির খেলা চলিতে থাকে। পর্য্যায়টার ব্যতিক্রম হয় এই শক্তির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে। মহাশক্তি তখনও নিষ্ক্রিয় নয়, কিন্তু সেই চল্‌তি তখন বিশ্লেষনের অভিমুখে—ভাঙচুরের দিকে। এই বন্ধন কালের পরে ত্রিপুরায় এই পর্য্যায়-পরিবর্তনের পালা পড়িয়া গেল। (ক্রমশঃ)

APPENDIX NO. V.

Extract from the Judgment of Mr. F. C. Vowel Esq. Judge of Tipperah, in suit No. 35 of 1874, dated the 27th February, 1875.

Original suit No. 35 of 1874.

Raj Kumar Nobodwip Deb ... ... *Plaintiff.*

versus

Maharaja Bir Chunder Manikya ... ... *Defendant No.1,*

Radha Kishore Thakoor and eleven Others ... *Co-defendants.*

For the Plaintiff–Mr. Montriou, Barrister, Hari Mohan Guho, Pleader, Kaliprasanno Sen and others, pleaders.

For the Difendant–Mr. Paul, Advocate General, Mr. Piffard, Barrister, Girish Chunder Banerjee, Mohini Mohan Burdhan, government pleader, and others, pleaders.

Suit to establish right of inheritance to, and to obtain possession of, Chukla Roshnabad and other landed interests in certain talooks, resumed rent free lands, &c., in the districts of Tipperah, Sylhet and Noakhally. To cancel and annual the illegal acts of defendant No.1, such as the appointment of Juboraj, & c., and for mense profits, laid at Rs. 43,83,872–5–1.

The Plaintiff in this suit is the son of the late Maharaja of Independent Hill Tipperah, Ishan Chunder Manikya, who died in 1862. The defendant Bir Chunder Manikya is the whole brother of the said Ishan Chunder, and succeeded him on the Gaddi on the ground that the said Raja, the day before he died, had appointed him Juboraj; and it is to set aside this alleged appointment of Juborajship on the alleged ground of fraud and collusion, that this suit has been brought, the plaintiff alleging that he is by right of inheritance the lawful Raja, as being at the present moment not only the only son, but the legitimate son of the late Raja Ishan Chunder Manikya, and that, but for this fraud and collusion, he would have been his father's successor on the throne. The defendant contends that there was no fraud or collusion; that he was duly and legally appointed Juboraj by the late Raja Ishan Chunder; that if this were not so, the plaintiff could not succeed, inasmuch as he is not the legitimate son of Ishan Chunder, and therefore neither by Hindu law nor family custom could he have inherited the throne.

He also contends that he has successfully contested his present position against his half-brother Nilkrishna, through the High Court and Privy Council, in which case the present plaintiff was represented by his mother Juteshwari, and his two step mothers Rajlukhi and Chundreswari the two

surviving Ranis of the late Raja, and that therefore the present claim is res-judicata and cannot lie.

He, moreover, contends that this court has not jurisdiction to try his right to the property in this district inasmuch as the same is part and parcel of his territory, which he holds as Raja of Independent Tipperah; that the said property has always belonged to the said Independent Tipperah; and that in order to determine his right to the property claimed, it is necessary to try the right to the throne–a question over which this court has no jurisdiction.

The above are the principal questions calling for consideration. There are two other issues, however, which it will be as well as once to dispose of namely, the one relating to limitation and the other to Champarty.

As regards the former, it has been simply stated but by no means pressed, that the six years' law of limitation prevails, inasmuch as the suit is one to set aside a Juborajship, and that, as there is no particular limitation which applies clause 16, section 1, of Act XIV of 1859, must prevail, and that as the plaintiff, according to usage of Independent Tipperah, came of age at 16 and not at 18, his claim is barred. As I have just stated, this has not been at all pressed, and no evidence has been adduced as to the alleged custom. This question, moreover, must depend in a great measure on that relating to jurisdiction; for if this Court has jurisdiction, both parties must be looked upon as simple zamindars within the British Territory, and therefore this being simply a suit for ejectment, the twelve years limitation rule will apply.

Turning to the latter question, it may simply be stated that Champarty does not apply to the Courts in India.

Before proceeding further, it may be as well to give a short history of the circumstances which have given rise to this suit.

Ishan Chunder Manikya was for many years Raja of Independent Tippearh, and while such, he was also in possession of the property now in dispute within British Territory. He succeeded to the throne, as having been appointed by his father Juboraj. He cohabited with many women, amongst whom we have only four with whom we have anything to do in this case. Their names are Rajlukhi, Mooktaboli, Chandreswari and Juteswari. The three first were the admitted legal wives of the Raja legally married according to the prevailing marriage ceremonies. The last, the mother of plaintiff. It is contended, was not married under any form whatever, and her issue have no rights of legitimacy. With the exception of Mooktaboli no woman but Juteswari appears to have borne him any children either amongst his Ranis or his concubines. Mooktaboli bore him one son, Brojendro, and Juteswari bore him two sons, the plaintiff and his younger

brother Rohini. All these three children were minors at the time of their father's death, and Mooktaboli, the mother of Brojendra, was dead. By right of inheritance Brojendra, as the acknowledged legitimate son of Ishan Chunder, was the heir to the throne; but Bir Chunder Manikya, the whole brother of Ishan Chunder, succeeded on the ground of his having been appointed Juboraj the day before the late Raja died. Almost immediately after this, the half brother of Ishan Chunder, but senior in age, Nil Krishna, instituted a suit in the Civil Court of Tipperah to contest the right of Bir Chunder, urging that the alleged appointment of Juboraj was never really made, that it was only an act of fraud and collusion between the present Raja and the Guru Bipin Behari and others, and that as he was senior in age, he had a right to the property according to the prevailing custom. The suit was tried by the then Principal Sudder Amin Juggobundhu Banerji, who, considering that the appointment of Juboraj has not been proved, gave a decree to Nil Krishna on this ground, and on the ground that he, as senior in age, was entitled to succeed. Against this, Bir Chunder appealed to the High Court, which reversed the decision of Juggobundhu Banerji, and dismissed Nil Krishna's suit. Nil Krishna then appealed to her Majesty's Privy Council, but was unsuccessful in disturbing the decision of the High Court. In consequence of this, Bir Chunder, the present Raja, applied to the British Government to be duly installed and acknowledged as *de-jure Raja.* This request was complied with, and in 1870 the Commissioner of the Chittagong division, Lord Ulick Browne, by order of the Government, proceeded to the capital of Independent Tipperah, Agurtola, and duly installed the present Raja on the guddi.

Soon after this, the present Raja appointed his son Radha Kishore Thakoor to the post of Juboraj. This seems to have given great offence to the present plaintiff, as he considered that he had a prior claim to the appointment, as his brother Brojendro, who had been appointed Bara Thakoor by his father Ishan Chunder, was dead, and he had himself been at the same time appointed Kurta, and that according to family custom the Juboraj succeeded to the Raj, the Bara Thakoor to the post of Juborajship, and the Kurta to that of Bara Thakoor; and that when Brojendro died, he became in reality Juboraj, the post which his brother had succeeded to when Bir Chunder, his uncle, became Raja. The appointment by the present Raja of his own son, it was thus contended, was not according to the family custom and could not be made in the lifetime of the plaintiff, who was made Kurta, by the late Ishan Chunder. That this was then the private contention, can be gathered from a letter which the plaintiff himself wrote to the Commissioner on the 9th July 1870. This letter will be duly considered hereafter. This appointment by Bir Chunder appears not only to have given

great offence to the plaintiff, but to have created a division in the royal house-hold, not only amongst the members of the royal family, but amongst their retainers and attendants, some siding with one party, some with the other. The mother of the plaintiff and his two step mothers, Rajlukhi and Chundreswari have taken the part of the plaintiff, and have together with some few others now taken up their above with him at Comillah, the station of the district of Tipperah. His mother Juteswari accompanied him when he was, as he alleged, obliged to leave Agurtola some four years ago in consequence of the oppressive acts of his uncle, and the other two ladies have come since this suit was commenced. The above will be sufficient for the present, and shows the relative positions of the plaintiff and defendant at the time, and for sometime previous to the institution of this suit.

Before passing on to the merits of the case, I will first consider the question of jurisdiction, and then that of *res-judicata*. It has been contended by the Advocate General Mr. Paul, that this Court has not jurisdiction to try which party has a right to the property in British Territory, inasmuch as to enable the Court to determine this right, it must try and determine the right to sit on the throne of Independent Tippearh, and which this court not only has no jurisdiction to try, but could not enforce its decree in case the plaintiff should be successful. He denies that the Raja is in any way a British subject, or that his holding possession within British Territory in any way constitutes him a British subject. He moreover, contends that the property in British Territory cannot be looked upon as distinct from that which forms the area of Independent Tipperah, but that it has always been a part and parcel of the same; and he fortifies this contention by the decision of the Privy Council passed on the appeal of Nil Krishna. He says that strong inferences can be drawn from that decision, plainly showing that their Lordship's opinion would have coincided with his own, had the case been submitted to them in a different shape.

Now I have carefully read the decision of the Privy Council, and I cannot see that such inferences are to be drawn from it as Mr. Paul would impress upon the Court. Their Lordships remark at the very commencement of their judgement thus:–"The Raja of Tipperah, though in respect to these lands subject to the laws and Courts of British India. Is in fact an Independent Prince, with considerable territory known as the Tipperah Hills, and as the title to the Zamindari and to the Raj is the same, the dispute respecting the former involves a question of right of succession to the musnud, or throne of the Independent Principality." The above does not only support Mr. Paul's contention, but appears to me to set forth that, in the opinion of their Lordships, the Raja is a subject of British India, in so far as the territory which he holds within British territory is concerned.

They especially state that he is subject to the laws and Courts of British India. They go even further than this, and say, 'As the title to the Zamindari and to the Raj is the same, the dispute respecting the former involves a question of right of succession to the musnud." They do not say that this is a state of things wrongly created, but they speak of it as a state of things which cannot be disputed, indeed, as an admitted fact. When Nil Krishna instituted his suit, the present defendant did not challenge the jurisdiction of the Court to determine his right to either the lands in British territory or the musnud, and his having done so in this suit is a new feature, and-no doubt, founded on his installation on the throne by the Indian Government. How far this acknowledgment of the defendant as *de-jure* Raja can affect his stability on the throne in case of decree being given against him in this suit, it is not for this Court to consider. This would be altogether a political and not a judicial questions. Should the plaintiff be entitled to a decree for the lands in British territory, the Raja defendant may say to him, "very well, you take the Zamindaris and I will keep the Raj you cannot enforce your decree against me as far as the possession of the throne is concerned and the lands comprising Independent Tipperah, and I do not intend to give them up.' The Raja might very well say this, and of course, our court could not interfere in any way. The determination of the question of title to the throne would, so far as this court is concerned be only an incidental one, affecting the right to the lands in British territory only, and which part of the decree I am of opinion this Court would have full power to enforce. The Raja, I consider in every way a subject of British India in regard to these lands. He pays revenue to Government and in the event of this payment failing his property would be put up to public auction, and sold the same as those of the lowest zamindar, not by any special action of the Indian Government, but under the ordinary rules and regulation in force.

The Privy Council then go to say:–"The respondent Bir Chunder has been acknowledged by the British Government as *de-facto* sovereign of Tipperah; but this acknowledgment has been regarded in the Court below as determining nothing more than his present and actual possession of the throne; and their Lordships will deal with the question between the parties as if the litigation were between two ordinary subjects of the crown upon a disputed title to land within the jurisdiction of the Indian Court." From this I do not think that any inference can be drawn, that their Lordships considered that this way of dealing with the question was in any way forced upon them by the action of the Lower Courts, or that it was in any manner a wrong way of dealing with it. In fact, it appears to me the best way of so dealing with it. As far as the lands within British territory are concerned, the Raja cannot be considered in any other light than as a

zamindar subject to all the laws and Courts of the Country within which he holds such lands, and this appears to have been always the position in which the Raja of Tipperach have been held.

The judgement certainly further on states:–"This contest is in truth a contest as to the title to reign a matter rather of state policy than one proper for judicial decision." This cannot be disputed; and even in the case of the plaintiff obtaining a decree in this suit, it may be a question of state policy, whether the present defendant would be deprived of his seat on the throne. It might be that the Government would not revoke its acknowledgment of the present Raja as *de-jure* Raja, and set aside its installation. For although the acknowledgment and installation were based on the decrees of the Civil Court of India and the Privy Council, still it would be a matter of state policy whether the Government would be in any way influenced by any adverse decision at the present time. But with this, as I have observed above, this court has now nothing to do. It has only to decide the title to the zamindaris, and in order to do this, it must incidentally try and determine the title to reign. It is no doubt, a very anomalous position for the parties to be in; but we must have taken matters as we find them. There can be no doubt that had the Privy Council differed from the decision of the High Court in the case of Nil Krishna, their Lordships would not have been deterred from passing such a judgment as would have deposed the present Raja and placed him on the throne, by any apprehension that they would have been acting without jurisdiction in so doing.

From what the learned counsel Mr. Piffard said when addressing the Court after Mr. Paul's departure for Calcutta. I fear I may have somewhat mistaken the real meaning of the Advocate General's argument. Mr. Piffard contends that although the Raja of Independent Tipperah is in every way a subject of the British Government, in so far as the lands within British territory are concerned, this does not give the Civil Court jurisdiction to try who shall be the Raja, that the lands within British territory are an appendage to the Raj, and that whoever is the Raja for the time being, is in every sense and must be treated in every way as the zamindar of Roshnabad. The lands within British territory are not the private property of the Raja, but belong to whoever may be for the time being the Raja of Independent Tipperah. Under ordinary circumstances, there would be some force in this argument; but this is not the state of things which has even, as far as I can find out, been the recognized status of any of the Rajas of Independent Tipperah, or one which they themselves have ever put forward, but the contrary. They have not only never before disputed the rights of the Civil Courts to try the title to the zamindaris, but have always admitted this right; and however adverse the state of things may be to the ordinary relationship of independent states, I am of opinion that, after our Courts

including the highest as well as the lowest, have, with the concurrence of the parties themselves, adjudicated on this right, it is now too late to contest their jurisdiction.

A few words will dispose of the argument that this court has no jurisdiction to pass a decree that will in any way interfere with the present Raja's installation by the British Government, that having been an act of state. To meet this, it will suffice to state that that act on the part of the Government was not one of state policy independent of the actions of the Tipperach Courts, the High Court and the Privy Council, but one wholly based upon the decisions of the two latter Courts. These Courts had pronounced the present Raja to be the rightful Raja, and, therefore, at his request, the Government ordered him to be installed. It was simply following the decision of the Courts and nothing more, and so far from, as it is now contended, this act on the part of the Government in any way interfering with or restricting the action of the Courts, it ratified them, and, as it were, put its seal upon their jurisdiction by showing that it was ruled by their decrees.

While upon the subject of admissions, I may as well dispose of the letter dated the 9th July 1870, written by the plaintiff to Lord Ulick Browne, the Commissioner of the Chittagong Division, and upon which so much stress has been laid by the learned counsel for the defence. In this letter the plaintiff set forth before the Commissioner his rights to be appointed Juboraj by the present Raja, on the ground that he was appointed Kurta by his father, and therefore, after the death of his elder brother Brojendro, who had been appointed Bara Thakoor, he was entitled to succeed to the Juborajship, which post his brother held after the present defendant became Raja . In this latter he does not lay any claim whatever to the Raj, but admits that the present Raja was appointed Juboraj by his father Ishan Chunder, but claims to succeed to the Raj on the death of his uncle the present Raja, and states that it has always been the custom of the royal family of Hill Tipperah, that the Juboraj succeeds to the Raj, the Bara Thakoor to the Juborajship, and the Kurta to the Bara Thakoorship. He therefore goes on to say that the present Raja has appointed his own son Juboraj and thus "cheated him in every way". It appears clear that up to that time he had been looking forward to be Juboraj, and so succeeding to the Raj on the death of his uncle the present defendant; and though under his circumstances at that time he was content to have it so still this would not have lessened whatever title he may have had to the Raj, or considered that he had. Being then without any means of instituting a suit for the Raj, it is quite natural that he should have been contented with the Raj in prospect; and even when writing to the Commissioner to intercede, it is equally natural that he should then have confined this prayer to the

appointment of Juboraj; and if as he then contended, he considered his right to have been based upon having been appointed Kurta by his father, he must have also admitted the appointment of the defendant as Juboraj, for if these appointments have been made, they must have been made, as alleged, on the same day and at the same time. He must have been at the time very young, and therefore much influenced subsequently by what he heard, and probably seen induced to believe what he heard respecting the appointments, but this would be no bar to his subsequently contesting his title, after he had been led to believe that no such appointments had ever really been made. If he really believed that they had not been made when he wrote the letter, it was very wrong of him to state that they had been, but a falsehood to favour the claim which he at that time made, though inexousable, cannot be punished with the forfeiture of any title which he may have, or be a bar to his using for such. He admits that the letter is in his handwriting, but tried to get rid of its effect by explaining that the subject– matter was not his own, and that he merly wrote according to a Bengali draft which had been drawn out for him. In his deposition Nabadip says;"I recollect writing a letter after the coronation, when I was kept in confinement. The wife of Brojo Mohun Thakoor's brother came to the "undur," on a certain day, and I then told her to ask Brojo Mohun whether it was proper to keep me in confinement, after deriving so much benefit from my fathr. The woman was very much trusted by Brojo Mohun. she went to her house and returned to the"undur" after a few days, and told me privately that Brojo Mohun Thakoor had not advised Bir Chunder Bahadoor to keep me in confinement. He might have been advised by other officers. Brojo Mohun is very sorry that you are kept in confinement. He told me to tell you to sent a trustworthy man to his house on a certain night, and he would give you the best advice. I accordingly sent Koilas to his house on the following night. Koilas went there accordingly. Afterwards he sent me an English draft of a letter, and informed me by note that this is a translation of a Bengali draft, given by Brojo Mohun Thakoor, and that Brojo Mohun told him that Raj-kumar has no other remedy but to sent this letter to the Commissioner. If this be sent to the Commissioner, he will able to obtain release and the Juborajship. I accordingly copied out the English draft and sent it to Koilas to be forwarded to the Commissioner. I though Brojo Mohun had done what was good for me." Now all this may have happened just as related above, but even then this explanation does not relieve the plaintiff or any of the responsibility which attaches itself to him in regard to the contents of that letter. Whether it was drafted out for him, as he says, and which I do not believe, he must have understood, the meaning of every word that he wrote and how each applied to the

circumstances of his case . However, I think I have said enough on this unfortunate letter, and will now remark on the plaintiff's memorial to the Bengal Government. And the remark may be simply this that, what has been said upon the letter to the Commissioner will mainly apply to the memorial. The Government refused to interfere with the appointment made by the present defendant of his son as Juboraj. This was, however, a matter of state policy only, and did not in way bar the action of the Civil Courts.

* * * * * * * * * * * * * * *

Now let us turn to the status of Nabadwip himself, and the light in which he was looked upon as a member of the royal family, and see how they bear upon the question of legitimacy.

From a letter of Lieutenant J. M. Graham, dated the 10th of August 1861, to the address of the Commissioner of the Chittagong Division, the original of which has been forwarded to this Court from the office of the Bengal Government, we find that the late Raja Ishan Chunder was very anxious to appoint his sons as his successors, Lieutenant Graham was deputed as a special mission by the Bengal Government to the then Raja of Hill Tipperah, and in his report he says in the 6th and 7th paragraph,–"I would now beg to be permitted to allude to a subject which although not directly mentioned in my instructions, still bears close affinity to them,–I mean the method of Government at present pursued by the Maharaja of Hill Tipperah, and the appointment of Juboraj. On my first meeting the Raja and without wanting to hear what I had to say, he at once commenced talking of the appointment of Juboraj and Bara Thakoor, and expressed a wish that such should not be forced upon him for at least the next three or four years. By further conversation he evidently intended to lead me to believe that his intention was to appoint his sons at the end of that time to the exclusion of the Thakoors Nil Krishna and Bir Chunder, the present claimants, for the respective appointments, as he considered the Thakoors unfit to hold them. Whether these are the Maharaja's real thoughts , it is difficult to say; but I am inclined to think, that his real intentions are the eventual appointments of his own sons, and the retaining in power of the guru who would be certain to be expelled from the Government on the appointment of the Thakoors." Now this document, or rather the quoted extracts from it, standing alone, would be worth nothing; but it is so far significant as showing that the late Raja would not have alluded to " his sons" as succeeding heirs, if Nobodwip had not been entitled to inherit; for there were no other sons but Brojendro and Nobodwip, to whom the Raja could have then referred as wishing to appoint Juboraj and Bara Thakoor; and if Nobodwip had been appointed Bara Thakoor he would

have gained the first step to the throne, and would have succeeded to the Juborajship on his brother Brojendro ascending the throne.

Looking again to Nobodwip, as he advanced in age we find that he was treated with much distinction by members of the family, and was indeed regarded pretty much in the same light as Brojendro was. We find them studying together under same tutor, and when the present Raja visited Commilla after the death of Ishan Chunder, we find him bringing the two boys with him, and introducing them to the authorities. We find also from evidence which I think is trustworthy, that Nobodwip did perform the annual *shradh* of his father, and his elder brother Brojendra Chunder. Even if he had not performed the *sapinda-karan* of his father, when his brother was attacked with cholera a few hours before his death, this alone would not entitle him to succeed but it is very irreconcilable with his having been considered illegitimate.

Certain letters written by Brojo Mohun Thakoor to the Dewan Gurudas Roy while in Calcutta when looking after the appeal preferred against the decision of the Civil Court herein favour of Nil Krishna, and also other letters written by Ram Manikya Barman to the same dewan, together with letters written by the late Mr. Campbell the manager on the part of the Raja, have been put as evidence of the light in which Nobodwip and his mother were considered by the writers of these letters. They are not of much significance, and standing alone would be worth nothing. I have no reason to believe that these letters are not genuine, and in them the Iswaris are referred to as appellants and the minors as Raj Kumars. There are also other letters alleged to have been about the same time written by the present Raja himself to Annund Behari Sen. the tutor of Brojendro and Nobodwip. These letters were shown to the Raja when his deposition was taken, and he denied the signatures and also the letters themselves. I must say that I think the Raja was not telling the truth when he denied these letters. They bear his usual signature and are not letters which it would have been worth while to forge. They are naturally written, and if forged, would have been full of much stronger expressions in favour of the plaintiff than are found in them. Moreover, if forged, they would not have been so numerous. There would have been no use forging a lot of letters when one or two would have answered the purpose much better. There is one letter marked (E) which shows that Nobodwip was being educated along with one of the present Raja's sons. These letters as I have said before, would be quite valueless if standing alone, and are only significant in so far as they show that Nobodwip was treated with consideration by the family and the present Raja himself.

For the above reasons I give the eighth issue also in favour of the

plaintiff, and hold that he is entitled to the property claimed by right of inheritance.

We now come to the 9th issue; Did the defendant No. I obtain the property in suit by fraud, deception and collusion, or was he the right ful heir of Ishan Chunder, and was he appointed by him as Juboraj and when he was in his proper senses?

That he was not the rightful heir of Ishan Chunder has been decided by the judgment on the eighth issue, for it has not been denied that if the present plaintiff was legitimate and there had been no appointment of Juboraj, he would then be entitled to the property by inheritance. It must, therefore, be considered whether there was an appointment of Juboraj really made by the late Ishan Chunder Manikya, and in support of which we have a very great deal of positive evidence, evidence that has stood the test of the Highest Court in this country, and that of Her Majesty's Privy Council, I am well aware, as contended by Mr. Montriou, that neither the judgment of the High Court in Nil Krishna's case, nor that of the Privy Council is in any way binding on the present plaintiff or this Court, though they have been put in as part of this case. I have already overruled the argument of the Advocate General and I am sure with all due deference to that able Barrister, that the decision of the Privy Council was a final one as to the appointment of Juborajship, or that their Lordships intended that that decision was for ever after to be considered as a decision in rem; but when a great portion, if not the principal portion of the evidence , is the same as in the last case, it would be highly presumptions in this Court not to pay some respect to the opinions of two such high tribunals, which have been based upon the same evidence which this Court is now called upon to consider. To get over the appointment of the Juborajship must have always appeared to the plaintiff and his advisers as almost insurmountable, and they must have been well aware that until they had got over this obstacle, no decree could be passed in favour of the plaintiff. For it is the custom of the family, and has been so far many generations, for the person appointed Juboraj by the reigning Raja to succeed him; the only condition binding on the Raja of Hill Tipperah being, that the person so appointed shall be legitimate. Now in this case the positive evidence of respectable witnesses, whom without very clear evidence the Court would not brand as wilful *per jurers* is overwhelming. Even if we exclude the depositions of those witnesses who have died since they gave their evidence in the former suits, and which, it has been contended by they earned counsel Mr. Montriou ought not to be admitted inasmuh as the present plaintiff was not properly represented in that suit, the evidence in the present suit is such as the plaintiff could not have really thought could be set aside, and

which he must have known would be forthcoming. As regards this issue, the plaintiff is in the position of the defendant, Under the eighth issue, each has to prove that no Juboraj was appointed, and this, in the face, as I have said before, of a great mass of positive testimony; and he has entirely failed in this respect. No one can read, unless blinded by prejudice, the remarks of the High Court and the Privy Council on the evidence in the other case, and which has been re-produced in present suit, without seeing how appropriate they are: and if so in the other suit, they must be euqally so in the present case, as the plaintiff has entirely failed to rebut or shake that evidence. Whenever, therefore, I quote in my subsequent remarks any portions of the Judgment of the High Court or the Privy Council, it must be borne in mind that I do so perfectly coinciding with them as touching the evidence in the present suit.

But, first of all , let us see how the plaintiff has procceeded; and the first thing to be looked at is the plaint. In this, he has charged his mother and the other ranis, witnesses on his side, with collusion and fraud, that they colluded with the present Raja in setting up a grossly false allegation of the appointment of himself as Juboraj. This appears to have been considered necessary in order to meet certain allegations, which were pretty sure to be made in regard to the actions of the three ladies in the case of Nil Krishna, and having also no doubt, the *mokhtarnama,* Exhibit No.7 , in view, and which has been with how little cause, as I have shown, looked upon with considerable dread. I have shown that the three ladies cannot be held responsible for the contents of this document, and therefore I need not make any further remarks upon it. I have also shown that the unfortunate letter written by the plaintiff to the Commissioner is not an estoppel to his instituting the present suit; but though not an estoppel, it is one very damaging to his claim and cannot be considered in any other light than as corroborating in a strong degree the positive testimony on the part of the defendant, The interpretation put upon this letter; and upon the fact of its existence, has been not only a very lame one but a false one and it was only this part of the plaintiff's evidence which appeared to have been given in an unsatisfactory manner and to have been stamped with untruth. In this letter he admitted that the present defendant had been appointed Juboraj by the late Ishan Chunder . This may have been a false statement to support what he then contended for, namely, the appointment of Juboraj under the present Raja; but it is one which he cannot get rid of as corroborative evidence of the positive testimony on the other side.

There are some suspicious circumstances attending the appointment of the present Raja to the Juborajship; but they are trifling when set against the positive testimony of so many influential and respectable witnesses who have been produced in this Court, and the strong probabilities that,

situated as the late Raja was, he was induced by those around him to appoint his whole-brother Juboraj on the day before his death. It is quite possible that he had not made up his mind, even on the morning on which the *Dalan Sanchar* or consecration of the new hall was performed, to appoint a Juboraj; but being then in a very weak and sickly condition, having suffered from paralysis for more than a year previous, it is more than probable that the excitement of that ceremony was too much for him, and feeling that his end was approaching, he was easily induced and influenced by those around him, especially as from the letter of Lieutenant Graham already referred to in the judgement, he appears to have been very weak minded and irresolute to the last degree. We have also positive testimony, which has not been rebutted, that the late Raja was in his right senses when all that is stated to have been done, was done, and that not only were the appointments made with his perfect knowledge and consent, but by his orders, and under his personal directions. As to the late Raja's real state when these appointments were made, we have not the benefit of that medical testimony which would be forthcoming in a European family; but the evidence which has in this case been given on this point, has not only not been rebutted, but we have the evidence of plaintiff's witness No.7 Mohesh Chunder, a Kabiraj, who attended him, to the effect that he was sensible to within 6 hours before his death. It may be that the Raja was not altogether a free agent in the matter; and that he was acting under compulsion; but this would not render the appointment null and void. The Privy Council remark: "The Raja was not then in a state in which he was likely to resist any strong pressure upon him to make some appointment to secure the succession. Many feelings might exist in a weak and suspicious mind to explain the absence of the usual ceremonies, invitations and notifications; and *it must be remembered that at the time he was evidently under the impression that he was securing the succession to his own son Brojendra on the death of the present Raja, by appointing him Bara Thakoor. For there is evidence on the record to show that a Bara Thakoor does succeed to the post of Juboraj.*

When referring to the argument against the appointment of the present Raja, the Privy Council remark: "Their Lordships are far from saying that the objections urged with so much force by the counsel for the appointment are undeserving of a very serious and attentive consideration they appear to have received such consideration in the High Court, and their Lordships, during the argument, and since, have carefully considered and weighed them. The probabilities, however, are in their Lordship's opinions strong in support of the fact of a nomination of the *de-facto* Raja by his deceased brother to the office of Juboraj." Besides these probabilities, we have in this case the admission of the plaintiff himself in his letter to the

Commissioner of the appointment of the present Raja as Juboraj. With respect to the positive testimony produced in the other case, and which has been re-produced in this case, the Lords of the Privy Council remark: "Amidst all this mass of conflicting probabilities impeaching or supporting the disputed nominations, the High Court proceeded on positive testimony, weighty enough to decide the issue, if not sucessfully impeached. Unless native testimony is to be thrown out entirely, and decisions are to pass on conjecture or suspicion instead of evidence, there Lordships think that the High Court did not err in coming to a conclusion that the positive testimony must prevail in this case." Now these remarks are not called for by testimony analogous to that produced in this case but by the very same evidence re-produced. It is therefore idle to say they should be entirely ignored by this Court.

Now against this strong, positive testimony in favour of the appointment of the defendant strongly corroborated, to say the least, by the admission of the plaintiff himself when he thought it was to his purpose to make them what have we on his part? Nothing but the evidence of a few witnesses, who state that they never heard that any such appointment had been made. What evidence those witnesses who refused to attend the Court would have given, is simply a matter for conjecture; but I do not think that this Court would be justified in coming to the conclusion that they would have given better evidence on this point than what has already been obtained. On this issue, therefore, the plaintiff's claim must fail. The twelfth issue was framed for consideration in the event of the plaintiff obtaining a decree for the property. I may, however remark that as the Raja has been found to have been *de-jure* Raja, he had a perfect right to appoint his own son as Juboraj; and that the appointment of the plaintiff as Kurta would not by law or custom give him say prior title.

With respect to the seventh issue, I am of opinion that the other defendants were unnecessarily made parties, and that they are entitled to their costs from the plaintiff at 6 per cent per annum from this date to date of realization.

Referring to the sixth issue, I do not think under the circumstances of this case, that the Court was bound to have made Prosonno Chand Golechqa a co-plaintiff, and no further consideration need to be given to this point inasmuch as I do not consider the defendant entitled to costs, all the issues but one having been decided in plaintiff's (sic) favour.

The plaintiff's suit is therefor dismissed, but with no order as to costs.

The 27th February, 1875, F.C. FLOWLE, Judge.

APPENDIX No.VI

JUDGMENT AND DECREE OF THE LOWER COURT

Judgment of R.Towers, Esq., Judge of Tipperah, dated the 24th January 1881.

No.23 of 1880.

Raj Kumar Nobodwip Chunder Deb Burman ... ... Plaintiff.

Versus

*Maharaja Bir Chunder Manikya, * * and others ... Defendants.*

JUDGMENT

The plaintiff is the eldest surviving son of the late Raja Ishan Chunder, who died in the year 1862, and whose younger brother, defendant I, is the present Raja, his title having been finally settled by the High Court's decision of 14th August 1876, XXV, W.R.404. Defendants 2 and 3 are the sons of defendants, and have been appointed by him to the posts of Juboraj and Bara Thakoor respectively. In the suit just mentioned, the present plaintiff was plaintiff, and defendants 1 and 2 were amongst the defendants. Defendant 3 was not a party to that suit. He was not appointed Bara Thakoor by his father till the year 1878.

Plaintiff now sues for(1) a declaration of his right to the zemindari (which draws with it the right to the Raj) on the death of defendant No.1, on the determination of plaintiff's position and rank; (2) for the recovery of arrears of maintenance at the rate of Rs.5,000 a month for eight years and eight months: and (3) for fixing his future maintenance at the same sum. He bases his claim partly on the Roobokari of the 16th Sravan 1269 B. (31st July 1862), by which the late Raja Ishan Chunder appointed his brother, defendant No. 1, Juboraj, and his eldest son Brojendro deceased, Bara Thakoor, and plaintiff Kurta, and partly on the law and custom of the family or dynasty (vide paragraphs 2 and 5 of the plaint)

The issues were fixed by my predecessor, from whom I took over the case after the witnesses for the plaintiff had been examined. Those issues are seventeen in number. The most important seems to be those fixed on the questions of (1) limitation (2) jurisdiction ;(3) *res-judicata,* (4) the position and rights of plaintiff as Kurta as per the Roobokari of the 16th Sraban 1269 B,. which involves a consideration of the custom of the succession to the Tipperah Raj, and especially the following issue: Is the post of Kurta one of the grades in succession to the Raj, the holder of it ascending successively to the higher grades without further appointment? (5) Plaintiff's claim to maintenance.

To begin with limitation. Plaintiff contends, his cause of action, so far as the first part of his claim is concerned, arose in August 1876 the date of the High Court's decision in the former case; defendant, in August 1870,

when defendant No.1 appointed his son Juboraj: I think the letter correct. It was by this appointment that defendant formally challenged plaintiff's pretensions to the succession, his title to which he now wishes declared. His cause of action as far as the present case was concerned, was as complete then as it is now. The Advocate General for defendant contends that article 120 of the 2nd schedule applies. Plaintiff's pleaders relies on article 144. The point is not free from doubt, but I am on the whole of opinion that a suit for a declaration of title to immovable property may not improperly be considered as one for the possession of an interest therein and in the view, article 144 would cover the case.

With regard to the maintenance, plaintiff has twelve years both for arrears and declaration of right. Article 128-9 Limitation Act. It will be necessary to consider hereafter whether he can get arrears, and when his right was denied; but for the purpose of this issue, it is sufficient to say that limitation does not bar this part of the claim either.

I now come to the question of jurisdiction, which has been argued at great length, but on which I do not think it necessary to say much, as I think it is very clear that the issue must be decided in plaintiff's favour. The former case between the parties (XXV W.R. 404) is alone almost decisive on the point. It was argued at length in both courts, and the High Court's decision reviews the previous instances, in which it appeared that for seventy years, jurisdiction had been exercised and submitted to in cases like the present one. There are, however, some later rulings in point, one 9th July 1879, Sewell White and Morris J.J., present defendant, appellant, Chundreswari, and others, repondents, on the same side; on other hand, defendant calls attention to Ishan Chunder Thakoor's case *versus* the present defendant, Mitter and Maclean J.J., 19th June `1878, in which Mr. Justice Mitter, commenting on the decision in XXV, W.R.404, says he thinks the Raja (defendant) is not in point of fact subject to our courts, except in cases mentioned in Section 433, Act X of 1877, clauses A,B, C, save in respect to his zemindari in British territory. In that case, it appears that the question of jurisdiction was not taken in the Court of First Instance.

With regard to Section 433, it appears that plaintiff applied to Government for permission to bring this suit, and got that permission under signature of the under Secretary to the Government of Bengal ,vide his memo. No.825, dated the 25th February 1878. There is also on the record a latter from the Secretary to the Government of Bengal, No. 4975, dated the 28th December 1878, in which the then Judge of this District was informed that permission of Government is not necessary under Section 433 for instituting, suits against defendant for property in British territory,

---

** Vode.–Printed Paper-Book in Regular Appeal No. 104 of 1881, High Court, p. 437-445 Nobodip Chandra Deb us Maharaja Bir Chandra Manikya.*

he not being an independent ruling chief within the meaning of that section. It is also stated (as was held in the case reported in XXV, W.R. and in many other cases,) that the succession to Hill Tipperah (i.e, to the Raj) follows the succession to the zamindari.

The Advocate General contended that the present suit not being one for immovable property, sanction could not be given under Section 433, clause C, and he has strongly urged that defendant No.1 is an independent sovereign prince, that this is shown by the observations of Mitter J., in the case above referred to, by Lieutenant Graham's letter to the Commissioner of Dacca, dated the 16th August 1861, and by the evidence of the witnesses, especially the fact deposed to by them, that he has the power of life and death over his subjects, and that a Political Agent or a Assistant Political Agent resides at his Court,– to all of which it may be answered that the question seems already decided by a competent authority, as is shown by the numerous instances in which the Raja either submitted to the jurisdiction, or in which the plea was decided against him. There is not a single instance on record where it was held to prevail; the case in which the remarks of Mitter, J., above quoted, occur, having been decided on other grounds.

The next point for consideration is that of *Res-judicata.* To determine this, it will be necessary to compare the plaints in the two cases. In the former suit plaintiff sought to establish right of inheritance to and get possession with mesne profits of the zemindari, and to set aside the appointment by defendant No. 1 of his son as Juboraj and other illegal acts. Here plaintiff sought to succeed as heir to his deceased father, alleging that the appointment by the latter of defendant No. 1 as Juboraj, was a fabrication; and he considered that in the absence of such a personage, he himself was by law entitled, a eldest surviving son of his father , to succeed to the estate and honours of the latter. He also alleged that the Roobokori of the 16th Sravan 1269 B, whereby his late father purported to appoint defendant No.1 Juboraj, Brojendro Bara Thakoor and plaintiff Kurta, was a forgery. The case was decided against him, it being held that defendant No.1 had been legally appointed Juboraj, and the authenticity of the Roobokori was virtually established.

Plaintiff's suit having been dismissed in the Court of First Instance and on appeal, he now sues on the strength of the same Roobokori *vide* paragraph 2 of the plaint (adding also, however, family law and custom as supporting his claim) for a declaration of his right to take possession of Zamindari (which, as I have said, involves the right to the Raj) on the death of defendant No.1 and meantime to get maintenance, from the date of his expulsion from the paternal mansion. That is plaintiff accepting the decision of the Court that his father really did appoint defendant No.1 Juboraj, and

that the latter was, therefore, entitled on the former's death is take the Raj and zamindari, now comes forward and says that his own title to the Juborajship rests on as good a foundation as defendant No.1's to the Raj, that they both received their appointments from the late Raja, who, as shown in the Roobokori, made defendant No.1 Juboraj, Brojendro Bara Thakoor and plaintiff Kurta. That these different grades succeed one another, each going up a step on a vacancy; that as on Ishan Chunder's death defendant 1, from being Juboraj, became Raja, so on Brojendro's death, plaintiff became Bara Thakoor, and on defendant No.1's promotion to the Raj, he became Juboraj, therefore defendant No.1 had no right to promote his own son to this post, and that consequently on defendant No.1's death, plaintiff is entitled to succeed him.

Sections 13 and 43 of the Civil Procedure, and several Rullings of the different High Courts, were discussed and relied on by the learned Advocate General as fatal to the suit, II, I, L, R., Cal., 152, III, I. L. R. Bom. 137, I, I. L. R. ALL. 480 and XXV, W. R. I, on the other side, I. L. R. III . Bom. 223, I. L. R. IV, Cal 190, XIII, W.R.,196, XX, W. R. 150, XXI, W. B. 59. and 181 and XXIV, W. R. 212, were referred to.

It is not necessary for me to enter into lengthened examination of these authorities. No new infringement of plaintiff's rights has taken place since he brought the former suit. In that suit he chose to lay his claim to immediate possession on the averment of certain facts. It was held that the facts were not as he averred them, and consequently he failed. Now he (virtually) says, " I was wrong, and I accept the finding in that case, which I maintain shows " me entitled to another kind of remedy. Instead of immediate possession, " I should have asked for a declaration of my right to possession on defendant's " death, and that is the claim I now wish to put forward." It was euqally at his command on the former occasion to have put forward the case made by him now, and notwithstanding the difference of form, one part of it, and a most material part, is substantially. The same in both. Both demand the cancellation of the appointment of his son as Juboraj, which has been made by defendant No.1 True, this is not specially asked in the present plaint; but how can plaintiff get a declaration of his right to succeed on the death of defendant No.1, unless the appointment by the latter of his son as Juboraj is set aside?

I think the present suit (except for maintenance) is barred, because (1) an essential part of it is substantially identical with the claim in the former suit, (2) the case now made is one which plaintiff might and ought to have put forward on the former occasion : his cause of action was the same; he sought one remedy then, and he seeks another now, Section 13 and 43 seem both applicable and both in my opinion bar the claim.

The next point for consideration is the status of plaintiff as Kurta, *vide* Roobokori of 16th Sraban 1269, and the great contest of fact in this case has been, whether by virtue of that appointment he is entitled, on the occasion of vacancies in the higher grades, to ascend step by step to the Rajship. If so, on the death of Brojendro he would have become Bara Thakoor, and when defendant No.1 succeeded to the Raja, the (plaintiff) would have become or been entitled to become Juboraj, and thus his claim to the declaration sought would be established.

The admitted order of succession is Bara Thakoor, Juboraj and Raja, each of the two former going up a step on the occasion of a vacancy, but defendant denies the right of the Kurta to ascend to the post of Bara Thakoor on the death or promotion of the latter. Defendant in fact maintains that there are only two grades in the succession,–Bara Thakoor and Juboraj, while plaintiff says three; Kurta, Bara Thakoor and Juboraj. *The Raja must appoint the Bara Thakoor be Juboraj when the latter appointment is vacant. According to defendant , he (Raja) may then appoint any one among his kindred that he chooses to be Bara Thakoor.* Plaintiff contends that if there is a Kurta, the latter has the right to succeed as Bara Thakoor.

A great deal of oral evidene has been recorded on both sides on this point, very little of it of an independent character. The witnesses for defendant especially struck me as being biassed, chiefly no doubt from the fact of their defence on the defendant, the present Raja. The genealogical tree of the dynasty has also been put in, purporting to show how the succession has gone from a very remote period of antiquity.

The first appointment of Bara Thakoor on record is said by plaintiff's pleader to have been by the Raja Krishna Manikya, who was succeeded by Rajdhar in the year 1785, vide S. D. A. decision 24th March 1809, p. 134, of the paper Book in Nil Krishna's *case. Since then there have been four down to Brojendro. I find, however, in the genealogical table filed in Chakradhawj's *case (his paper Book p. 211) Dharm Manikya, the 121st Raja (8th before Rajdhar) described as having been a Bara Thakoor. The instances in which it is said that Kurtas have risen to the higher grades (before plaintiff) are only two,–Kashi, son of Rajdhar, who eventually became Raja, and his son Krishna Chunder, who became Bara Thakoor and died in that appointment. There are four other persons, Kashi, Sambhu, Ram Kanai, grandsons of Raja Bijoy Manikya, the third be Rajdhar and Harish Chunder, son-in-law of Raja Krishna Kishore, the last Raja but one before the present one, who are asserted by defendant to have been Kurtas, and who never rose to any thing higher.

Admitting as it is clear, that we must, on the evidene that these four person's position was not as high as that of plaintiff, even if they were all Kurtas(of which there is some doubt), still I think that the two instances

relied on by plaintiff are not sufficient to establish a custom. There is no documentary evidence whatever in its favour and nothing except the assertions of witnesses to show that a Kurta was a personage with any acknowledged rights to the succession. His position is very different from that of Bara Thakoor, even though there be only four instances in which the latter was recognized amongst the successors to the Raj; for in his case, the custom is admitted, and has been admittedly acted on during the entire period that litigation about the succession has been going on in our Courts and in fact before it, Rajdhar (Raja in 1785) having appointed one of his sons, Ram Gunga Bara Thakoor, since which time there has been such an appointment during every reign, the appointee in every instance succeeding, or being recognized as entitled to succeed, to the higher grades, while during the same period the Kurtas are even, on plaintiff's own showing, only two in number. He is obliged to admit that Krishna Kishore, the father of Ishan Chunder, made no appointment of Kurta, though he had several sons (nine altogether). He died suddenly, and therefore, plaintiff contends he might have made the appointment if he had lived. The fact remains, however, that he appointed one son Juboraj and another Bara Thakoor but no Kurta, and that, as I have said the doubtful instances of Kashi and Krishna Chunder are all we have. I call them doubtful, because, though they may have been called Kurta, there is no satisfactory evidene to show, what was meant by the title, or that it was by virtue of that title that they were promoted higher. As far as custom goes therefore, I am decidedly of opinion that plaintiff has not established it.

Then it is said that we must look at the words of the Roobokori itself and the surrounding circumstances to see if plaintiff is by virtue of it entitled to the succession. It would appear from it, that all three appointments were made for the same purpose , viz. the conduct of the business of the Raj and zamindary, and except by the titles given to each, there is nothing to discriminate their positions. It has been strongly contended for plaintiff that there is a multitude of external circumstances going to show that the Rajah's intention was to nominate him (plaintiff) as an heir to the succession, and that plaintiff was treated by the world accordingly. I shall come to these in detail later on; but it seems to me that notwithstanding it was the Raja's wish, or even intention that plaintiff should occupy a grade in the succession, still, if he did not give effect to that wish in a legally valid manner, or *if by doing so he broke any well defined and established Koolachar or family custom, what he did would be of no effect.*

The words of the Roobokori may perhaps be construed as a devise of the succession to plaintiff, but it seems to me that until the latter shows that by law or custom the Kurta is entitled to promotion, or that by the Raja had the power to break or modify the custom by appointing three successors instead of two, his intentions must go for nothing.

Now the evidence shows that the custom is for the Bara Thakoor to succeed the Juboraj, and for the latter, on becoming Raja, to fill the vacant appointment of Bara Thakur by appointing to it. whomsoever of his kinsmen he likes; and there is no satisfactory or sufficient evidence to show that if there is a Kurta, he has a preferential claim to the appointment. If this is the koolachar, as I think the previous history of this family clearly shows, then the late Raja had no right to appoint a third successor, even though he says that he did so according to the ever existing custom.

For the foregoing reasons I think that the Roobokori avails nothing to plaintiff in furtherance of his claim to the succession, even though the Raja wished and intended that it should, and although defendant No.1 himself then and for sometime afterwards treated plaintiff on that understanding. It made plaintiff the first man on the kingdom after the Juboraj and Bara Thakoor, but (to my mind) it did not and could not give him a legal title to the succession.

The fifth question is that of maintenance. The Advocate General did not deny that plaintiff is entitled to some maintenance, but demurred to the heavy sum asked, and to the grant of arrears. The written statement contains a list of maintenance, grants to other members of the family, viz. the sons of Krishna Kishore, two of whom brought suits for the Raj. None of these got more than Rs. 400 a month, and it is deposed by defendant's witnesses, that even the Juboraj gets only Rs. 727. He certainly, however, gets other perquisites (and so did the other maintenance-holders so long as they were on good terms with the Raja), though defendant's witnesses endeavoured to minimize them as much as possible.

Plaintiff's position was, in my opinion, considerably higher than any of these, and he has been worsely treated. These facts ought to be taken into consideration in fixing the allowance; and in order to put them clearly, I must refer at some length to the evidence.

Shortly after plaintiff's birth, a talook was conferred on him and called by his name, and he was brought up and acknowledged as a legitimate son by his father. Defendant No.1 questioned his legitimacy afterwards, no doubt, but it was clearly established in the former case. That his father intended to make him one of his successors, may be gathered from Lieutenant Graham's letter to the Commissioner of the 10th August 1861, para 7, and from Mr. Young's letter to the Secretary to the Government of Bengal, dated 7th August 1862, in which plaintiff is even spoken of as Bara Thakoor. (There is no doubt, however, that this title was never formally conferred on him). Defendant No.1 shortly after had an interview with the Commissioner at Commilla, and at that interview plaintiff as well as the deceased Brojendro, was present, along with defendant No.1, who brought them from Agurtollah, and they were introduced along with him to the

Commissioner. On that occasion also plaintiff seems to have been styled Bara Thakoor, *vide* Mr. Mangle's deposition in the former case, p.177 of the paper Book. At a subsequent interview between defendant No.1 and the Lieutenant-Governor Sir Cecil Beadon, plaintiff was again present along with Brojendro. In the year 1863, the year after Ishan Chunder's death, defendant No.1 appointed a tutor to the two boys. This witness Annund Behari Sen , now a ministerial officer in the Subordinate Judge's Court. and an apparently trustworthy witness, has been examined in both the cases, and has produced certain letters which he says he received from the Raja(defendant No.1) and the defene witness Dinobundhu Nazir in the year 1864, when Nil Krishna's case was going on in Calcutta and this witness was sent there to look after it on the part of defendant. These letters are exhibits A. 1. to A. 4 from defendant. No.1, and B1 to B9 from Dinobundhu Nazir. The authenticity of these letters has been denied. There is no doubt, however, in my mind that they are genuine. The four from defendant No.1, were held to be so in the former case, and in the present case. I have not the least hesitation in believing Annund Behari Sen in preference to Denobundhu Nazir. An examination of the letters themselves will show that it is extremely unlikely that they are forgeries. Their importance in the present case arises from their clearly showing the position which plaintiff at that time held in the estimation of defendant No.1 himself and of every body else at Agurtollah, and that he was understood to occupy the position of one having a title to the succession.

Mr. Justice Macpherson remarks on these letters (XXV W. R. 410) that the correspondence of defendant No.1 and his people proves, as does all the evidence as to defendant's conduct, that it was not till many years after the death of Ishan Chunder that he (defendant No.1) began to profess to consider plaintiff no body because he was illegitimate. Again, he says p.408, that rightly or wrongly, plaintiff and Ranis had the idea, until defendant No.1 declared he would make his own son Juboraj, that plaintiff was to succeed him, *and the idea was at first entertained* professedly at any rate, by defendant . No, I also, until Brojendro having been dead some years, he (defendant No.1) feeling himself firm in his seat, threw off plaintiff, and declared his intention of appointing his own son Juboraj.

The witness Annuad Behari Sen and others also describe the position in which plaintiff lived at Agurtollah, and the comforts and luxuries enjoyed by him. There is in fact not the least doubt that he was brought up in manner entirely in consonance with the expectation which he had and was allowed to hold of one day coming to the throne.

In the years 1870 (on the 31st August) defendant No.1 appointed his own son Radha Kishore Juboraj, and thus formally challenged plaintiff's pretention to the succession. He resumes plaintiff's Talook in June 1871,

and plaintiff left the paternal manson and Agurtalla in the same month, and since then has not received a farthing from the estate.

The foregoing facts show the plaintiff occupied a better position than any of the other maintenance-holders, including the two former claimants to the Raj, Nil Krishna and Chakradhawj. Neither of them ever even claimed to have been designated to the succession, and Nil Krishna was only brothers of the half blood to the deceased Raja, while Chakradhawj was illegitimate. In fixing the maintenance to which plaintiff is entitled I do not think it necessary or expedient to enter into any nice calculations as to the assets and outgoings of the estate. The net income from both the Hills territory and the zemindary is stated by Dinobundhu (the Chief Muntri) to be about three lacs and 70,000 rupees. There are of course debts and charges, but it appears that defendant is adding extensively to the estate by purchase for which he is able to command large sums of money, and that he was able to spend forty or fifty thousand rupees on marriages of members of his family, all within one week. He can also afford to keep a European artist on a salary of 600 rupees a month. Taking all this into consideration, and looking to what plaintiff has been deprived of by the disappointment of his natural and legitimate hopes, I think six hundred rupee a month is by no means an unreasonably large sum to fix for his support.

Two other questions arise in this part of the case, which were the subject of some argument before me. One is, whether the maintenance is to be a charge on the zamindari in British territory and the other whether plaintiff is entitled to arrears, and if so, from when. Several precedents of the Calcutta and Bombay High Courts, have been referred to on both sides in support of their respective contentions but these mostly refer to the case of Hindu widows.

In the previous history of his family, there are some cases in point on these questions. On the first, plaintiff's pleader has referred me to S.D.A. decision , dated the 24th March 1809, a suit between Ram Ganga and Doorgamoni (pp. 134–6 of the paper book in Nil Krishna's case), where it is stated (p.136) that the Raja was declared entitled to hold the zamindari *subject to the usual charge for maintenance of members of the family.*

Again, the Ranis, widows of the late Raja, (one of them being plaintiff's mother) sued the present defendant for maintenance chargeable on the zamindari, *and got a decree confirmed by the High Court in appeal on the 9th July 1879. Defendant tried to appeal this to the Privy Council, but leave was refused him on the 30th January of that year. On the other hand, the Advocate General referred to Ishan Chunder Thakoor's case against

** This is apparent from the perusal of the plaint and judgment of the Court of the Court of the first instance dated the 26th November 1877.*

the present defendant, decided in appeal by the High Court on the 19th June 1878.

Ishan Chunder Thakoor was grandson of a former Raja, and the grant was originally made to him by a Raja who was dead at the time of the suit. It was held that the grant was not hereditary, and that it was not a charge on the zamindari. The circumstances of that case were different from the present one, and I think if plaintiff is entitled to a grant at all, he is entitled to have it made payable from the zamindari. Besides, Chakradhawj, a former suitor for the Raj and a present maintenance - holder, examined as a witness in this case for defendant, gets his allowance from the zamindari, and so does his brother Jadub, another witness for defendant, *vide* their depositions on examination. (So in fact, Ishan Chunder Thakoor). It may be a question whether these persons' maintenance amounts in law to a charge on that property. The Ranis, however, have clearly established their claim as such, and I do not see on what grounds plaintiff can be put in a worse position.

Lastly from what date is plaintiff entitled to maintenance? By article 128, second schedule of the Limitation Act, plaintiff may recover twelve year's arrears from the time when they were payable, and by article 129 his cause of action for a declaration of right to maintenance arises when that right is denied. There is nothing to show that a declaration and arrears may not be used for together, but the arrears cannot be said to be "payable" before the accural of the cause of action for the declaration.

They are only payable by virtue of that declaration. It would seem to follow that they are not payable antecedently to the event which gave a cause of action in that suit for a declaration, *viz,* the denial of the right and plaintiff cannot I think put this earlier than the date of his notice to defendant (15th April 1878). He made no demand for maintenance before this, and his right cannot be said to have been denied before defendant No.1 received this notice and had omitted to reply to it within a reasonable time. In point of fact, he made no reply to it, and I therefore fix the 1st May 1878, as the time from which the maintenance is payable.

The result is, that the rest of the claim is dismissed, and I pass a decree for the arrears at 6 hundred rupees per month from the 1st May 1878 to the institution of this suit, and I declare plaintiff entitled to the same allowance subsequently and in future. Costs of the suit to both parties in proportion with interest thereon at 6 per cent, and at the same rate on the amount decreed to plaintiff from this date. Government to have a first charge on the amount decreed for Court fees.

The 24th January, 1881 R. TOWERS.

APPENDIX NO. VII

Extracts from the deposition of witnesses.

Suit No. 25 of 1880.

Judge's Court Tipperah.

Nabadwip Chandra Deb Burman. ... ... Plaintiff

vs.

Maharaja Bir Chandra Manikya Bahadoor.

Jubaraj Radha Kishore Deb Burman.

Bara Thakur Shamarendra Chandra Burman, Minor. } Defendants.

[N.B.– The following extracts have been made from the Printed paper-Book prepared under the Rules of the Hon'ble High Court, in Regular Appeal No.104 of 1881 of that Court, against the decision of the Court below in the above suit.]

Defendant's witness being solemnly affirmed, states:–My name is Krishna Kamal Deb Burman, son of the late Sriman Thakoor, age 60 or 61, resident of Agartala.

* * *

"There are two posts with regard to the succession to the Maharaja, namely , the posts of Jubaraj and Bara Thakoor. Excepting the aforesaid posts there are no other posts. On the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja , and after that he appoints the Bara Thakoor to the post of Jubaraj." (page 46)

"When the Jubaraj becomes the Raja, the Bara Thakoor by right of his rank can become Jubaraj, (It being read over, the witness said:) He is entitled to be Jubaraj, and no body else save the Bara thakoor can become Jubaraj. Except the Bara Thakoor he cannot appoint anybody else as Jubaraj. According to the custom of the family the successor who has been already appointed by a Raja, cannot be removed by another Raja, but if he makes the appointment contrary to the custom it can be cancelled. * * * * If any Raja, in the presence of the Bara Thakoor appoints his own son to the post of Jubaraj, then the Bara Thakoor must get the Raj, Brojendra was Bara Thakoor, and if Brojendra were alive, he would have been the Jubaraj, and after the death of the Bir Chandra Brojendra, would have got the Raj. If in the presence of Brojendra, Maharaja Bir Chandra had appointed Radha Kishore as Jubaraj and Shamarendra as Bara Thakoor, then on the death of the Raja, Brojendra would have got Raj, and Radha Kishore would not get it." (Page 48)

Defendant's witness No. 2 being solemnly affirmed, stated:–My name is Deno Bandhu Deb Burman, son of late Juggut Bandhu Nazir, age 38 or 39 years, resident of Agartala and employed as the Chief Minister of the Mahraja of Tippearh.

"From among the members of his own family the Maharaja appoints somebody as Jubaraj, and some one as Bara Thakoor. On the death of the Raja the Jubaraj becomes the Raja, and he appoints the Bara Thakoor as Jubaraj, and appoints some member of the family as Bara Thakoor.' (page 25)

"The Bara Thakoor is entitled to become Jubaraj. He is sure to get that post. The Jubaraj after ascending the throne cannot appoint any body else than the Bara Thakoor as Jubaraj. If the Maharaja do not promote the Bara Thakoor to the post of Jubaraj, then he continues in that post Bara Thakoor; but in his presence nobody else can be appointed as Jubaraj; and when in this state the Raja dies, the aforesaid Bara Thakoor becomes the Raja.' (Page 29)

Defendant's witness No.4 solemnly affirmed, Stated :– My name is Ram Gopal Deb Burman, son of the late Ram Narain Dewan, aged 38 or 39 years, resident of Natoon Haveli. I serve as the Superintendent of the temple of Chotoordash Debata.

"I know the family custom with regard to the succession to the Tipperah Raj. I have seen it and heard of it. The Raja appoints the Jubaraj and the Bara Thakoor. After the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja, and he appoints the Bara Thakoor as Jubaraj."

"In the absence of the Jubaraj, the Bara Thakoor becomes the Raja," and if there is no Bara Thakoor also, then the nearest heir of the deceased Raja will succeed, that is, will become the Raja. When the post of the Bara Thakoor falls vacant, the Raja appoints as Bara Thakoor whomsoever he likes amongst the members of his family. When the post of Jubaraj falls vacant, he appoints the Bara Thakoor in the place of the Jubaraj and if there is no Bara Thakoor also, he can appoint somebody else amongst the members of his family as Jubaraj." (page 35)

"After ascending the throne, the Jubaraj cannot appoint anybody other than the Bara Thakoor as Jubaraj. By virtue of his post, the Bara Thakoor is entitled to become Jubaraj. If some Jubaraj after becoming the Raja, appoints his own son as Jubaraj without appointing the Bara Thakoor to that post, the Bara Thakoor will get the Raj." (page 36)

Defendant's witness being solemnly affirmed, stated :– My name is

Gopi Krishna Deb Burman, son of the late Shibjoy Vizier Shaheb, Aged 33 or 34 years, resident of Singarbil, Pergannah Ganganagar in the District of Tipperah. (Revenue Secretary of the present Raja)

"Maharaja Bir Chandra is my father-in-law. I have not obtained the *hoodda* of the Vizier. Since the last five or six years I have been serving the Jubaraj Maharaj. I serve as a Muktear (chief officer) of the Jubaraj (present Raja). Since the last two years I have been serving as judge of the Appellate Court. Before these two years. I was a Judge of the Court of First instance and I served as such for three years. Maharaj Bir Chandra appointed the present Jubaraj according to the custom of his family. I was present when he was appointed. The custom of the family is, that the Raja appoints the Jubaraj and Bara Thakoor and that after the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja, and appoints the Bara Thakoor in the place of the Jubaraj, and appoints whomsoever he likes in the family to the post of the Bara Thakoor. This custom is observed since the time of the several Rajas. ***In the absence of the Jubaraj, the Bara Thakoor becomes the Raja, I can cite instances." (page 39)

" I have got zemindaris. The word Jubaraj signifies the heir apparent to the Maharaja, and the words Bara Thakoor signify an heir below the Jubaraj." (page 40)

The Jubaraj, after becoming the Raja, cannot appoint anybody else to the post of the Jubaraj, without appointing the appointed Bara Thakoor to that post. When the Jubaraj becomes the Raja he is bound to observe the Koolachar(family custom)."

The witness being solemnly affirmed state:– My name is Ram Tanoo Deb Burman, son of the late Arjunmani Deb Thakoor, aged about 41 or 42 years, resident of Agartala.

" I know the rule with regard to the succession to the Raj. The Maharaja appoints the Jubaraj and the Bara Thakoor. On the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja, and after becoming the Raja, he appoints the Bara Thakoor to the post of the Jubaraj. Excepting the posts of Jubaraj and Bara Thakoor , there is no other with regard to the succession." (page 52)

"When Radha Kishore becomes the Raja, he will not be able to appoint any body as Jubaraj other than Shamarendro Bara Thakoor. If after becoming the Raja, Radha Kishore appoints his own son as Jubaraj, then after the death of the Radha Kishore, Shamarendra Bara Thakoor will be the Rajah." (page 54)

Defendant's witness being solemnly affirmed, stated :– My name is Chakradhawj Deb Burman, son of the late Maharaj Krishna Kishore Manikya, aged 47 or 48 years, resident of old Agartala, at present of Comilla.

"There is a special custom in our family with regard to the succession. The Raja appoints the Jubaraj and the Bara Thakoor. After the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja, and the Bara Thakoor becomes the Jubaraj." (page 42)

"If a Raja appoints the Jubaraj and Bara Thakoor, the Jubaraj becoming the Raja, cannot appoint anybody else other than the Bara Thakoor as Jubaraj. He is entitled to be the Jubaraj by right of his rank as Bara Thakoor. If in the presence of Brojendra Bara Thakoor, the present Maharaja had appointed his son Radha Kishore Thakoor as Jubaraj, then after the death of the Raja, Brojendra would have become the Raja." (page 45)

*The witness Maharani Poornakala Debi came into the room, and being identified by Dinobandhu Deb, Nazir shaheb, ***and being solemnly affirmed according to law, stated:*– My name is Maharani Poornakala Debi. The late Maharaja Krishna Kishore Manikya was my husband. I live in Nootan Haveli at Agartala. My age is 54 years.

6. "After the death of the Raja of Tipperah, who succeeds to the throne and the Raj and the zamindari and other properties? And is there any special rule of family custom with regard to succession to that Raj or not?

Answer :– After the death of the Raja of Tipperah, the Jubaraj succeeds to the throne, and Raj and the zamindari and the other properties. There is this rule of familly custom with regard to the succession, that on the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja and the Bara Thakoor becomes the Jubaraj."

7. " When the post of Jubaraj falls vacant, who succeeds to that post and how?

Answer:– When the post of Jubaraj falls vacant, the Bara Thakoor becomes Jubaraj; that is, Raja makes the Bara Thakoor Jubaraj."(Page 71)

11. "When a man becomes Bara Thakoor, what right does he acquire by virtue of that rank?

Answer :– If a man gets the post of Bara Thakoor, he will become Jubaraj afterwards."

12. "With regard to the succession to the Raj and Chakla Roshnabad &c., what posts are there besides the posts of Jubaraj and Bara Thakoor?

Answer: –With regard to the succession to the Raj and the zamindari, there is no other post besides the posts of Jubaraj and Bara Thakoor." (page 72)

6. "If Radha Kishore Thakoor becomes the Raja, can he in the presence of Shamarendra Thakoor appoint any body else to the post of the Jubaraj?"

Answer :– No, he cannot. He is already the Bara Thakoor. If Radha Kishore becomes Raja, Shamarendra will be Jubaraj." (page 73)

17. "If the Raja and the Jubaraj both die on the same day and at the same time, and the Bara Thakoor survives, then who is to become Raja?

Answer :– If the Raja and the Jubaraj both die in the same day and at the same time, and the Bara Thakoor survives, then the Bara Thakoor will at once become the Raja." (Page 75)

*** The witness Kumari Gunomunjari came, and being identified by Thakoor Dinobundhu Deb Nazir Shaheb, ***solemn affirmation according to law, stated:–My name is Gunomunjari; the name of my husband is Ram Lochun Dewan. I have got my house in the old Agartala, and my age is 49 or 50 years.

6. "After the death of the Raja of Tipperah, who succeeds to the throne and the estate and the zamindari and other properties, and is there any rule or family custom with regard to the succession in respect of the aforesaid estate ; if there is, what is it?

Answer:– After the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja, and the Bara Thakoor becomes the Jubaraj, and when there is no Jubaraj, the Bara Thakoor at once becomes the Raja. The Raja succeeds to the throne, the estate and the zamindari and other properties. If in the presence of the Raja, the Jubaraj dies, then the Bara Thakoor becomes the Jubaraj, and the Raja cannot appoint anybody else as Jubaraj."

11. "When a man gets the title of Bara Thakoor, what right does he acquire on the strength of that office?

Answer :– When a man becomes Bara Thakoor, he on the strength of that office becomes Jubaraj when the Jubaraj becomes the Raja after the death of the Raja; and if the Raja and the Jubaraj both die, then the Bara Thakoor at once becomes the Raja." (Page 57)

2. "If Radha Kishore Thakoor becomes the Raja, he cannot in the presence of Shamarendra Thakoor appoint any body else as Jubaraj."

Answer :– If Radha Kishore Thakoor becomes the Raja, he cannot in the presence of Shamarendra Thakoor appoint any body else as Jubaraj." (Page 59)

II. "If the Raja and Jubaraj both die on the same day and in the same hour, and if the Bara Thakoor survives, then who is to obtain the Raj?

Answer: –If the Raja and the Jubaraj both die in the same day and at the same time, and the Bara Thakoor, survives, then the Bara Thakoor by virtue of his post will become the Raja." (page 60)

The witness Rani Krishna Munjari Debi, came to the room then identified by Deno Bandhu Deb Nazir Shaheb *and being solemnly affirmed according to law, said:*– My name is Rani Krishna Munjari Debi, Upendra Chunder Jubaraj was my husband. I live in Rajdhani Agartala; aged about 36 or 37 years.

6. "After the death of the Raja of Tipperah, who succeeds to the throne and the estate and the zamindari and other properties, and is there any rule or family custom with, regard to the succession in respect of the aforesaid estate? If, there is, then what is it? (page 66)

Answer: – After the death of the Raja, the Jubaraj succeeds to the throne and the estate and the zamindari and other properties. With regard to the succession, there is this family custom, that on the death of the Raja, the Jubaraj becomes the *malik,* and the aforesaid Jubaraj after becoming the raja, appoints the Bara Thakoor to the post of Jubaraj."

7. "When the office of Jubaraj falls vacant, who gets the post and how?

Answer:–If the office of Jubaraj falls vacant, the Bara Thakoor becomes the Jubaraj. The Raja appoints him to the post of Jubaraj. In the presence of the Bara Thakoor nobody else can be appointed as Jubaraj."

II. "When a man gets the post of Bara Thakoor, what right does he acquire on the strength of that post?

Answer:– When a man becomes Bara Thakoor, he on the strength of that post becomes Jubaraj, or in other words the Bara Thakoor has a right to be Juboraj?" (page 67)

3. " If Radha Kishore Thakoor becomes the Raja, can he in the presence of Shamarendra Chunder Thakoor appoint some body else as Jubaraj?

Answer:– No, he cannot. In the presence of the Bara Thakoor, he cannot appoint anybody else as Jubaraj."

7. "What was the post first held by your husband, and that was the post held by him when he died?

Answer:– When I came to the Rajbari, I saw my husband holding the post of Bara Thakoor. Afterwards when Maharaj Ishan Chunder Manikya ascended the throne, he became Jubaraj, and he died while he was holding that post of Jubaraj." (page 69)

13. "If the Raja and the Jubaraj die on the same day and at the same time also, and if the Bara Thakoor survives, then who is to get the Raj?

Answer:– If the Raja and the Jubaraj both die on the same day and at the same time, and if the Bara Thakoor survives, then the Bara Thakoor becomes the Raja." (page 70)

Defendant's witness No.1 being solemnly affirmed, stated:–My name is Bharat Chunder Gangoli, son of late Shib Chunder Gangoli, aged 57 or 58 years, inhabitant of Bikram Joojadi, Purgonah Bikrampore, in the district of Dacca, Thanna Srinagar, at present residing at Nootan Haveli Rajdhani.

"This is the custom with regard to the succession:– The Raja, the Jubaraj and the Bara Thakoor, these three persons (hooddas) are entitled to succeed to the Raj. In the absence of the Raja, the Jubaraj succeeds him, and the Bara Thakoor becomes Jubaraj. Excepting these three posts, there is no other post with regard to the succession to the Raj." (page 19)

Witness being solemnly affirmed , stated :– My name is Jadub Chunder Deb Burman, son of the late Maharaja Krishna Kishore, aged 35 or 36 years, resident of Agartala, at present of Comilla.

"In our royal family there is a rule with regard to the succession. The Raja appoints the Jubaraj and the Bara Thakoor. After the death of the Raja, the Jubaraj becomes the Raja, and the Bara Thakoor becomes the Jubaraj. According to the custom, the Jubaraj, after becoming the Jubaraj (Raja?), appoints the Bara Thakoor as Juboraj. In our royal family, excepting these two posts, there is no other post with regard to the sucession. *** The Jubaraj, by virtue of his rank, becomes the Raja, and the Bara Thakoor becomes the Jubaraj." (page 54)

*Rani Bhubaneswari Debi came and being identified by Dinobundhu Deb, Nazir Shaheb, *** and being solemnly affirmed according to law, said:*– My name is Rani Bhubaneswari, my husband's name was Upendra Chandra Jubaraj. He is dead. I live in Agartala Nootun Haveli, and I am aged 40 or 41 years.

6. "After the death of the Raja of Tipperah, who succeeds to the throne and the estate and the zamindari and other property; and is there any rule or family custom with regard to the succession in respect of the aforesaid estate; if so, then what is it?

Answer :– In the event of the death of the Raja of Tipperah, the Jubaraj succeeds to the Raj, zamindari and other properties. With regard to succession, there is this Kulachar (family custom) and practice, that the Jubaraj becomes the Raja, and after becoming the Raja, he makes the Bara Thakoor Juboaraj. He cannot appoint anybody else as Jubaraj in the presence of the Bara Thakoor."

7." When the post of Jubaraj falls vacant, who gets that post and how?

Answer:–When the post of the Jubaraj falls vacant, the Bara Thakoor gets it. The Maharaja appoints the Bara Thakoor to that post."

11."When a man gets the post of Bara Thakoor, what right does he acquire by virtue of that post?

Answer: When a man be becomes the Bara Thakoor, he by virtue of that post becomes entitled to be the Jubaraj." (page 60)

12."With regard to succession to the Raj and Chukla Roshnabad and others, is there any other post than those of Jubaraj and Bara Thakoor?

Answer :– With regard to the succession to the Raj and Chukla Roshnabad and others, there is no other post besides the posts of Jubaraj and Bara Thakoor." (page 63)

14. "If the Raja and the Jubaraj should both die in the same day, and at the same time, and if the Bara Thakoor survives, then who is to obtain the Raj?

Answer:–If the Raja and the Jubaraj both die on the same day and at the same time, and the Bara Thakoor survives, then the Bara Thakoor must get the Raj."

15."Is it the object of there being more than one post with regard to the succession to the Raj and Chukla Roshnabad, that in the event of the death of the Raja there may be no confusion with regard to the succession, and that the succession should follow according to the order of rank?

Answer:– Yes, there are the two posts of Jubaraj and Bara Thakoor only with the object of avoiding confusion with regard to the succession to the Raj and Chukla Roshnabad. On the death of the Raja, persons holding these two offices become the Raja in succession according to the order of their ranks." (page 65).

Suit No. 35 of 1874.

JUDGE'S COURT, TIPPERAH.

Rajkumar Nabadvip Chundra Deb ... ... Plaintiff

vs.

Raja Bir Chunder Manikya Bahadur and others ... Difendants.

[N.B.– The following extracts have been made from the Printed Paper-Book prepared under the Rules of the Hon'ble High Court, in Regular Appeal No. 137 or 1875 of that Court, against the decision of the Court below in the above suit.]

Witness No. 17, for the defendant on solemn affirmation, states:– My name is Juggo Mohan Deb Shuba, my father's name is Kali Krishan Shuba. I am resident of Agartala, aged 52 or 53 years.

"The object of appointing Bara Thakoor is that he should become Jubaraj, in the absence of the Jubaraj, and then in the absence of the Rajah, should become Rajah." (Page 36)

---

*Witness No.16 for the defendant on solemn affirmation, states:–*My name is Ramkrishno Deb Thakoor, my father's name is Ferrichand Thakoor. I am resident of Agartala, aged 66 or 67 years.

"According to the custom of the family, Jubaraj becomes Rajah, and Bara Thakoor Jubaraj. This is the custom of the family." (Page 358)

Witness No.9, for the defendant on solemn affirmation, states: – My name is Ram Churan Deb Thakoor. My father's name is Mohunsing Karkon Thakoor. I am resident of Agartala. Aged 84 or 85 years.

" On the death of Rajah, Jubaraj becomes the Rajah, and when Jubaraj becomes the Raja Bara Thakoor becomes Jubaraj. This is the custom of the Royal family. If these titles were conferred by the Rajah, there cannot be any interference." (Page 368)

Witness No.2, for the defendant on solemn affirmation, states:–My name is Anund Kishore Deb Thakoor. My father's name is Bhubanessur Naib Nazir. I am resident of Agartala, aged about 47 or 48 years.

"Kurta is not benefited by the death of a Bara Thakoor; but the Bara Thakoor derives benefit from the death of Jubaraj. Kurta is a distinct title. The title of Bara Thakoor is not distinct from that of Jubaraj, because one succeeds the other. The Kurta is a title distinct, because it does not lead to succession." *(Page 321)*

First witness for the plaintiff examined by the Commission; Maharani Rajlukhi Moha Debia identified by the plaintiff on sholemn affirmation, states:– My father's name was Tara Chand Babu; he is dead. I live at Agartala. I am a little over 40 years of age.

" I do not know what Jubaraj means. It is the next in rank to the Raja. The Burro Thakoor is next in rank to the Jubaraj. (Page 217)

Suit Nos. 35 of 1874

JUDGE'S COURT, TIPPERAH

Nil Kristo Deb Burman ... ... *Plaintiff.*

vs.

Bir Chunder Thakoor and others ... *Defendants.*

[N.B.– The following extracts have been made from the Printed Paper-Book in Appeal to the Privy Council No. 671 of 1864, against the decision of the High Court, in Regular Appeal No. 245 of 1864)

Witness No. 20, abandoned by the plaintiff and cited by the defendant Bir Chunder Thakoor, having appeared and having affirmed according to law, said:– My name is Juggo Mohan Thakoor, title Soouba son of the late Kali Krishan Shuba, inhabitant of rajdhani the new building, aged about 40 or 41 years.

"In the absence of the Maharaja the Jubaraj succeeds him. In the absence of the Jubaraj the Bara Thakur succeeds him. In the absence of the Bara Thakoor the nearest relation of the Raja becomes Bara Thakoor. If the Raja dies without appointing any person Jubaraj or Bara Thakoor, then his nearest relation inherits the Zamindaris &c., and becomes a Rajah." (Page 281)

Witness No.21, cited by the defedant Bir Chunder Thakoor, *and relinquished by the plaintiff, appeared, and having affirmed according to law, stated:–* My name is Brojomohun Deb, title Thakoor, son of the late Gangadhur Senapati, inhabitant of the new palace in the Rajdhani, aged about 42 to 43 years.

" I have heard that it is cutomary, in the family of the Rajash, of Tipperah that the Jubaraj appointed by the Raja inherits on the death of the Raja, the Sovereignty and the Zamindaris &c., properties left by him. In the like manner Bara Thakoor becomes Jubaraj. ***I am muktear and manager of all the business of the Raja, connected with the Hills. (Page 284)

*Witness No.3 on behalf of the defendant, appeared, and having made the affirmation under the law, deposed as follow:–*My name is Kristo Chunder Deb (the title being Thakoor): I am the son of Wooter Singh, deceassed. I reside at the new Haveli, my aged is about 50 years.

"On the death of the Raja, the Jubaraj becomes rajah, but on the non-existence of the Jubaraj his brother or son sues for the properties, and obtains possession thereof. Subsequently said that on the non-existence of Jubaraj, the Burro Thakur becomes Jubaraj." (page 74)

DEPOSITION OF MAHARANEE KOTEELUKHEE DEBBEA, THE PLAINTIEF'S WITNESS.

Plaintiff's witness No.1 being identified by the plaintiff and of the defendant Chuckerdhj Thakoor and on the part of Bir Chunder Thakoor by Srimati Rajeshuree Dassee and Srimati Onmela Dhatree having solemnly affirmed according to law, said:– My name is Koteelukhee Debea, widow of Maharaja Kashi Chunder Manikya, deceased, inhabitant of Komillah, aged upwards of fifty years.

"The Rajah appoints the Jubaraj and Bara Thakoor. I saw the late Kashi Chunder Manikya Bahadur my husband, when he became Rajah, appointed Krishno Kishore Manikya as Jubaraj, and my son Krishto Chunder as Bara Thakoor. On the death of my husband, Krishto Kishore Manikya becoming Raja, Ishan Chunder was appointed Jubaraj, my son Krishto Chunder having died previously. Opendra was not born at the time when Ishan Chunder became the Jubaraj; when the said Krishto Kishore Manikya ascended the throne he appointed him Bara Thakoor. I have seen Ishan Chunder Manikya appoint the said Opendra Chunder as Jubaraj when he became the Rajah. *** Krishto Kishore was Bara Thakoor before he got the title of Jubaraj." (Page 31)

Witness No.11 cited by both parties, produced by defendant Bir Chunder Thakoor and abandoned by the plaintiff Nil Krishto Thakoor, having appeared and affirmed according to law, said :– My Name is Bhubaneshur Deb, office Naib Wuzeer, son of the late Roodramonee Naib Wuzeer, inhabitant of Agartala, In Raja Tipperah, aged about 72 or 73 years, profession Naib Wuzeer.

"In default of the Raja the Jubaraj and in his default , The Bara Thakoor, succeed to the Raj and estates &c." (Page 90)

PROVINCIAL COURT OF DACCA.

In the year 1805.

Doorgamoni Jooboraj ... ... *Plaintiff*

versus.

Ram Ganga Deo ... ... *Defendant*

[N.B.– The following extracts have been made from the Printed Paper-Book in appeal to the Privy Council No.671 of 1864, against the decision of the High Court, in Regular appeal No. 245 of 1864)

Dated the 6th December 1806 A.D.–Corresponding with 22nd Aughran 1213, B.S.

Witness, Ram Chunder Biswas, appeared on the part of the plaintiff in court, and having taken copper, Toolsee leaves, and the water of the ganges in his hands swore.

Question:– " What is your father's name, what is your age and caste, and where do you reside, and by what business do you live?

Answer – My father's name is Kristo Kant, aged about 62 or 63 years, of Buddee caste, profession service; inhabitant of Purgonah Meherkul." (Page 161)

Question:–" When any person becomes Raja according to established usage and not by force, at that time was there any rule for there being any Jooboraj or not?

Answer :– There was."

Question :- " Is this rule ancient or new?

Answer :– Whether it was before or not I do not know. I have heard from the time of Kullean Manikya."

Question :" In case there is a Jooboraj or not, what is that correct rule by which one succeeds another Raja?

Answer:–In case there is a Jooboraj, the Jooboraj succeeds; if there be no Jooboraj, then the Burro Thakoor becomes Jooboraj; and then Raja." (Page 167).

APPENDIX NO. VIII

Translation of the Written statement of the defendant Maharaja Bir Chunder Manikya Bahadoor, dated the 11th August 1880.

No.344.

In the Court of the Judge of Zillah Tipperah.

Suite No. 25 of 1880.

Nobodvip Chunder DebBurman ... . *Plaintiff*

versus

Maharaja Bir Chunder Manikya Bahadoor ... ... *Defendant.*

Written statement of the defendant.

1. The Civil Court of India has no jurisdiction to try any present or future question, or power of appointing the Rajah or Juboraj of Independent Tipperah. Similarly the plaintiff's claim for maintenance is not cognizable in courts established by the British Government.

2. The plaintiff's suit ought to be dismissed on the ground of limitation.

3. Suit No.35 of 1874, which the plaintiff, stating himself to be the heir of the late Maharaja Ishan Chunder Manikya Bahadoor instituted in the court of the Subordinate Judge of this District, against the present defendant and Radha Kishore Juboraj for recovery of possession of the zamindari &c., with profits, and for setting aside the appointment of Radha Kishore Jubaraj as Jubaraj, and of all other acts, was first wholly dismissed by this court on the 27th February 1875, and afterwards by the Honorable High Court on the 14th of August 1876; and its judgement has become final. The foundation of the present suit is clearly included in the issues in the said previous suit. And the parties in both the suits being the same, it is barred according to section 13 of Act X of 1877 and the law of the *res-judicata.*

4. All sort of claim relating to inheritance ought to be combined, and not to be separately made. Consequently, the claim and prayer which the plaintiff has now made over and above those in the previous suit, ought not to be entertained.

5. The plaintiff cannot now make allegation contrary and dissimilar to those he made in the previous suit. He is estopped from making such allegation. Having heretofore brought a suit making verified allegations – that the appointment of the defendant to the office of Jubaraj and other acts were false, and that the Robakari relating thereto was a fabricated one, the plaintiff was unsuccessful therein. Now also he does not admit them to be

true. Under these circumstanes, the plaintiff cannot make a claim for any benefit by relying upon that Robakari, &c.,

6. As the plaint does not contain an adequate description of the property to establish a reversionary right to which the plaintiff has made a claim, the said claim cannot be entertained.

7. The prayer for an order declaring a future right, which the plaintiff has made in a portion of the plaint, cannot be entertained. Such declaration is contrary to law, the Hindu Law, and public policy.

8. As an adequate valuation has not been made of the claim for fixing the plantiff's monthly maintenane, and of the claim in respect of future right, the claims therefore ought not to be entertained.

9. The Tipperah Raj and the zamindari of Chukla Roshnabad and other properties are not subject to the general order of succession and the rules of ordinary inheritances. Of the two person, who are appointed Juboraj and Bara Thakoor in the independent Raj by the Rajah of his own free will, and in exercise of unrestricted power, in accordance with the immemorial family custom and practice, the Juboraj, on the death of the said Rajah, ascends the throne, is installed and appoints the said Bara Thakoor to the office of Juboraj, and a per on of his own selection to that of Bara Thakoor. If both the said offices fall vacant , the Rajah, according to the said family custom, can of his own accord, and in exercise of his power, again appoint fit persons to both the said posts. Besides the Juboraj and Bara Thakoor, no other person can be heir to the said Raj, zamindari and other properties. Nevertheless, no Raja has power to create or introduce any new family custom or practice beyond that of appointment to both the said offices.

10. Maharaja Ishan Chandra Manikya Bahadoor having, according to the said family custom, on the 16th of Sraban 1269 B.S., corresponding with the Tipperah year 1272, appointed the present defendant as Juboraj (although he had an elder brother Nil Krishna Thakoor alive), and Brojendra Chunder, son of the said Maharaja as Bara Thakoor, the defendant on the death of the said Maharaja ascended the throne, and was installed on the 27th of Falgoon 1276 B.S. The defendant had the same regal powers and the same rights relating to the Raj &c., as Ishan Chunder Manikya and other previous Rajas had. Under these circumstances, the allegation which the plaintiff has made in his plaint that the defendant is only a manager for the term of his natural life, is entirely groundless.

11. As both the said offices relating to inheritance were vacant, the said Brojendra Chunder Thakoor having died just before the defendant ascended

---

* *Vide Printed Paper-Book in Regular Appeal No. 104 of 1881, High Court, p. 6. Nobodvip Chandra Deb vs. Maharaja Bir Chandra Manikya.*

imaginary. Similarly, the allegations relating to the views of Maharaja Ishan Chunder Manikya are futile.

16. The Plaintiff is not the senior member in the Raja's family. There were and are alive in that family many perons who are older in age, nearer in relation, and more respectable than the plaintiff.

17. The Plaintiff cannot obtain maintenance for the past since no allowance or specific sum was fixed for the plaintiff as maintenance and the plaintiff has never obtained any allowance from the defendant.

18. The plaintiff cannot obtain a monthly allowance of Rs.5,000 for maintenance. And no member of this royal family has obtained so large an amount of maintenance at any time.

19. The allowances of the late Nil Krishan Thakoor and others, who heretofore obtained, and who obtain maintenance, were not calculated on a reference to the gross rents or profits of Chukla Roshnabad. The allowances for the maintenance of the members of the family have been fixed, and their amount has been from time to time altered on a change of circumstances in accordance with the views of the Raja. In fact, keeping in view the number of dependants for support on those persons, and the Sradhs and the religious ceremonies to be performed by each of them, the amount of maintenance has been fixed under the order of the Raja, and all of them have received and are receiving them accordingly, thus

The late Nil Krishna Thakoor	.....	.....	Rs. 400
Suresh Krishna Thakoor	.....	.....	Rs. 125
Shib Chunder Thakoor	.....	.....	Rs. 125
Chakradhaj Thakoor	.....	.....	Rs. 250
The late Madhub Chunder Thakoor	.....	.....	Rs. 100
Jadub Chunder Thakoor	.....	.....	Rs. 100

20. The maintenance of the members of the royal family is not a charge on the zamindary of Chukla Roshnabad &c. The amount of allowaces for any member of this royal family has never been fixed by any Raja or Court, on a reference to the income of the said Chukla. Especially, it will not be unknown to the court that to fix such maintenance only on a reference to the income, and not considering the expenditure and the amount of surplus, is extremely unjust and unreasonable.

21. The profits of the zamindari of Roshnabad and others, from the proceeds of which the plaintiff claims maintenance, are not Rs.8,00,000, as stated by the plaintiff. After deducting the Sudder Revenue, the collection charges, the litigation expenses, and other necessary expenses, from the

proceeds of the said zamindari generally no surplus remains. On the contrary, for the Sudder revenue and other necessary acts, debts have to be frequently contracted from various Mohajuns, and from the income of the defendants separate property of the Nij Talooks (with the rights to which the said zamindary has no connection). Even if any surplus remains at times, it will take a long time to gradually pay off therewith the debts contracted from the Mohajuns at or after the time of the previous Rajas. The amount of debts yet to be paid of will be Rs, 3,98,600, on account of interest for which the sum of Rs. 42,282 has to be annually paid. Under these circumstances, the sum of Rs.60,000 annually only for the plaintiff's maintenance, cannot be charged upon this zamindari.

22. The plaintiff's claim of interest is extremely–groundless and frivolous.

. 23. The plantiff has stated, and proved himself to be a pauper. Under these circumstances, in consideration of the circumstances, security for the defendant's costs ought in justice and equity to be taken from plaintiff. Besides, it is no reasonable to allow such a claim to proceed, since the plaintiff having heretofore instituted a false claim against the defendant on an unnecessarily high valuation, has caused a large amount of money belonging to the defendant to be spent, and again he has entered upon this groundless and harassing litigation.

24. The allegation of the plaintiff's having expelled the defendant from the royal habitation is utterly false. The plaintiff having of his own accord come out made a stand against the defendant, and having first brought the aforesaid, suit and being unsuccessful therein, he has again at no expense instituted this groundless suit on excessive valuation *in forma pauperis* with the intention of needlessly harassing the defendant.

25. On the aforesaid grounds, the defendant's prayer is, that the court will be pleased to pass an order, for the defendant's costs after dismissing the plaintiff's groundless claim.

Be it known that the document relating to this case, which have now been found out, are filed herewith with a separate list. Those which are found on search in future will be afterwards filed.

I, Maharaja Bir Chunder Manikya Bahadoor, the defendant in the said written statement, do declare that what is stated in the said written statement is true to my knowledge and belief. I sign this verification this day at 11 o'clock p.m., in my Baitakkhana building at Agartala, Independent Hill Tipperah. The 11th of August 1880, A.D., corresponding with the 28th of Sraban 1287 B.S., corresponding with the Tipperah year 1290.

BIR CHUNDER DEB BURMAN.

APPENDIX No. IX

Translation of the Written Statement of defendant Radha Kishore Deb Burman, dated the 29th Bhadra 1287, (16th September 1880).*

No. 350

In the Court of the Judge of Zillah Tipperah.

Nobodvip Chunder Deb Burman .... *Plaintiff*

versus

Maharaja Bir Chunder Manikya and other ... . *defendants.*

Radha Kishore Deb Burman, by Shib Chunder Aich. M. M. Bardhan– (Pleader)

Written Statement of defendant Radha Kishore Juboraj Goswami :–

1. As according to the nature and circumstances of this case, it is not cognizable in the Civil Court of British India, the plaintiff's suit ought not to be entertained.

2. The plaintiff's claim is barred by limitation and estoppel.

3. The previous suit instituted by the plaintiff against the present defendant and others for setting aside the appointment of the present Juboraj defendant as Juboraj, and all other acts, was first dismissed by the District Court on the 27th of February 1875, and afterwards on appeal by the Honorable High Court on the 14th of August 1876, and the judgement thereof has been final. Therefore the present suit is barred under the provisions of Section 13 of the Civil Procedure Code and of *res-judicata.*

4. The Tipperah Raj and the zamindari of Chukla Roshnabad and others are not subject to the ordinary line of succession of rules of inheritance. They are governed by an immemorial *Kulachar.* The suit for establishment of his own reversionary right, which the plaintiff has described by alleging a *Kulachar* with respect to some matters, and ordinary rules of Hindu Law with respect to others, is entirely groundless.

5. The aforesaid family custom is this:– The Raja of his own accord and in exercise of his unrestricted power appoints a Juboraj and a Bara Thakoor; and on the death of the Raja, the said Juboraj having ascended the throne, and being installed, appoints the said Bara Thakoor as Juboraj, and another person of his own selection as Bara Thakoor. Besides the Juboraj and Bara Thakoor, no one else can be heir to the said Raj, zamindari and other properties. Moreover, no Raja has power to create or introduce any new practice or family custom, or any new office relating to inheritance.

** Printed Paper-Book in Regular Appeal No. 104 of 1881, High Court, p. 10 Nobodip Chandra Deb vs. Maharaja Bir Chandra Manikya.*

6. The aforesaid offices of Juboraj and Bara Thakoor cannot vest in or devolve upon any person by virtue of any right of inheritance. Consequently the allegations that the office of Juboraj has devolved upon the plaintiff, and that the plaintiff is a Juboraj, are imaginary and futile.

7. There is no variation in the royal powers and rights and titles of the Rajas who alone have been entitled to this Tipperah raj and zamindari of Chukla Roshnabad and other properties for a long time and through many generations. The present Maharaja is fully entitled like the previous Rajas. As after the present Maharaja had been installed, both the offices of Juboraj and Bara Thakoor were vacant, he on the 16th of Bhadro 1277 B.S., corresponding with the Tipperah year 1280, appointed the present defendant to the office of Juboraj, and on the 28th of Jeyt 1285 B.S., corresponding with the Tipperah year 1288, appointed Samarendra Chundra Thakur to the office of Bara Thakoor. On the death of the defendant Maharaja, the Juboraj defendant is in right of Juboraj entitled to ascend the throne of Independent Tipperah and to inherit the Raj, the zamindari and all other property. The plaintiff has no right thereto and no reversionary right thereto can vest in him.

8. The office of Kurta alleged by plaintiff is not an office in connection with the Raj or with the right of inheritance to the zamindari. The plaintiff can derive no benefit by virtue of that office.

9. The plaintiff's claim of maintenance is entirely groundless.

The defendant's prayer is, that after dismissing the plaintiff's claim, an order may be passed for the defendant's costs.

I, Radha Kishore Juboraj Goswami, the defendant in the above written statement, do declare that what is stated in this written statement is true to my knowledge and belief. I sign the verification to this written statement this day at 11 o'clock A.* M., in the Baitukkhana building at the capital of Agurtolah. The 29th Bhadro 1287 B.S., corresponding with the Tipperah year 1200.

RADHA KISHORE DEB BURMAN.

---

* *So in authenticated copy*

বিষয়: ১০৭৮ !

নীতি হারাইয়া অর্থসমস্যা চলিল ক্রিধমানপথে, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত বেগেই। ভঙ্গ-বিন্দুর (Breaking Point) কাছাকাছি বি-ক্ষেপের বেগ বর্দ্ধিত হইয়াও থাকে, হইতেও ছিল তাহাই, বাস্তবিক। কিন্তু কর্ম্মের ফলের জন্য দায়ী কর্ম্মীরা তাহা জানিলেন না। তবুও তাহা তাঁহাদের ই কর্ম্মসমষ্টির পরিণতি এবং বিভিন্ন কর্ম্মীর দ্বারাও এক ই পথে চালিত হইতেছিল, সমচেষ্টিত ধারায় না চলিয়াও। দেখার নজির ও একাধিক নয়। একজন ঐন্দ্রজালিকের অঙ্গুলি স্পর্শে যে যে এক অপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটিতেছিল, আমি তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। সেইদিন শিবদেব দৈনিক পূজা সারিয়া একজন মন্ত্রপূত রাজকর্ম্মচারী কে দুই-চারিটি অতি ক্ষুদ্র ব্যয়ের কথা জিগেছিলেন। সে ব্যয় কয়গণ্ডা পয়সা মাত্র। কর্ম্মচারী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া জানাইলেন, সেই সামান্য পয়সাও সেদিনকার তহবিলে নাই। শিবদেবের সম্মুখে তাঁহার গুরুদেব বিপিন-বিহারী গোস্বামী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উপহাসের উচ্চ হাস্য হাসিলেন; — রাজকোষের সম্পন্নতার শ্রী কয়গণ্ডা পয়সার ও নিম্নে অবতরণ করিয়াছে! গোস্বামী মহাশয় একবারে অসম্ভব, অপ্রত্যাশিত এক কথা বলিয়া ফেলিলেন। সংক্ষেপে — তিনি শিবের রাজ্যভার পাঁচমাস কালের জন্য ধারে লইবেন, এবং অপহৃতা ও লাঞ্ছিতা দেবী লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া ~~আনিবেন~~ আনিয়া তাঁহার শূন্য পাদপীঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু সেই কার্য্যের জন্য অসাধারণ ~~উৎসর্গ~~ আত্মোৎসর্গ চাই। সে হইল — কয় বৎসরের জন্য

বিষম সংস্কার !

নীতি হারাইয়া অর্থসমস্যা চালেন রিং-সুমার পথে, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত বেগেই। ভগ্ন-বিন্দুর (Breaking Point) কাছাকাছি বিক্ষেপের বেগ বর্দ্ধিত হইয়াও থাকে, হইতেও ছিল তাহাই, বাস্তবিক। কিন্তু কর্ম্মের ফলের জন্য দায়ীকর্ম্মীরা তাহা জানিলেন না। তবুও তাহা তাঁহাদের ই কর্ম্মসমষ্টির পরিণতি, এবং বিভিন্ন কর্ম্মীর দ্বারাও এক ই পথে চালিত হইতেছিল, সমচেষ্টা ধারায় না চলিয়াও। জানা দেওয়ার দরকার ও একাধিক নয়। একজন ঐন্দ্রজালিকের অঙ্গুলি স্পর্শে যে যে এক অপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটিতেছিল, আমি তাহার সংক্ষেপ বলিতেছি।

সেইদিন। পিতৃদেব দৈনিক পূজা সারিয়া একজন ~~রাজপুরুষ~~ রাজকর্ম্মচারী কে দুই-চারিটি আর ক্ষুদ্র ব্যয়ের দায় মিটাইলেন। সে ব্যয় কয় গণ্ডা পয়সা মাত্র। কর্ম্মচারী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া জানাইলেন, সেই সামান্য পয়সাও সেদিনকার তহবিলে নাই। পিতৃদেবের সম্মুখে তাঁহার গুরুদেব বিপিনবিহারী গোস্বামী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উপহাসের উচ্চ হাস্য হাসিলেন — রাজকোষের সম্পন্নতার শ্রী কয়গণ্ডা পয়সার ও নিম্নে অবতরণ করিয়াছে! গোস্বামী মহাশয় একবারে অসম্বর, অপ্রত্যাশিত এক কথা বলিয়া ফেলিলেন। সংক্ষেপে — তিনি পিতৃর রাজ্যভার পরিচালনের জন্য দায়ী হইবেন, এবং অনাদৃতা ও লাঞ্ছিতা দেবী লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া ~~আনিবেন~~ আনিয়া তাঁহার শূন্য পাদপীঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু সেই কার্যের জন্য অসাধারণ ~~ত্যাগ~~ আত্মোৎসর্গ চাই। সে হইল — কয় বৎসরের জন্য